অন্তরঙ্গ আলো

প্র তি ভা স □ ক ল কা তা-২

প্রথম প্রকাশ □ ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক □ বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা □ ৭০০০০২

প্রচ্ছদশিল্পী □ অমিয় ভট্টাচার্য

অক্ষর বিন্যাস □ শেখর রায়চৌধুরী
ক্রেস্ট গ্রাফিক্স
২, চার্চ লেন
কলকাতা-৭০০০০১

মুদ্রক □ দেবব্রত পোদ্দার
সিপা এন্টারপ্রাইজ
৬/৪, গোপাল চ্যাটার্জ্জী রোড
কলকাতা-৭০০০০২

বাবা ও মাকে—
যাঁদের উদার উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে
সাংসারিক কর্তব্য উপেক্ষা করে বেরিয়ে
পড়েছিলাম একদিন, তাঁদের কথা আজ
বড় বেশি মনে পড়ছে

সূচিপত্র

ক্যামেরাম্যান না সুপারম্যান?

চলচ্চিত্রের দ্রুত ক্রমবিকাশের এই অধ্যায়ে আলোছায়ার মায়ায় গড়ে ওঠা কাহিনীর নেপথ্যে যে অদৃশ্যশিল্পী, সবার চেয়ে অপরিহার্য যিনি, সেই ক্যামেরাম্যানের সার্থক শিল্প যোজনার মধ্যে যে অনেকখানিই দায়িত্ব ও গৌরব থাকে সেটা আজও ভারতীয় সিনেমাশিল্পের ক্ষেত্রে বেশ উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

সাধারণ দর্শকের আসন থেকে কোন বাণীচিত্রের সাফল্যমণ্ডিত প্রদর্শনীতে বলি তারকাবৃন্দের সাফল্যের কথা, সঙ্গীত বড়জোর পরিচালনার স্থূল উৎকর্ষতার কথা—কিন্তু কজন আমরা সমস্ত জিনিষটার বারো আনাই যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে উপভোগ করলাম—তার শিল্পসৃষ্টির উপযুক্ত আদর করি? অবশ্য এর মূলে রয়েছে প্রযোজক ও কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনাদর এই অতি মাত্রায় অন্যতম বিভাগটির প্রতি; অনাদর মানে বলতে চাই রসসৃষ্টির মূলে এই বিভাগটিকে শুধু বিভাগ না ধরে ভবিষ্যত দর্শকদের সমগ্র সূক্ষ্ম রসানুভূতির সমবেত মাধ্যম হিসাবে মনে করতে হবে।

সিনেমার শৈশবাবস্থায় ক্যামেরার সামনে সাপ ব্যাঙ যা খুশী নাচালেই তা দর্শকসমাজের হাততালি পেত সহজেই—কিন্তু আজ সিনেমা আর্ট হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। আদিযুগে অবশ্য ক্যামেরাম্যানকে চার্জম্যান, ফোরম্যানের মাসতুতো ভাই বলা চলতো কিন্তু আজ তাঁর স্থান হল শিল্পীর আসনে।

সিনেমাক্ষেত্রে কলা ও বিজ্ঞানের যে অপূর্ব মিলন তার মোহনাস্থল হচ্ছেন আমাদের ক্যামেরাম্যান-তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং কলাকারের রসগ্রাহিতা, এ দুয়ের বিচিত্র সমন্বয়ের প্রকাশ পায় চিত্রগ্রহণের কাজে। চিত্রগ্রহণের যান্ত্রিক কলাকৌশলের সমস্ত খুটিনাটি তথ্য তাঁর আয়ত্ত্ব রাখতে হয়, সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে প্রতিনিয়তই—নানা উৎকট যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার উজান বেয়ে নাটকীয় আখ্যানবস্তুর আর্ট এবং পরিবেশ বজায় রাখার দুরূহ কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয় সর্বক্ষণ।

গল্পের বিষয়বস্তুকে ক্যামেরাম্যানকে দেখতে হবে অতি সূক্ষ্ম অথচ চিত্তাকর্ষ ভঙ্গীতে—কারণ তাঁর চোখই দর্শকের চোখ, তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে তিনি যেভাবে ঘটনাবলীর রসগ্রহণ করবেন—সেই অনুভূতিকেই তাঁকে নিজের হাতে আলোছায়ার লীলায় অনুবাদ করে দর্শকের কাছে পরিবেশন করতে হবে। এই যে অনুবাদ এ হচ্ছে সিনেমার পনের আনা। চিত্রনাট্যের কাগজেকলমের খসড়াকে কাজে পরিণত করতে হয় পরিচালকের অধিনায়কত্বে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ণধারদের নিয়ে এবং এতে ক্যামেরাশিল্পীই হলেন সর্বপ্রধান, কারণ চিত্রনাট্যের কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে তাঁর দেখার ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে (angle of vision), তাঁর আলোক নিয়ন্ত্রণে (lighting effects)। চিত্রসংগঠন (composition), ক্যামেরার দৃষ্টিপথচালনা (camera movements), পূর্ব ও পরবর্তী দৃশ্যের সংযোজনা এবং সামঞ্জস্য

ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে হবে এমন ভাবে যাতে মূল নাটকীয় রস ব্যাহত না হয়ে রূপে রসে আলোছায়ায় দর্শকদের কাছে তা সর্বাঙ্গসুন্দর ও. পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এইসব যাবতীয় তথ্যের কোন একটি মাত্রও সামান্য ক্ষুণ্ন হলে সম্পূর্ণ ছবিটাই সাংঘাতিকভাবে বেতাল হয়ে পড়ে এবং আমাদের চিত্রগ্রহণের সবচেয়ে বড় দৈন্য হল এই প্রাথমিক বিষয়গুলির প্রতি যত্ন নেওয়ার চূড়ান্ত অভাবে। খুব পরিষ্কার উজ্জ্বল ছবি হলেই আর্ট সৃষ্টি হয় না—এই সত্যটির বিস্মৃতির ফলেই যত গন্ডগোল।

ক্যামেরার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণাধীন বলে ক্যামেরার চোখে অনেক তুচ্ছ ছোট বিষয়কেও কৌশলে অনেক আকর্ষণীয় করে তোলা যায় বহু বিচিত্র পন্থায়—ক্যামেরাম্যান তাঁর কার্যপদ্ধতি ও দৃষ্টিপ্রণালীকে তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তার নব নব উপাদানে ছায়াছবির চিত্রগত একঘেয়েমী দূর করে তাঁর টেকনিকে অনেক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ঠ্য আনতে পারেন। ইদানীং অনেক পরিচালক ও শিল্পীর মধ্যে বেশ যুগোপযোগী আশাপ্রদ নবজাগরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে গল্প অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচনে—কিন্তু ক্যামেরা, আবহসঙ্গীত, অনাবশ্যক গান, কলা নির্দেশ এবং শব্দযন্ত্রের ক্ষেত্রে আজও বিশেষ কোন পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না—বেশীর ভাগই সেই সনাতন গতানুগতিক ধরণে চলেছে।

কোনো একটি বিশেষ দৃশ্যাকে পরিচালক কিভাবে উদ্ঘাটন (open) করে shot আরম্ভ করেন এবং ক্যামেরাম্যান তাঁর কল্পনাকে কিভাবে রূপ দেন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। উদ্ঘাটনেব নিত্য নব প্রণালী সৃষ্টি করতে হবে বিষয়বস্তুর রস অনুসারে। এই দৃশ্যারম্ভের প্রক্রিয়াটি দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দৃশ্যের উদ্ঘাটন হবে একরকম, আবার হাস্যরসের মিলন মধুর দৃশ্যের, নরকগুলজার ক্লাব বা রেস্টুরেন্টের বর্হির্দৃশ্যের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে গ্রামের সহজ সরল দৃশ্য-এ সবের উদ্ঘাটন ভিন্ন ভিন্ন উপায় হওয়া উচিত।

ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন হচ্ছে এক একটি গুরুতর কাজ, কারণ কোন দৃশ্যকে কোন একটি বিশেষ কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলেই মাত্র সে দৃশ্যটি মূল রসানুযায়ী effective হয়। এ কাজের জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও নতুনত্ব চাই কারণ যেখানে সেখানে একটা খাপছাড়া বেয়াড়া নির্বাচন করলে হয়ত চিত্রগ্রহণে মৌলিকতা দাবী করা যাবে কিন্তু তাতে aesthetic sense এর অভাব থাকবে এবং এর জন্য হয়ত গল্পসূত্র ছিন্ন হবার আশঙ্কা থাকতে পারে। ক্যামেরাকোণের সঙ্গে দূরত্বেরও বেশ অনুপাত রক্ষা করে চলতে হবে—দৃষ্টিকোণ বদ্লানোর সঙ্গে ক্যামেরার ব্যবধান তালছাড়া হয়ে পড়লে সে ছবি উৎকট বিভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতায় একই চরিত্রের নানারূপে রূপান্তর সম্ভব—একই চরিত্রকে মহান, সুন্দর হাস্যকর, নিষ্ঠুর এবং করুণভাবে দেখান যায় ঠিকমত দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনে।

চিত্রসংগঠনের মধ্যে চিত্রগ্রহণের রসানুভূতির গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ এই Composition এর কাজের ঠিক চুলচেরা হিসাবের নির্দিষ্ট মাপকাঠির সাহায্যে কোন সঠিক বর্ণনা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। একটি বিশেষ দৃশ্যগ্রহণে অভিনেতৃবর্গ, জিনিষপত্র ও দৃশ্যাবলী সমস্ত কিছুর চিত্রক্ষেত্রের অবস্থিতির মধ্যে একটা সমষ্টিগত মূল্য বা total effect আছে—সবকিছুর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ artistic সমাবেশকেই বলা হয় Composition,

অনেক ছবিই মনের অলক্ষ্যে ভাললাগার সীমা অতিক্রম করে শুধু আকর্ষণীয় ও forceful Composition-এর জোরেই। Composition-এর প্রচ্ছন্ন কৌশলে দৃশ্যের মধ্যে, সেই বিশেষ ক্ষেত্রে, এককে অন্যের চেয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় এবং সেই আকর্ষণের একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রাক্রম বেধে দেওয়া যায়। একটা বিশেষ রেখা বা বস্তুর বিচিত্র অবস্থানের ফলে কোন বাঞ্ছিত বস্তু বা চরিত্রকে সহস্রগুণ বেশী জোরালো করে তোলা যায় দর্শকের অলক্ষ্যে কেবলমাত্র Composition-এর কায়দায়। একঘেয়ে ছবির অনেক বৈচিত্র্য আনা যায় মাঝে মাঝে Composition-এর নতুনত্ব ও অভিনবত্বে। চরিত্র রূপায়নে সেই বিশেষ চরিত্র, সংলাপ, স্থানকাল হিসেব করে Composition- কে forceful করতে হবে।

Composition অবশ্য দৃষ্টি কোণ নির্বাচন ও আলোক সম্পাতের ওপরই অনেকটা নির্ভর করে। এর যে কেবল বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু কিংবা পাত্রপাত্রীকে Shot এর মধ্যে আকর্ষনীয় করে তোলাই প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়—Shots -এর দৃশ্যমান সবকিছুর মধ্যে প্রয়োজন মত একটা পারস্পরিক ও আপেক্ষিক (relative) সম্বন্ধ establish করতে এবং সমস্ত সমাবেশের মধ্যে প্রয়োজন মত কোমল (soft) কিংবা রুক্ষ উগ্র (rough) সম্মেলন আনতে হয় সুচারু composition-এর গুণে। Shot এ একের সঙ্গে অন্যের ভাবগত তারতম্যের পারস্পরিক অবস্থান নির্দেশ করার জন্য অনেক সূক্ষ্ম touch দিতে হয় ছবিতে। নাটকীয় অবস্থানুসারে বিশেষ করে climax দৃশ্যগুলিতে সুসম্বদ্ধ চিত্রসংগঠন দ্বারা পরিচালক কাহিনীর কোন চরিত্রের ভাবাবেগের (mood) মধ্যে দর্শকের চিত্তকে একান্তভাবে মিশিয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারেন, দর্শক যেন তখন প্রেক্ষাগৃহের আসন ছেড়ে কাহিনীর দেশকালপাত্রের একজন হয়ে ওঠেন নিবিড়ভাবে উচ্ছ্বাসের আবেগে।

সিনেমা হচ্ছে আলোছায়ার মোহিনীমায়ার অপূর্ব রচনা। এই ইন্দ্রজাল যে শিল্পী যত সুন্দরভাবে আলোক নিয়ন্ত্রণের মায়ামন্ত্রে সৃষ্টি করতে পারেন তার কাজে ততখানি দরদ ফোটে কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনাবলীর প্রতি। আলোক সম্পাতের নিপুণতার দ্বারাই সমস্ত দৃশ্যে প্রাণ দিতে হয়; আলো ও ছায়ার সমাবেশে বৈচিত্র আনতে গিয়ে অনেক সময়েই স্বাভাবিকতা বাস্তবতার অনেকখানি তফাৎ হয়ে যায়, কিন্তু রূপ-পরিস্ফূটনের খাতিরে অন্ততঃ কিছুটা সত্যের অপলাপ মার্জনীয়। আলোক সম্পাতের ফলে পরিবেশের, চরিত্রের ও বস্তুপুঞ্জের সকলপ্রকার mood কেই মূর্ত করে তোলা সম্ভব। Special effects-এর কাজে আলোর ব্যবহারে দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন। গল্পের মধ্যে ছন্দ মিলিয়ে আলোর বিভিন্ন বিচিত্র প্রয়োগের মধ্যেই যে সার্থক চিত্রগ্রহণের মূলমন্ত্র এবং সাফল্যের চাবিকাঠি একথাটা আমাদের দেশী ছবিতে কেউ খুব তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না—অন্ততঃ কোন ছবিতে কোন ক্যামেরাম্যান দুঃসাহসের সঙ্গে ও খুব যত্নসহকারে এ বিষয়ে অগ্রগণ্য হচ্ছেন সে ধরণের কোন খবর সম্প্রতি পাওয়া যায় নি। অবশ্য এই নিশ্চেষ্টতার আংশিক কারণ হচ্ছে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব এবং উদ্যমশীল অধ্যবসায়ী শিল্পীদের প্রতি অসহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব। প্রযোজকবৃন্দের এই ঔদাসীন্যের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে চলনসইভাবে কোন মতে কাজ শেষ হলেই শিল্পীরা মনে করেন দায়মুক্ত হলেন।

রসায়নগারের কাজে ক্যামেরাম্যানকে খুব দৃষ্টি ও যত্ন নিতে হয় —তাঁর সমস্ত পরিশ্রম পন্ড হবে যদি তার নির্ধারিত মাত্রানুযায়ী চিত্রের পরিস্ফূটন না হয়—ছবির সমস্ত কিছুই পরিমাপ ধরে হওয়া চাই—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৌষ্ঠবের দিকে সেজন্য অনবরত খেয়াল রাখতে হয়।

ছায়াচিত্রের আগাগোড়াই শব্দযন্ত্রী ও ক্যামেরাম্যানের কাজের খুবই সুন্দর ও আর্টিষ্টিক সংমিশ্রণের (blending) সম্ভাবনা থাকে। ছায়াছবি ও বাণী—দুয়ের প্রয়োগে এমন সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এই বিশেষ শব্দ ও রূপের মিলনে গল্পাংশ স্থানে স্থানে এক অভূতপূর্ব টেক্‌নিকে প্রকাশ পেতে পারে।

ক্যামেরাম্যানকে প্রত্যেক বিভাগের কার্যাবলীর সঙ্গে সুপরিচিত থাকতে হবে সব সময়েই। প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনার যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য নিয়ে আলোচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তবে আসল কাজ শুরু হওয়া উচিত। "সেট"এর বেয়াড়া পরিস্থিতি বা বহির্দৃশ্যের নিয়ন্ত্রণাতীত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে মানানসইভাবে চলে তার কার্যোদ্ধার করতে হবে। উপস্থিত-বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, resourcefulness হল তাঁর সম্পদ। দৃষ্টিভঙ্গী হবে উদার অথচ সূক্ষ্ম-গভীর পর্যবেক্ষণশীল। প্রথমে তাঁকে সুরসিকের মত করতে হবে গ্রহণ ও চয়ন এবং পরে করতে হবে শিল্পীর কুশলতার সঙ্গে প্রকাশ। ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা হবে তাঁর "দৃষ্টিকোণ" নির্বাচনে; effective compositionএ এবং নিপুণ আলোক সম্পাতে।

Composition-এর ব্যাপারে পরিচালক, কলানির্দেশক এবং ক্যামেরাম্যানের সম্মিলিত পরিকল্পনা জীবন্ত হয়ে উঠবে দক্ষ ক্যামেরাম্যানের হাতে। চিত্রনাট্যের এবং আখ্যানবস্তুর সমস্ত তথ্যকে যদি তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করার সুযোগ, সুবিধা ও সময় না পান তবে সে ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। খাঁটি ক্যামেরাম্যান এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সর্ববিষয়ে সমান পারদর্শী হন এবং তখনই তিনি আমাদের কাছে হয়ে ওঠেন একজন "সুপারম্যান"।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চ

প্রবাসী জীবনে অনেকদিন ধরেই শখের থিয়েটার নিয়ে হৈচৈ করে কেটেছে। তখন থেকেই কলকাতার পাবলিক স্টেজ আদর্শ স্থানীয় বলে ধারণা। পাবলিক থিয়েটারের অভিনীত নাটক অভিনয়ের জন্য সব সময়েই ধরা হয়ে থাকে কলকাতার বাইরে সব খানেই, এবং নাট্যমেদী বাঙালীর ভারতের কোন জায়গাতেই অভাব নেই। মঞ্চশিল্প, কলা-কৌশল, আলোকসম্পাত এসব ব্যাপারেও কলকাতা সম্পর্কে একটা অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতাম মনে মনে।

বেশি দিনের কথা নয়,—দু এক বছর আগে কলকাতায় প্রথম থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি—আশা অনেক কিছু দেখব, শিখব, জানব। কোন একটি নামকরা রঙ্গমঞ্চ! কিন্তু একী! থিয়েটার বলে যেখানে নামলাম—শ্যাওলাপড়া জরাজীর্ণ বাড়ি, পঁচিশ বছরের আগেকার জড়োয়া ইঁটখসা থাম আর নড়বড়ে দেয়াল এই কি সেই থিয়েটার? যাক্—ভেতরে ঢুকলাম টিকিট কেটে, দর্শনীর হার পাশাপাশি সিনেমার চেয়ে অনেক বেশি—হতেও বা পারে মঞ্চ প্রযোজনায় খরচপত্র বেশিই হয়ত লাগে এদের, স্পষ্ট কোন ধারণা নেই সুতরাং কি আর বলা যায়! অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করা গেল—পানের পিচের দাগ সব জায়গাতেই fresco তৈরি করেছে। চুণবালি খসা দেয়াল, রঙ চটে গেছে। স্যাঁতসেতে হলের মধ্যে কার্নিশের খোপে খোপে অনেক জায়গাতেই পায়রার স্থায়ী আস্তানা—অনেক পুরনো ফ্যান ঝুলছে হলের মধ্যে, যদিও বেশির ভাগ পাখাই এমন এমন জায়গায় টাঙানো যে দর্শকের চোখে ও মঞ্চের মাঝখানে পড়ে একটা বিশ্রী রকম দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়। হরেক রকম ফিরিওয়ালার ঐকতান, ভাঙা চেয়ার ইত্যাদি ত আছেই—কিন্তু ততক্ষণে আর একটি বিশেষ আকর্ষণীয় item-এর সন্ধান পেলাম ছারপোকার সাদর অভ্যর্থনা। খানিক দমে গিয়ে নিজের আসনে বসে আছি, এরপর নজর পড়ল মঞ্চের সামনের পর্দার দিকে, হরেক রকম বিজ্ঞাপন দাদের মলম থেকে শুরু করে অনেক কিছুই 'ধরিয়াছে আশ্চর্য শোভা মনোহর।' হিমানী সাবানে স্নানরতা অর্ধনগ্না এক সুন্দরীর ছবি। অভিনয় শুরু হবে এবার, পান বিড়ি সিগারেট লেমনেডের চিৎকার ও হলের আলো কমে এল। মেজাজ কেমন তৈরি হয়ে আছে বুঝুন অভিনয় দেখার জন্যে। হিমানী সাবানের ছবিগুলো সুদ্ধ পর্দা কুঁচকে ওপরে উঠে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে স্নানরতা মহিলাও কুঁচকে বিকৃত হয়ে ভেঙেচুরে দুমড়ে ভাঁজ হতে হতে উপরে চললেন।

অভিনয় শুরু হল। দৃশ্যের পর দৃশ্য চলল। ভালো অভিনয়ই বলা যেতে পারে মোটামুটি, কিন্তু এখানেও সেই ব্যাপার—একেবারেই হতাশ করল দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, পরিবেশ রচনা—সব ঠিক বাইরের হলের আবহাওয়ার সঙ্গে সমান তালেই পেছিয়ে আছে—এখানেও জরাজীর্ণ সিনসিনারী, ভাঙাচোরা দৈন্যের ছাপ সর্বত্র। আলোকসম্পাত সৌন্দর্যহীন ও অপর্যাপ্ত।

আজকেব দিনে এই কি আধুনিক মঞ্চকৌশল? এই কি আধুনিক আলোকসম্পাত? যান্ত্রিক উৎকর্ষের কোন ছাপই পেলাম না, কতকগুলো নেহাৎই stunt ছাড়া।

অভিনযান্তে হতাশ চিত্তে ভাবলাম কেন এমন হ'ল—তারপব আরো অনেক অভিনয় সব স্টেজেই দেখেছি—কলকাতার এইসব রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়েছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেব মাবফত—তখন আরও অনেক অসুবিধা নজরে এসেছে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার। এ নিয়ে অনেক ভেবেছি এটা একটা গুরুতর সমস্যা—মঞ্চ প্রয়োগের দিক থেকে এই যে দৈন্য, এই যে পিছিয়ে থাকা—দেশ-বিদেশের মঞ্চ উৎকর্ষের তুলনায় এর কারণটা কোথায়—এই জরাজীর্ণ অবস্থা, এই স্বল্পপরিসর মঞ্চ, এটা আমাদের দেশের নাট্য আন্দোলনেরই বর্তমান নিঃস্ব অনাথ অবস্থার প্রতীক।

আজকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাব হট্টগোলের মাঝখানে নাট্য-শিল্পও একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িযে আছে—অনেক দ্বিধা অনেক সংস্কার ও সংকোচ নিয়ে। নিছক ব্যবসায়ীব মন নিয়েই আজকেব থিযেটার মালিকরা বসে আছেন। সিনেমার সঙ্গে জনপ্রিয়তার পাল্লায় এই নোংবা পরিবেশ, জলছবির মত flat সিনারি আর সংকীর্ণ মঞ্চ নিয়ে তাঁবা কি করে অগ্রগতির পথে পা বাড়াবেন?

এই জড়তা ভাঙতে হলে থিয়েটারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে হবে নির্মমভাবে পুবনো সব কিছু ভেঙে বাতিল কবে নতুন আধুনিক পদ্ধতিতে দৃশ্যপট রচনা করতে হবে—আলোক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এর জন্য পয়সা খরচ করতে হবে নইলে কিছুই হবে না। এই সহজ কথাটা বোঝানো এঁদের মোটেই সহজ নয় কিন্তু। নতুন নতুন টেকনিকেব প্রবর্তন করে সামগ্রিক ভাবে থিয়েটাবেব বিভিন্ন বিভাগের মান উন্নত না করে উঠতে পারলে জনসাধাবণের থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ কমেই আসবে। অভিনযকলাব সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষই শুধু নয়—প্রয়োগ শিল্পের অভিনবত্বেব অভাবের জন্যও দর্শকসমাজ আজ ক্রমে থিযেটার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। রাতারাতি স্টেজের একটা নতুন দৃশ্যপট কি নতুন দু'চারটে আলো আমদানী করলেই কিছু ফল পাওয়া যাবে না ঠিকই। তবু আজকের দিনের কর্তৃপক্ষ একমাত্র ব্যবসায়ের নগদ টাকা আনা দিয়ে লাভের হিসেব করেন বলেই তাঁরা কিছু সংশোধন অথবা কোন যন্ত্রপাতির কথা তুললেই এই ভেবে ক্ষান্ত হন যে দশ টাকার জিলেটিন (রঙীন কাগজ যা আলোকসম্পাতে ব্যবহৃত হয়) কিনলে দু টাকারও টিকিট বিক্রি বেশি হবে কি? হবে না, সুতরাং সামান্য যা লাভ তার মধ্যে আর এই ধরনের ফালতু খরচ কি করে করা চলে? দর্শক সাধারণকে উন্নত শিল্প সৃষ্টির দিকে আকর্ষণ করতে হলে তাদের রুচির পরিবর্তন ঘটাতে হলে এবং থিয়েটারকে আরো জনপ্রিয় হতে হলে টাকা-আনা পাইয়ের লাভের অঙ্কের প্রতি এই স্থূল মোহ, এই খাঁটি বেনে মনোবৃত্তি ছাড়তে হবেই তবে। নইলে আজকের টাকা আনা-পাই, যেটা কোনগতিকে তাঁরা ঘরে তুলছেন সেটাও ক্রমে বন্ধ হয়ে আসবে। থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত, নেহাতই অভ্যাস যাঁদের, যাঁদের থিয়েটার ট্রাডিশনের প্রতি একটা মমতা রয়ে গেছে—এই ধরনের কিছু লোকই থিয়েটারের দর্শক। নিয়মিত স্বল্প সংখ্যক খদ্দের যারা কোন মতে টিকিয়ে রেখেছেন স্টেজকে—তাঁদের উপর অসহায়ের মতোই নির্ভর করে আছে প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চ। প্রায় প্রত্যেককেই চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের মধ্যে

চলতে হচ্ছে। ভাঙা হাটে 'কম্বিনেশান নাইট', 'অমুক থিয়েটারে অমুক স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন'—এই সব নানা ফিকিরেও কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। 'স্থায়ীভাবে যোগদানকারী' যদি একজন কেউকেটা হন তবে ত তার নামডাকে যে টাকা ওঠে সেই টাকা হয়ত তাঁকেই স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে খরচ হল। বাকী থাকে কিছু ত জমা হল ব্যাঙ্কে, কিন্তু খবরদার জিলেটিন কিনে বাজে পয়সা খরচ করা চলবে না, কিংবা তিরিশ চল্লিশ টাকা মাইনেব গরীব অভিনেতা কি টেকনিশিয়ানের মাইনে বাড়ানো অত্যন্ত বেআইনী কাজ হবে। এই জন্যই হয়ত আজকাল থিয়েটারওয়ালাদের এমন বিবাট সাইজের প্রাচীরপত্র ছাড়তে হচ্ছে যা সম্ভবতঃ থিয়েটারের সেটের ঘরবাড়ীর আয়তন ছাড়িয়ে যাচ্ছে—পোষ্টারের অক্ষরগুলোর মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে—ওদের মূক চীৎকারে শহরের শ্রী এবং শালীনতাও বিপন্ন।

সিনেমার Star-system-এর সঙ্গে শুধু আমাদের দেশের থিয়েটার ব্যবসায়ীর পাল্লা দিতে হচ্ছে না—প্রায় সব দেশেই এ সমস্যা অল্প বিস্তর আছে—তবু সেখানে—যে সব দেশে থিয়েটারকে ব্যবসা বলে ধরা হয়ে থাকে এবং সব কিছুর মধ্যে টাকার মুনাফাই প্রধান লক্ষ—মঞ্চ প্রয়োগে নতুন নতুন ধারা নতুন প্রয়োগ পদ্ধতির ক্রমবিকাশও চলেছে। একটা স্টুডিও তৈরি করতে হলেও আমাদের বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি এখনও আনতে হয়—স্টেজের বেলাও তাই করতে হবে—নিজের দেশে যখন এসব আনুষঙ্গিক সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এদিক থেকে আলোকসজ্জার ব্যাপারেই বেশি সমস্যা—দৃশ্যপট, রঙ্ এসব যা দরকার আমাদের দেশের নাটকের পরিবেশের জন্য তা ত এখানেই পাওয়া যাবে মোটামুটি এবং সে সব জিনিস খুব যে ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাও নয়—কাঠ, কাপড়, চট, রঙ,—এই ত!

উপযুক্ত শিল্পবোধ নিয়ে রুচিসম্মত মঞ্চ নির্মাণ করতে হ'লে যে দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বেশির ভাগ নাট্য প্রযোজনায় থাকা দরকার তা হচ্ছে বিশেষ দৃশ্যের emotion এবং নাটকীয় action-এর ভাব অনুযায়ী সেট রচনা করা এবং এই ধরনের সেটের symbolic-effect ও সহজ পরিচ্ছন্ন মঞ্চ পরিকল্পনা রুচির পরিচয় দেয়। জবরজং দৃশ্যপট নাটকীয় রসসৃষ্টির সহায়ক কমই হয়ে থাকে।

থিয়েটারের দর্শক আসেন নাটক অভিনয় দেখতে, শুধুই আবৃত্তি পাঠ শুনতে নয়। কিন্তু এর visual effect সম্পর্কে বর্তমানের থিয়েটার যেন একেবারেই উদাসীন, কারণ, স্টেজের শিল্পীর অভিনয়ের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রত্যেক দৃশ্যে মঞ্চের উপর গতিবিধি, চলাফেরা, ওঠাবসা সব কিছুই জড়িয়ে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আলোকসম্পাত, দৃশ্যপট রচনা, রঙীন আলোছায়ার দক্ষ ব্যবহারে যে visual impression সৃষ্টি হয় এ চিন্তা যেন কোন মঞ্চ পরিকল্পনাকারীরই নেই। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে যেখানে ছিলাম আজও ঠিক সেইখানেই আছি আমরা, আবৃত্তি পাঠের জন্য কোনমতে একটুখানি প্লাটফর্ম তৈরি করা আছে। এ সম্পর্কে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন যে ঘটান যেতে পারে এ জ্ঞান থাকলে আজকের দিনে স্টেজগুলোতে কিছু কিছু অভিনবত্ব দেখতে নিশ্চয়ই পেতাম। কারণ, একেবারে হালে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতার নাটমঞ্চটিও (অধুনালুপ্ত)! কিন্তু এই ত্রিশ বছর আগেকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। আজ

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় স্টেজ ডিজাইন সম্পর্কে এতরকম গবেষণা হয়েছে তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও এখানে দেখতে পেলাম না।

এ বিষয়ে, কতগুলো দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা এখানে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না; পুরনো কায়দায় revolving stage-এর জন্য অত্যন্ত কম stage space নিয়ে এদের দৃশ্যপট রচনা—সস্তা খেলোভাবে আঁকা flat দৃশ্যপট। আলোক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একেবারে মধ্যযুগীয় বললেই চলে। আলোর সাজসরঞ্জাম বেশির ভাগই অকেজো, নড়বড়ে, ভাঙাচোরা, গোঁজামিল! সামান্য পয়সা খরচ করেও এগুলো ঠিক করা নাকি সম্ভব হয়ে উঠছে না। আধুনিক আলোকসম্পাত ব্যবস্থা করতে হলে Bulb, spotlight অপরিহার্য—তা বোধ হয় কারুরই নেই এবং থাকলেও দু-একটা যা আছে তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কেউই ওয়াকিবহাল নন; আলোর রঙ্ ও দৃশ্যপটের রঙ্ নির্বাচন মস্ত গুরুত্বপূর্ণ—আলোর creative ব্যবহারের জন্য। কিন্তু ধরাবাঁধা তিন চার রকম রঙে কি stage-এর pictorial effect সম্ভব? নিপুণ শিল্পীর কাছে আলোর রশ্মিকোণ নির্বাচন (angle), আলোরতীব্রতা নিয়ন্ত্রণ (intensity) খুবই দরকার এবং এর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি দরকার সেগুলো খুব অসম্ভব কিছু নয়, তবু এগুলোর অভাবে একটা ভদ্রগোছের sober production আটকে থাকে; এমন কি নিতান্ত সাধারণ আলো—ফ্লাডলাইটও ভাল অবস্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যায় কোন কোন মঞ্চে পাওয়া যায় না। সুইচ-বোর্ড-এর ব্যবস্থা একেবারে একশ বছর আগের কথা বলা চলে—যেখান থেকে আলোর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ হবে সেই বোর্ডগুলোই জরাজীর্ণ প্রাচীন। যা কিছু স্পেশাল এফেক্ট করা হয় দুটি arc-lamp-এর সাহায্যে—তার আলো অত্যন্ত বিশ্রী রকম অস্থির, অস্বাভাবিক বেয়াড়া তার রঙ। Arc-lamp-কে একেবারে বাতিল করার প্রস্তাব করছি না; যেখানে নাটকের রস ঐ ধরনের তীব্র অস্বাভাবিক অপার্থিব আলোকসম্পাত দাবি করবে সেখানে নিশ্চয়ই ঐ আলো ব্যবহার করা অন্যায় নয়। বহু বছর আগে শ্রদ্ধেয় সতু সেন মঞ্চ পরিকল্পনায় যা কিছু নতুন আঙ্গিকের প্রচলন করেছিলেন আজও সবকিছু ঠিক একভাবেই আছে—এতটুকু উন্নতি হয়নি তারপর কোথাও। সহজ সরল Three Dimensional মঞ্চসজ্জা—রুচিসম্মত পটভূমিকার ব্যবহার পর্যন্ত সঠিক ভাবে হ'ল না।

আমাদের দেশে যুদ্ধের পর ফিল্মের কাজেও কিছু কিছু যান্ত্রিক উন্নতি সাধন হয়েছে—কিন্তু স্টেজ সেদিক থেকে এখন সেই তিমিরে। সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়গুলো যদিও এদিকে যথেষ্ঠ আগ্রহের পরিচয় দিচ্ছেন—তাঁদের শিল্পসৃষ্টির অভিনবত্ব হালে রসিক নাট্যমোদী সমাজে ভালভাবেই সমাদৃত হয়ে উঠছে, কিন্তু তাতে কতটুকু হয়? এই নতুন রুচিবোধ নিয়ে মঞ্চ-প্রয়োগ করতে যতখানি এঁদের দিক থেকে সম্ভব তার কিছু প্রচেষ্টা তাঁরা করছেন। কিন্তু এখানেও আর্থিক অসঙ্গতি, নিজের মঞ্চের অভাব—এসব তো বড় অন্তরায়। প্রগতিশীল নাট্য সম্প্রদায়গুলোর সামনে অনেক অসুবিধে আছে—দুঃসাহস করে তবু যে তাঁরা experiment করে যাচ্ছেন এটাই বড় আশার কথা। এমন কোন মঞ্চ নেই এদের কাছে যেখানে এদের টেকনিশিয়ানরা প্রথম অভিনয়ের অন্তত কদিন আগেও কাজ করে নিজেদের সুবিধা মতো সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা ক'রে রিহার্সাল করেন। একটা স্টেজ রিহার্সাল হয়ত কোনমতে হলেও তাও তাতে আলো জ্বলে না, আসাবাবপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যোগাড় করা সম্ভব হয় না। অভিনয় রজনীতেই হয় আসল স্টেজ রিহার্সাল।

এর মধ্যে experiment-এর সুযোগ কোথায়? নাটকের অন্তর্নিহিত ইমোশন, নাটকের ভাবের প্রকাশ করতে হলে কয়েকদিন ধরে অন্তত মঞ্চের উপর অভিনয় শিল্পী ও পরিচালক সকলের সঙ্গে একত্রে কাজ করা এবং বিস্তারিত আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কার্যত দেখা যায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ও শিফ্‌টারদের হাতে মঞ্চব্যবস্থা সমর্পণ করে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকে না।

থিয়েটারের বর্তমান অবস্থার জন্য মঞ্চের এই সব টেক্‌নিকাল বিধিব্যবস্থার গলদই যে একমাত্র কারণ তা বলছি না—মঞ্চের উন্নতি হ'লে অভিনয়ের উন্নতি, অভিনয়ের উৎকর্ষই আবার ভাল মঞ্চব্যবস্থার সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।

অকারণে অর্থহীন ভাবে থিয়েটার জনপ্রিয়তা হারায়নি। আজকের জনসাধারণের উদাসীন মনোভাবকে কাটিয়ে তোলার পথ হ'ল গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে বলিষ্ঠ শিল্পবোধ সম্পন্ন চিন্তাধারার পথ—হয়ত রাতারাতি ফল পাওয়া যাবে না তবে ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হলে খুব বেশি সময় লাগবে না একথা জোর করে বলা যায়।

এই শিল্পবোধ আমরা প্রগতিশীল নাট্য সংস্থাগুলির কাছ থেকেই সব চেয়ে বেশি আশা করি। সুরুচি সম্পন্ন সুচিন্তিত আঙ্গিকের ব্যবহার নাট্য আন্দোলনের পরিপন্থী নয় বরং তা নাটকের বিষয়বস্তুকে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত করে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সহায়কই হয়।

নাটকের আংগিক

নাটকের আংগিক নিয়ে কিছু কথা উঠেছে।

কিছু বলি কেন, বেশ রীতিমত ঝড় উঠেছে। যাঁরা কথাটা তুলেছেন তাঁরা বলছেন, নাটক গেল, অভিনয় গেল, শুধু আংগিকের ম্যাজিক দেখিয়েই বাজীমাৎ করা হচ্ছে আজকাল।

এঁরা আংগিক বলতে কী বোঝেন জানি না। তবে নাটকের বহিরংগের রূপকে যদি ঐ কথাটা দিয়ে বোঝাতে চেয়ে থাকেন তাহলে আলো তার মধ্যে একটি অংশ মাত্র—হয়ত প্রধান একটি অংশই, কিন্তু পুরোটা নয়। মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত, শব্দ প্রক্ষেপন প্রভৃতি যান্ত্রিক অযান্ত্রিক কলাকৌশলও নাটকের বহিরংগকে অন্তরংগ হতে সাহায্য করে বলে মনে করি—ঐ আলোর মতই।

তা সত্ত্বেও যখন আলোর কারবারীকেই প্রধান আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হচ্ছে তখন চোখ বুজে দুর্গা বলে ঝুলে পড়বার আগে শেষ জবানবন্দীটা লিপিবদ্ধ করে রাখা ভালো।

অংগ থেকে কোনো প্রত্যংগকে আলাদা করা যায় না, করতে গেলে যা হয় তাকে বলি বিকলাংগ। কোনো শিল্পকর্মের বিশেষ প্রকাশ-রীতিই যদি তার আংগিক হয় তাহলে সেই বিশেষ রীতিটির আবার কতকগুলো বস্তুগ্রাহ্য পদ্ধতি আছে যার সাহায্যে শিল্পীর মূল পরিপূর্ণ কল্পনা রূপায়িত হয়। শিল্পসৃষ্টির থেকে এগুলোকে আলাদা করে দেখাও যায় না, ভাবাও যায় না।

চিত্রকলায় রঙে রেখায় তুলির টানে যে প্রক্রিয়ার ছবি আঁকা হয়, ভাস্কর্য যে প্রক্রিয়ায় পাথরের গায়ে হাতুড়ি বাটালির ঘায়ে একটা নিপুণ শিল্প-প্রমূর্তি গড়ে ওঠে, সংগীতে সুক্ষ্ম বিচিত্র অনুভূতিগুলো সুরতানলয়ের বিচিত্র সমন্বয়ে যেভাবে একটা সুসম ছন্দোবদ্ধ মাধুর্যে মূর্ত হয়ে ওঠে তা কি একটা আংগিক আশ্রয় করেই মানুষের চোখের কানের মনের বা প্রাণের কাছে এসে হাজির হয় না? এই হাজির করানোর যে পদ্ধতি বা রাস্তা তাকে কখনই মূল শিল্পসৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নে'য়া যায় না। কারণ তুলির টানে রেখার বৈচিত্র্যেই চিত্র শিল্পের অস্তিত্ব ও প্রকাশ, পাথরের গায়ে খোদাই করার কায়দাই ভাস্কর্য, সুর ও ছন্দের design ও প্যাটার্ণের খেলাই সংগীত—মূল শিল্পের সংগে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সুসম্পৃক্ত বলেই এবং Art form সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে reciprocal.

মাটির নীচে বীজ অংকুরিত হয়। শিকড়ের মুঠো মেলে মাটির রস পান করে সে পৃথিবীর বুকে চারা হয়ে জন্মায় আলো ও বাতাসের পিপাসা নিয়ে। সূর্যের আলো আর বাতাসের অক্সিজেন-নাইট্রোজেন থেকে সে আহরণ করে প্রাণশক্তি—আকাশের দিকে শাখাপ্রশাখা মেলে সে সবুজ পাতায় আর রঙীন ফলেফুলে পরিপূর্ণতা লাভ করে: সুন্দর করে সৃষ্টি

করে নিজেকে এই নিজেকে নিজে সৃষ্টি করবার, এই বড় হবার যে প্রক্রিয়া সেটা একেবারেই তা ভেতরকার প্রেরণা, বলা যায় আত্মিক বা organic প্রেরণা। এই organic growth এর process বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষন করা গেলেও এটাকে বাদ দিয়ে পুরো গাছটার অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। একে সাজসজ্জা বা অলংকারের মতো আলাদা করে নে'য়া যায় না। নিজ প্রয়োজন অনুসারে সে প্রকৃতির কাছ থেকে নানা সম্পদ নিয়ে নিজেকে সাজায়। বারিধারায় গ্রীষ্মের খররৌদ্রে, শীতের কুয়াশায়, হেমন্তের শিশিরে, ঝড়ের দোলা, চাঁদের আলোয় নিস্তব্ধরাত্রির অন্ধকারে নানানভাবে নানান কায়দায় সে নিজেকে অবিরাম করে চলেছে। এই প্রকাশের রীতির মধ্যেই তার জীবনের ছন্দ।

নাট্যকারের মনের কোণে বীজের মতই সুপ্ত ভাবনা কাগজকলমের সাহায্যে একদিন নাটকাকারে রূপ নিলো। বীজ থেকে জন্ম নিল অংকুর। তারপর সুরু হলো তার organic growth এর process—রূপশিল্পী, বেশকার, মঞ্চরূপকার, আলোকশিল্পী, অভিনয়শিল্পী সর্বোপরি নির্দেশকের কাছে থেকে সে পেল বিচিত্র প্রাণশক্তি, রং-এ রসে ভরপুর হয়ে ফলেফুলে ভরা পরিপূর্ণ গাছটির মতোই সহজ সৌন্দর্যে একদিন দেখা দিল দর্শকেব সামনে: তাঁরা বল্লেন—সুন্দর! সৃষ্টি হলো Composite Art-work—নাটক।

এই নাটকের আংগিক (যাকে বহিরংগের কলাকৌশল বলা হচ্ছে) বাইরের, একেবারে নিছক বাইরেকার একটা অলংকরণমাত্র নয়। অর্থাৎ এটা ছবির ফ্রেমও নয়, মলাটও নয়; অলংকার যেমন নয় দেহের'organic existence-এর উপকরণ। নাট্যকার সমস্ত উপাদানের সামগ্রিক ব্যবহারের কায়দাই নাটকের আংগিক। নাটকের রচনা, সংলাপ, অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা আলোক সম্পাতের পরিকল্পনা—সবকিছু মিলিয়েই সুদক্ষ নির্দেশ সুষ্ঠু নাট্য-নির্দেশনা। প্রত্যেকটি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া পরস্পরকে সাহায্য করছে বলেই সার্থক প্রয়োগে অপরটি সুন্দর—সকলের সার্থকতায় সামগ্রিকভাবে নাট্যসৃষ্টি সুন্দর।

মানুষের জ্ঞান উন্মেষের প্রথম দিন থেকেই সে তার আন্তর আবেগ ও মনের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করবার জন্যে, সচেতন ভাবে চেষ্টা করে আসছে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বস্তু-জগৎকে সে নানাভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। সমসাময়িক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও যন্ত্র তার আত্ম-প্রকাশরীতিকে প্রভাবিত করেছে। বস্তুতঃ মানুষের মননশীলতার, তার শিল্প-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসই হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয়ের ইতিহাস। আত্মপ্রকাশের তীব্র প্রেরণায় যুগে যুগে মানুষ এই পরিচয়কে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নব নব শিল্পের। নতুনতর সত্যানুসন্ধানী শিল্পীমন বারেবারে গতানুগতিকতার শিকল ছিঁড়েছে। আজকের সত্য আগামী কালকার উন্নততর বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে তার কাছে। থিয়েটারের শিল্পী—শুধু অভিনেতা-নির্দেশক নয়—সমস্তবিধ মঞ্চশিল্পীই তাই চিরবিদ্রোহী। তারা অস্থির, তারা অশান্ত, তারা কোনো সৃষ্টিকেই সৃষ্টির শেষ কথা বলে স্বীকার করে না—নতুনের সন্ধানে চিরপিপাসু নাট্যশিল্পীর মন তাই আবিষ্কার করে নতুন নতুন প্রকাশরীতি—নতুন নতুন আংগিক।

অভিনবত্বই আর্টের—বিশেষ করে থিয়েটার আর্টের প্রাণস্পন্দন—নতুনতর নিরীক্ষার আনন্দে যা উদ্দাম। এই প্রাণস্পন্দনের অগ্রগতির উল্লাস-চাঞ্চল্যে, এর প্রাণবন্যায় সন্দিগ্ধ চিত্তের সমস্ত সংশয়, সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও প্রতিক্রিয়ার কদর্যতা যুগে যুগে ভাসিয়ে

নিয়ে গেছে; আমাদের দেশে এবং অন্যদেশেও—আবারো যাবে, অন্য দেশেও, আমাদের দেশেও।

মানুষের সংগে মানুষের সমাজের, মানুষের ও তার পরিবেশের যে বহু-বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তাই নিয়েই তো নাটক। সেখানে মানুষের জীবনের ও তার হৃদয়-মনের সব দিকই ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর প্রতিফলিত। বিশেষ দেশকালে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে মানুষটি কেমন—ঘরবাড়ী আসবাব পত্র, আকাশ বাতাস, ঝড়তুফান, দিনরাত্রি—এই সবের মধ্যে, এই সব জড়িয়ে কেমন তার বিচিত্র ব্যবহাব তাতেই তো আমরা আগ্রহান্বিত। এখানে শুধু মুখের ভাষা বা অভিনয়ই তার মূল্যায়নের শেষ কথা নয়। সব কার্য-কারণের কেন্দ্রবিন্দুতে যে মানুষটি তার প্রতিই মূল আগ্রহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কায়িক বা বাচিক অভিনয়ই তাকে বিশেষ অবস্থায় নির্বিশেষে প্রকাশ করবার পক্ষে যথেষ্ট কি? একটা পর্দার সামনে ফ্লাট সাদা আলোতে দাঁড়িয়ে সে কি তার জীবনের সমস্ত সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে দর্শকদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে দিতে পারে? সুষ্ঠুভাবে সামগ্রিকভাবে পারে? শুধু কথাগুলি আবৃত্তি করে? তা যদি পারতো তাহলে এত ঝামেলার কোনো দরকারই ছিল না, শুধু নাটক-পাঠই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। কোন কালেই তা যথেষ্ট ছিল না, আজও নেই। আর সেই জন্যেই সেই গ্রীক যুগ বা অশ্বঘোষের যুগ থেকে আমরা নাট্যকলার ক্রমবিকাশেব সিঁড়ি বেয়ে আজকের এই আংগিকময় মঞ্চে এসে পৌঁছেছি। অভিনেতাই দৃশ্যমান নাটকের প্রধান শিল্পী তাকে নিয়েই এই আংগিক। নাটককে উল্লঙ্ঘন করে নয়, তাকে নিয়েই নাটকের আংগিক।

তাই আংগিকের 'এক-নায়কত্ব'ও যেমন কাম্য নয়, আংগিকহীন নাটক এবং নাট্যাভিনয় তেমনি বাঞ্ছনীয় নয়। নাটকের প্রয়োজনেই বিশেষ সময়ে কোনো বিশেষ আংগিক প্রাধান্য লঘু করতে বাধ্য কোন বিশেষ ছবিতে যেমন বিশেষ রং, বিশেষ গানে যেমন বিশেষ সুর বিশেষ নাটকের এবং তারও আবাব বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কোন বিশেষ আংগিককে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। নাটকের প্রয়োজনে অভিনয়ের বেলাতেও যেমন বিশেষ চরিত্রের কোন ভাবব্যঞ্জনা বা কোন বিশেষ ঘটনাকে underline করতে হবে—পরিচালকের পরিকল্পনা অনুসরণ করে চরিত্র বা ঘটনা গুরুত্ব অনুসারে তেমনি আলোছায়ার সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা সেই সব চরিত্র বা ঘটনাকে underline করা বললেও ঠিক হবে না—mood অনুসারে নাটকীয় মুহূর্তটিকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে হয়।

মাত্রাবোধ বা পরিমিতি জ্ঞানের কথা এই প্রসংগে খুব স্বাভাবিকভাবেই তোলা হয়ে থাকে প্রত্যেক শিল্পী তার নিজস্ব রুচিবোধ ও শিল্পচেতনা অনুসারে নাটকের প্রয়োজনের কথা ভেবে এই মাত্রা বা পরিমান ঠিক করে নেন। এখানে বিজ্ঞান তাঁকে সাহায্য করে।. চরিত্রানুসারে রূপসজ্জা ও পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার—এমনকি দৃশ্যসজ্জা ও দৃশ্যেব্যবহৃত চেয়ার টেবিল ফুলদানী পর্যন্ত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরিমিতবোধের পরিচায়ক হওয়া চাই। নাটকে ব্যবহৃত আলো যন্ত্রের যন্ত্রনা নয়, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষফল—শিল্পীর মননশীলতার, তার সুক্ষ্ম পরিমিত বোধের পরিচয়।

আজকের এই যন্ত্রযুগে বিজ্ঞানকে বরবাদ করে দিয়ে আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি

না দৈনন্দিন জীবনে কাগজ, কলম, পেনসিল, চশমা, টেলিফোন, মোটর, ট্রেন, এরোপ্লেন, ওষুধ প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নয় কি? যন্ত্রের যন্ত্রনা বলে কি কেউ ইলেকট্রিক ট্রামে চড়্‌বেন না? তিনি কি বল্‌বেন, আমার ঠাকুর্দার বাবা হেদোর মোড় থেকে ঘোড়ায় টানা ট্রামে চড়ে রোজ কালীঘাটের আদি গঙ্গায় চান করতে যেতেন, আজকের এই 'মেলেচ্ছ' ট্রামে চড়ে মরি আর কি? এক সময় পাইনকাঠের রোলারে জড়িয়ে থিয়েটারে পটুয়ার আঁকা যাবতীয় দৃশ্যপট ওঠানামা করত বলে আজও তাই করতে হবে? অর্থাৎ আমরা যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানে থাক্‌বো, না এগিয়ে যাবো যুগের সংগে? মূল প্রশ্ন এইটাই। চোখের চশমাটা দরকার, দেখবার জন্যেই দরকার। পেনিসিলিনটা দরকার, রোগমুক্তির জন্যেই দরকার। কিন্তু লেন্সের পাওয়ারটা আবার ঠিক দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজনের পক্ষে পরিমিত হওয়া আবশ্যক, আবশ্যক পেনিসিলিনের ডোজটা ঠিক করা রোগ ও রোগীর প্রয়োজনের মাত্রা অনুসারে, কোন বিশেষ আংগিক দর্শকের কাছে—নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও—বড় বলে মনে হতে পারে।

যেমন, কোন নাটকের দৃশ্যসজ্জা হয়ত এত অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় হলো যা দেখে প্রথম থেকেই দর্শকেব চোখ জুড়িয়ে গেল, মন ভরে গেল—অথচ তার সামনে যে অভিনয় হলো সেটা যেন তার সংগে তাল রেখে চলতে পারলো না। এ ক্ষেত্রে লোকের দৃশ্যসজ্জার কথা বেশী করে মনে হবেই। সে দোষ মঞ্চরূপকারের কিছুতেই নয়। অর্থাৎ এমন কথা বলা যাবে না যে, এত ভালো মঞ্চসজ্জা করেই নাটকখানাকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। আলো নিয়ে আজ যে এত কথার সৃষ্টি হচ্ছে তার পেছনেও এই সমস্যা। যেখানে আলোটাই চোখে পড়ছে সেখানে বুঝতে হবে, অন্য কিছুর অভাব ঘটেছে। ছেঁড়াতার নাটকে চালা ঘরে রোদ-ছায়ার মায়া, দুর্ভিক্ষের দৃশ্যে দিগন্ত-বিস্তৃত গ্রামরেখার সামনে নেড়া গাছ, শহর থেকে নায়কের গ্রামের দৃশ্যে আসার মিক্সিং দৃশ্যটি কখনো কি লোকেব চোখে লেগেছে? চার অধ্যায়ে এলা অতীনের সংলাপের এক গভীর মুহূর্তে 'সিলিউয়েটেড' হয়ে যাওয়া, কিংবা শেষ দৃশ্যে ছাদের ওপারকার দূরের বাড়ীগুলোর আলো নিভে গিয়ে যখন গভীর রাত্রির বুকে মৃত্যুর নিস্তব্ধ সংকেত নেমে আসে আলোর মায়ায় তখন একমূহুর্তের জন্যেও কি কারো মনে হয় আলোর কথা? যে রক্তকরবীর আলোর এত প্রশংসা তাতে বিশু নন্দিনীর আলো-আঁধারির দৃশ্যে নাটক অভিনয় সব পেছনে ফেলে আলোই কি যন্ত্রের মত উৎকট হয়ে ওঠে? তাহলে!

এই প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষায় রইলাম, এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে যে সব কথা বলা হলো তার সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে এর জবাব।

থিয়েটারে নতুন আলো

'নবান্ন'র নতুন অভিজ্ঞতাকে বিদগ্ধমহল স্বাগত জানান। পেশাদারি থিয়েটার ভয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে। শিশিরকুমার পেশাদারি মঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চায়িত করে প্রকারান্তরে 'নবান্ন'-র গুরুত্বকেই স্বীকার করে নেন। কিন্তু 'নবান্ন'-র প্রথম সাড়ার পর একটা সাময়িক বিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তার কাল এসে পড়ে। ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশেব দেশবিভাগ ও তারই মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা, বামপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমেরও থম্‌কে দাঁড়ানো বিভ্রান্তি, এই সব কিছুর প্রচণ্ড টালমাটাল অবস্থা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আসতেই 'নবান্নের কিছু পুরনো শিল্পীর অস্থায়ী সমাবেশে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয় এবং শ্রীশম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। 'নবান্ন'-র পর আলোর পরিমিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়োগ এবং মঞ্চসজ্জার সুচিন্তিত, স্বল্প উপকরণে রচিত, অর্থব্যঞ্জক ব্যবহার প্রথম দেখা গেল নাট্যচক্র প্রযোজিত এই 'নীলদর্পণ' নাটকে। তারপরই 'বহুরূপী'-র নতুন নাট্য প্রয়াসের পর্ব।

'ছেঁড়া তার' থেকে 'কল্লোল' চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুলখেলা

'নবান্ন'-র ঐতিহাসিক প্রযোজনার পরবর্তীকালে পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে যাঁরাই মঞ্চে প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে 'নবান্ন'-র মঞ্চস্থাপত্যে স্তরভেদের ব্যবহার, পরিবেশসৃষ্টিতে সংগীত, শব্দ ও আলোর নতুন সুচিন্তিত সমন্বয় নাট্যভাবনার প্রথম সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলোর সক্রিয় ভূমিকার চেতনা থেকেই বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাট্যসংস্থার নাট্যপ্রচেষ্টায় এই সময়েই নতুন আলোকসম্পাতের চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। সেদিনকার পরিস্থিতিতে অপ্রচুর যন্ত্রপাতি, আর্থিক অসংগতি, নিজস্ব মঞ্চ না থাকায় মহলার অসুবিধে ইত্যাদি সমূহ সমস্যা বোধহয় একদিকে থেকে আলোর ক্রমবিকাশের সৃষ্টি ও পরীক্ষার প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ যুগিয়েছিল। এইসব অসুবিধের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের সবাইকেই আলোকে জানতে ও বুঝতে হয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখনও আর্ক ল্যাম্পের 'ফলো-ফোকাসিং' এবং মেলোড্রামাটিক্ দৃশ্যে তীব্রতাবৃদ্ধির মধ্যেই আলোর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। কোনো সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ-পরিকল্পনা ছিল না, আট দশফিট গভীরতায় তা সম্ভবও ছিলনা সেটের জানলার ঠিক বাইরের এক কিংবা দেড় ফুটের মধ্যেই আকাশকে রাখতে হয়; খোলা মাঠ বা প্রাসাদ বা কক্ষ তিন ভাঁজে রিভলভিং ডিস্ক-এর একটা সেক্টরে সীমাবদ্ধ; লাইন ভেঙে কোণ এনে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা হত। স্তরভেদের ব্যবহারও প্রায় অসম্ভব ছিল। শুনেছি, একমাত্র 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নিজস্ব ব্যবহার দেখা যায়, অন্যত্র এই মঞ্চকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে নাটকের গতিবেগ রচনায় কাজে লাগানো হত। বহুরূপীর

'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার', নাটকেই প্রথম স্পষ্টত আলোর তারতম্য প্রধানত সাদা আলোর মাত্রাভেদে বিভিন্ন কোণ থেকে প্রয়োগের চেষ্টা হল। আমার অভিজ্ঞতায় প্রথম 'পথিক' নাটকেই চটের টেক্স্চার ও গভীরতার পরিপ্রেক্ষিতে এক সেটের পটভূমিকায় প্রায় সাদা আলোর নানা বৈচিত্র্য ও অন্ধকারের কালো প্রচন্ড নাড়া দেয়। পরে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপের 'সাংবাদিক' নাটকে সাদা আলোর বিন্যাসে 'স্পেস'-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দৃশ্য ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে আলোর প্রয়োগ তখন যে সবসময়েই অত্যন্ত সচেতনভাবে করা হয়েছে, তা-ও নয়। আলোর বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সুযোগ সীমিত ছিল। অথচ তখনই 'ছেঁড়া তার' নাটকে স্পট্লাইটের নির্বাচনী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়—রহিমুদ্দিন ও ফুলজানের বলিষ্ঠ অভিনয়কে আরো তীব্র কবে তোলার কাজে 'স্পট্' ও 'ডিমার'-এর সুপ্রযুক্ত ব্যবহার দেখা যায়।

পরবর্তীকালে বহুরূপীর 'চার অধ্যায়' নাটকে আলোর এই ডাইন্যামিক সম্ভাবনাকে আরো সচেতনভাবে প্রয়োগ করাব চেষ্টা হয়েছে। নির্দেশক শ্রীশম্ভু মিত্র নাটকের প্রতিটি অধ্যায়েই অভিনয়ের 'কম্পোজিশন' ও নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগের অনুসবণে আলোকসম্পাতের বৈচিত্র্য এক-একটি বিশেষ ধরনে রচনা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়কার আলোর যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, নিজস্ব মঞ্চ না থাকার দরুন যথেষ্ট সময় নিয়ে মহড়া দেওয়ার অসুবিধা সত্ত্বেও 'চার অধ্যায়ে'র নাট্যবস্তুর গভীরতা সূক্ষ্ম অনুভবনশীল অভিনয় এবং তারই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ রচনায় শব্দ ও সংগীতের সুচিন্তিত ও সচেতন প্রয়োগে গভীরভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন প্রতি দৃশ্যের শেষে গুলির শব্দ ও কোরাসে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির rousing tempo, দূরাগত ট্রেনের হুইস্‌ল্-এব শব্দ, শেষ দৃশ্যে 'মরণের কালো যবনিকা'র পটভূমিকায় রাত বারোটা বাজার অমঙ্গলসূচক সংকেত, এই সব কিছুর সঙ্গেই সাদা আলোর বিভিন্ন তারতম্যে ব্যবহার এবং একমাত্র এলার ঘরে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে কালীমূর্তির ফটোর কাছে লাল আলোর আভাস, তৃতীয় অঙ্কের শেষে পোড়ো বাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র মাস্টারমশায়ের হাতের টর্চের আলো, বা শেষ দৃশ্যে অন্ধকার ছাদে পাঁচিলের ওপারে বহুদূরে বাড়ির গায়ে জানলার দুটি ছোট্ট আলোর চতুষ্কোণ যখন প্রেতের চোখের মতো মনে হয়— আলোর, পরিবেশের ও শব্দের এই প্রয়োগ বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে বিছিন্নভাবে এই 'ইফেক্ট'গুলো নিশ্চয়ই মনে বা চোখে এসে লাগে নি।

যদিও আমার কাছে আজও সব মিলিয়ে 'চার অধ্যায়'-এর আলোক-পরিকল্পনা বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং আলোচনার যোগ্য, তবু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের আধুনিক থিয়েটারের ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী' যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তারই মধ্যে 'রক্তকরবী'-র মঞ্চসজ্জাও আলোকসম্পাতও সাধারণভাবে সর্বস্তরের মানুষের মনেই সাড়া জাগিয়েছিল। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রায় অসম্ভব মঞ্চ প্রয়াসকে শ্রীশম্ভু মিত্র সম্ভব করতে পেরেছিলেন, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতসহ প্রতিটি অঙ্গের সার্থক সমন্বয়ে।

পৌষের পাকা ধানের আমেজ, উজ্জ্বল সকাল, বিশু-নন্দিনীর নিভৃত অন্তরঙ্গ আলাপ এবং ফাগুলাল, চন্দ্রা ও বিশুর আড্ডায় দৃশ্য স্থান-পরিবেশ নিশ্চয়ই এক নয়, এই বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত অনুভব এক নয়। নন্দিনী ও রাজার আলাপচারীর তাৎপর্য

আরো গভীর। এঁটোদের দৃশ্যের উগ্র ভয়াবহতার সঙ্গে মঞ্চের গভীরে দূরত্বে এদের দেখানোর মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল— এই দৃশ্যের spiritual locale-কে spatial locale-এ স্থাপন করা হয়েছিল। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জায় লাল রঙ, মার্বেল পাথর ও মকর দাঁতের ব্যবহার, এবং আলোর নিত্যপরিবর্তনশীল প্রয়োগকলায় বিভিন্ন রঙের আলো নানা কোণ থেকে প্রক্ষেপণ, 'ডিমার'-এর সাহায্যে আলোর এক প্যাটার্ণ থেকে অন্য প্যাটার্ণে যথাসম্ভব সুকৌশলে ও ধীরে দর্শকের চোখের অলক্ষ্যে মিশে যাওয়া, কখনও 'গ্লাইড্' করে কখনও আচমকা নাটকের দৃশ্যান্তরে যাওয়া, নেপথ্যে রাজার অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে জালের দরজার উপরে দুটি লাল আলো জ্বলে ওঠা ইত্যাদি সবই শব্দের প্রয়োগের সঙ্গে সমন্বয়ে শ্রীমিত্রের সামগ্রিক প্রয়োগ-পরিকল্পনার সহযোগী অঙ্গরূপে নাটকের নাটকীয় প্রয়োজনেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। মানুষের চোখে এর সহজ আবেদন তো আছেই। সব মানুষের মনেই একটা কৌতূহলী ছেলেমানুষী মনও হয়ত আছে, সেই সহজ কৌতূহলী ছেলেমানুষী ভালো লাগার মাত্রাভেদেও নিশ্চয়ই আছে। 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে তাই দর্শকদের মনে visually সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সিঁদুরে মেঘের পটভূমিকায় 'সিলুয়েটেড' নন্দিনীকে। যদিও তুলনাগতভাবে হয়ত আলোর মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার (যদিও সম্পূর্ণ ভিন্নরকম) বা কল্পনা এ নাটকেই অন্যত্র অনেক বেশী কার্যকর হয়েছে, তবু নাট্যপ্রয়োজনেই 'রক্তকরবী'-র আলোক-পরিকল্পনায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার visual interest এবং সর্বোপরি সিঁদুরে মেঘের প্রোজেক্শনের (বিলেত থেকে আনা imported stuff ক্লাউড্ প্রোজেক্টরের সাহায্যে) ছবি দর্শকদের সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছিল। যদিও অতি পরিমিত সময়ের জন্য রঙীন মেঘ 'রক্তকরবী'র আকাশে দেখা দেয় (এবং সেই মেঘের যন্ত্রেরই তাকে চলমান করার ক্ষমতাও ছিল) তবু প্রথম দর্শনে অনভ্যস্ত দর্শকের চোখে মনে সবকিছু ছাড়িয়ে অনেকক্ষেত্রে অন্তত আলোর ব্যাপারে ঐ মেঘের ছবিই উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এর জন্যে দর্শকের রুচিকে সমালোচনা করে অপবাদ দেওয়া ঠিক হবে না। অনুরূপ কথায় বলা চলে 'পুতুলখেলা'র একটি দৃশ্যের শেষে যখন সমস্ত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি একটি কলের পুতুলের আকস্মিক সচল হাত-পা নাড়াকে প্রায় ক্লোজ-আপ-এর মতো দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরে। অথচ অন্য দৃশ্যে বিকেল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ডাঃ রায় ও বুলুর নিভৃত সংলাপে ক্রমে যখন এক ধরনের স্পেস্‌লাইটিং-এর ব্যবহারে দৃশ্যের মঞ্চসজ্জার বেতের চেয়ারে, ল্যাম্পের শেড, আলমারীর মাথায় কুলো, দরজার আর্চ-এর কম্পোজিশনের বিশেষ রেখাভঙ্গিমা মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তারই পটভূমিকায় বুলুর তীক্ষ্ণ প্রোফাইল ও মুখে একেবারে স্পষ্ট পাশ থেকে আসা আলো-অন্ধকারের অসম প্রয়োগ দৃশ্যের অস্থিরতা, চাপা উত্তেজনা এবং সাস্‌পেন্‌স্‌কে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বেশীর ভাগ লোকের চোখেই এমন কি সমালোচকদের চোখেও কলের পুতুলের ছবিটাই মনে থাকে, এবং তা-ই নিয়ে আলোচনা হয়।

ট্রেন ও জলপ্লাবন : সেতু ও অঙ্গার

বিশ্বরূপায় 'ক্ষুধা' নাটকের আলোকপরিকল্পনা সম্পর্কে অভিযোগ ছিল, পেশাদারী মঞ্চের সমস্ত সুযোগসম্ভবনা পেয়েও আমি এখানে আলোকে 'রক্তকরবী'র চেয়ে অনেক কম

কাজে লাগিয়েছিলাম। এ অভিযোগের জবাবে আমি বলব, 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা' হলে আলোর কাজ হয়ত আরো কম থাকত। অথচ 'ক্ষুধা' নাটকে তিনটি বেকার যুবকের ঘরের কোণের জানলায় ভাঙা শার্সির জায়গায় খবরের কাগজ ঢাকা তিন ফোকরের মধ্য দিয়ে গলির গ্যাসের স্তিমিত ম্লান আলোর আভাসে প্রকটিত অন্ধকারে ক্ষীণ কম্পমান প্রদীপশিখার আভাস ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দুষ্টচক্রের চাপের মধ্যেও ব্যবহার করা হয়েছিল। হয়ত বাংলা রঙ্গালয়ে এই প্রথমই সামনে থেকে প্রেক্ষাগারের মাঝখান থেকে আলোকসম্পাতের বিশেষ প্রক্রিয়াটি, যা আধুনিক আলোকসম্পাতে অপরিহার্য, তারও উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটেছিল। কিন্তু এই নাটকে একটি ভূমিকায় দূরে পার্সপেক্টিভ-এ ছোট করেই প্রায় মডেলের মতোই কলকারখানা ও চিম্‌নির ধোঁয়াই কিছু দর্শক মনে রেখেছিলেন। এই নাটকের চরিত্রদের জীবনে আলো নেই, শুধু বিষম্ন দাবিদ্র্যের 'অ্যানিমিক্' চেহারা। নায়িকা দারিদ্র্যের তাড়নায় ব্লাডব্যাংকে বক্ত বিক্রয় করে; সেই দৃশ্যে কিছুটা লাল আলোর অর্থদ্যোতক ব্যবহার হয়েছিল। রঙীন আলোর ব্যবহার এই দু'বারই। বিষয়বস্তুতে রঙেব অভাব আলোক-পরিকল্পনায়, প্রকাশ করার সাধ্যমত চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই আলোক-পরিকল্পনাও হয়ত সার্থক নয়। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রাথমিক অসুবিধা ও নাটকের দুর্বলতা অন্তরায় ছিল।

এই মঞ্চের পরের নাটক 'সেতু'। 'সেতু'র সপক্ষে একটা বড় কথা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নতুন বা সৃজনধর্মী ব্যবহার। যে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের বিশেষ ব্যবহাবেই আলো এবং অন্ধকাবের 'ইম্‌প্যাক্ট' কাহিনী বা নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্তে ট্রেনের হুইস্‌ল্ ও শব্দেব সংযোজনায় নাটকের অভিনয়ের একেবারে মাঝখানেই অত্যল্প স্থায়িত্বেও দর্শকমনকে যে চাঞ্চল্য ও বিস্ময় চমকিত করে যায় সেই অনুভূতি নাটকের অভিনয়ের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা এবং কতখানি ক্ষতিকর ভাববার বিষয়। আঙ্গিকের এই ট্রেন নাকি বাংলার নাট্যমঞ্চের বুকের উপর দিয়ে সত্যিকারের ভালো অভিনয়ের সম্ভাবনাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এক হাজার চুরাশি বার চলে গেছে। ভাববার কথা অনেকগুলোই এসে যায়। মঞ্চের গতিশীলতার সঙ্গে সরাসরি মঞ্চ থেকে দর্শকের দিকে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ, প্রেক্ষাগৃহের থামে-দেয়ালে এবং আক্ষরিক অর্থে দর্শকের দেহে-মুখে সেই আলোর প্রত্যক্ষ স্পর্শ ও সঞ্চারণ, এবং শব্দ ও আলোর মাত্রা ও দিক পরিবর্তন নায়িকার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের 'হিস্ট্রিরিক্ ক্লাইম্যাক্স্'-এর মুখে যেভাবে যে effect সৃষ্টি করেছে দর্শকের মনে, এই রেলগাড়ির দৃশ্য নাট্যঘটনাচক্রের মাঝখানে না ঘটে যদি একেবারে শুরুতে কিংবা শেষ দৃশ্যের চূড়ান্ত আবেগের উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থিত করা হত, অথবা তর্কের খাতিরে টিকিট কেটে লোক জড় করে শুধুই নিছক মঞ্চে রেলগাড়ি দেখাবার আয়োজন করা হত, উপরোক্ত দৃশ্যে শব্দের যে মানসিক প্রক্রিয়া, তারও নিশ্চয়ই রকমফের ঘটত। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে ঐ দৃশ্য হয়ে দাঁড়াত আঙ্গিকের ম্যাজিক হিসেবে উপলক্ষবিচ্ছিন্ন 'শুধুই আলোর ভেল্‌কি'। এই নাটক যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের সুবিধার্থে এই দৃশ্যটির পারম্পর্য একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাক। এ নাটকে আমার মতে ঐ রেলগাড়ির দৃশ্য পর্যন্ত দৃশ্যসজ্জার মধ্যে মোটামুটি শাদামাটা একটা ভাব আছে, আলোয়-শব্দে কোনো উগ্র চমক নেই। আচমকা অপমানিতা ক্ষুব্ধা এবং অস্বাভাবিক উত্তেজিতা নায়িকার ভাবাবেগের সঙ্গে

আত্মহত্যার চিন্তা আমাদের এই দৃশ্যে নিয়ে যায়। হঠাৎ অন্ধকারে ধাবমান মোটরগাড়ির শব্দ, নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্তের সাস্‌পেন্‌স্‌, মঞ্চের অন্ধকার 'স্পেস্‌' অতিক্রম করে অতিদূরে ক্ষীণ সিগ্‌নাল-এর আলোকবিন্দু দৃশ্যমান হয়। ঐ নীল আলোকবিন্দুটি যে সিগ্‌নালের আলো তা হয়ত স্পষ্টভাবে সকলের চিন্তায় আসে না। অন্ধকার আকাশে বিষণ্ণ একাকিত্বের প্রতীক কোনো তারা বা অন্য কিছু বলেও বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই ভাবনা সচেতন রূপ নেবার আগেই ট্রেনের বাঁশি শোনা যায়—দূরাগত ট্রেনের একটানা ক্রমবর্ধমান শব্দের সঙ্গে দিগন্তরেখার কাছে একটি ক্ষীণ অথচ তীব্র আলোকরশ্মির আবির্ভাব এবং ক্রমাগ্রসরমানতার সঙ্গে গতিপথ পরিবর্তন করে দর্শকদের দিকে আলোকরেখার প্রক্ষেপণের সঙ্গেই ক্রমে আলো-শব্দের সমন্বয়ে একটা 'ক্রেসেণ্ডো'তে তোলা হয়। তারই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত অনভ্যস্ত দৃশ্যের ব্যাপ্তি, সমস্ত ল্যাণ্ডস্কেপ, 'সিলুয়েটেড্‌' গাছপালা, টেলিগ্রাফ পোলসহ দর্শকের চোখের সামনে নতুন চেহারায় গতিশীলতা লাভ করে। সেই চেহারা দর্শকের কল্পনার হিসেবের বাইরের চেহারা। পুরো ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দর্শকের চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করে। এই দৃশ্যের আগে সাধারণ সাদা আলোয় flat scenes চাপা অনুভূতির একেবারে contrast হিসেবে, চূড়ান্ত contrast হিসেবেই পুরো মঞ্চের সবটাই দর্শকের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করা হয়। অন্ধকারের অস্পষ্টতায় একটা অপরিচিত অজানা উন্মুক্ত প্রান্তরের অনুভূতি চোখকে মনকে এক লহমায় একটা নতুন অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়।

পূর্ববর্তী দৃশ্যের সমস্ত মানসিক অস্বাভাবিকতা নিয়ে সেই জনমানবহীন দৃশ্যে আলো ও শব্দের বিচিত্র পরিবেশে নায়িকা প্রবেশ করে। ক্রমে রেলওয়ে এম্‌ব্যাঙ্কমেন্টের suggestion হিসাবে রেললাইনেব মাঝখানে দৃশ্যের একমাত্র মানবচরিত্র অবস্থান করেন। যে রেলওয়ে এম্‌ব্যাঙ্কমেন্টে মঞ্চের 'লেভেল' থেকে সাড়ে ছয় ফিট সাত ফিট উঁচু, সেই এম্‌ব্যাঙ্কমেন্টে কার্টেন-লাইন ঘেঁসে পাদপ্রদীপের সামনে দিয়ে ঠিক দর্শকের একেবারে চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। আলো-শব্দ-দৃশ্যের প্রয়োগে এর পরে আরো কিছু effects সৃষ্টি করা হয়। শেষ মূহূর্তে আত্মহত্যা থেকে নায়িকাকে নিবৃত্ত করে স্বামী—তখন ধাবমান ট্রেনের গতিশীলতায় ট্রেনের জানালার suggestion হিসাবে চারকোণা আলোর moving square দ্রুত ছুটে যায়। এই পুরোদৃশ্য সংস্থাপনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে অনেকগুলো গোলমাল যে-কোনো সাধারণ দর্শক হয়ত আবিষ্কার করতে পারেন। যেমন: (১) যেখান থেকে সিগ্‌নালের আলো দেখা যায়, সেখান থেকে ট্রেনের আলো দেখা সম্ভব নয়। (২) ক্যাল্‌ভার্টের উপর ট্র্যাকের স্লীপার এবং লাইনের মাপ ঠিক তার উপরেই দাঁড়ানো 'হিউমান ফিগার'-এর মাপের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম ছোট। (৩) টেলিগ্রাফ পোল পার্সপেক্‌টিভ-এর খাতিরে অস্বাভাবিক রকম ছোট করা হয়েছে। (৪) জানলার কাটা কাটা আলোয় দৃশ্য শেষ, তার আগে সার্চলাইটের আলো—মাঝখানে 'ব্রিজিং' হিসেবে অন্য কিছু কম্পমান আলোর প্রয়োগ আছে। (৫) কাটা কাটা আলোর visual ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জনাই কাছের ট্রেনের শব্দের quality-র বদলে হঠাৎ সেই শব্দ কেটে ব্রিজের উপর দিয়ে ধাবমান ট্রেনের শব্দে ছন্দ ব্যবহার করা

হয়েছে। দূরের নীল আলোর বিন্দুটি তখনই লাল আলোয় পরিণত হয়।

এক কি দেড় মিনিটের মধ্যেই সমগ্র ঘটনাটি ঘটে যায়। অথচ তারই visual dramatic, spectacular impact-ই নাকি এই একটি নাটকের একাদিক্রমে পাঁচ বছর ধরে একটানা অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টির অন্যতম কারণ। নাটকের বিষয়বহির্ভূত না হয়েও এই দৃশ্যটি মানুষকে মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে—এ পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই সবিনয়ে সসংকোচে বলতে পারি।

'অঙ্গার'-এ আঙ্গিকের অপব্যবহারের অভিযোগ আরো এক ধাপ উঠেছিল। 'অঙ্গার'-এ কয়লাখনির কাহিনীতে কালো কয়লা, যান্ত্রিক পরিবেশ, খাদের অন্ধকার রহস্য, বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনার উত্তেজনা, এক্স্‌কাভেটর, ক্রেন, লিফ্‌ট্‌-এর ওঠানামা, কালো কয়লার grim কালোময়তার পটভূমিকায় মানুষের ট্র্যাজেডি। সনাতন, বিনু, রমজান, গফুরের মতোই লিফ্‌ট্‌হেড্‌, ক্রেন, বেলচা, গাঁইতি, টর্চ এবং গ্যাস ধোঁয়া অন্যতম জীবন্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'অঙ্গার'-এর পুরো স্ট্রাক্‌চারের বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কয়লাখনি shotfirer-এর কোয়ার্টারের প্রথম দৃশ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। পরে আলো কমে আসে, অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে এবং শেষ দৃশ্যের আগে রেস্‌কিউ দৃশ্যে কম্পোজিশন আলোকবিন্যাসে নানান চিন্তা এসেছে। যেমন দৃশ্যের অসহ্য অস্থিরতাকে একটি আলোর মালার ক্রমান্বয়ে জ্বলা-নেভা (flickering) ব্যবহৃত হয়েছে। সেই মুহূর্তগুলি মুনাফালোভী খনিকর্তৃপক্ষের আরেকটি বিস্ফোরণের সাহায্যে মাটির নিচের খাদগুলিকে জলপ্লাবিত করে দেওয়ার ঘোষণা ও সেই ঘোষিত বিস্ফোরণ actual ঘটনার মধ্যেকার সাস্‌পেন্‌স্‌-এর মুহূর্তগুলি। কোন একটি মুহূর্তে পুরো রেস্‌কিউ ফীল্ডে একমাত্র আলোর source হিসাবে এই জ্বালা-নেভা কেই রাখা হয়েছে। রেস্‌কিউ অপারেশনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও হতাশার চূড়ান্ত বেদনাকে রূপ যেওয়া হয় দৃশ্যের শেষে মাত্র কয়েকটি অস্পষ্ট লাল আলোকরেখার সাহায্যে, পিট্‌হেড্‌-এর ফ্রেম ও চাকার একটি অংশকে অমঙ্গলসূচক ও ভয়ংকর এক, dominating solitary presence দিয়ে, চাকা ও ফ্রেমের গায়ে লাল আলোর আঁচড়ের অশুভ ইঙ্গিতে। কিন্তু 'অঙ্গার'-এর আলোকসম্পাত সম্পর্কেও উচ্ছ্বাস শেষ দৃশ্যের জলোচ্ছ্বাস নিয়ে।

তার আগে পাতালপুরীর অন্ধকারের অস্তিত্বকে আলোকিত করে, অথচ শ্বাসরোধকারী গুমোট অন্ধকারের অনুভূতি বজায় রাখার দুরূহ চেষ্টা হয়েছিল। অন্ধকারকে দেখাতে হবে, অথচ আলো দিয়েই দেখাতে হবে। অন্ধকারের এই রূপ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এমন আলোর উপকরণের প্রয়োজন হল যা কোনো-একটি দলের পক্ষে সেই সময়ে পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ তখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এই উপকরণ আমদানী করতে গেলে যে-টাকা লাগত, তা লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের ছিল না, তাছাড়া আমদানী করতে সময়ও লাগত আরো অন্তত ছ' মাস। মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যাপারে যন্ত্রপাতি ধার করে বা ভাড়া করেও কাজ চালানো যেত না। একটা নিষ্ফল আক্রোশে হতাশায় যখন এই দৃশ্যের মঞ্চরূপায়ণ আলো ও সেট্‌-এ অসম্ভব বলে ধরে নিতে প্রায় বাধ্য হয়েছি, তখন শেষ হিসেবে মানসিক যুদ্ধক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ জানালাম আমার দেবতাকে, আমার শত্রুকে, আমার অনুপ্রেরণাকে। চ্যালেঞ্জ জানালাম আলোকেই। প্রতিপক্ষকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। প্রশ্ন করলাম : আলো কি? কী তার বৈশিষ্ট্য? imported stuff দিয়ে

কী হয়? এবং সেই উপকরণ হাতে না থাকলে কি শেষ পর্যন্ত দেশের থিয়েটারের সাংগঠনিক দুর্বলতা, সরকারী ঔদাসীন্য, অর্থনৈতিক অসহায়তা ও শিল্পীর অক্ষমতাকে দায়ী করে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার আয়োজনই করতে হবে? শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। যা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন এবং পাঁচ-ছ' হাজার টাকার জায়গায় খরচ হয়েছিল উনত্রিশ টাকা আট আনা। Imported stuff আমদানীর সর্বনূ্যন ছ' মাসের জায়গায় আমাদের লেগেছিল তিন ঘণ্টা। জীবনের না-থাকা না-পাওয়ার প্রতিবন্ধকতার প্রতিকূলতায় যেমন মানুষকে ভাবায়, শেখায়, থিয়েটারও তেমনি ভাবায়, শেখায়, নিত্য নতুনতর পথ দেখায়—'অঙ্গার'-এর উদ্বোধনের তিন দিন আগে যেমন দেখিয়েছিল আমাদের। কতগুলো লজেন্সের বিস্কুটের ভাঙা পুরনো টিন এবং সাবেক মিনার্ভা থিয়েটারের মরচে-ধরা Exit নির্দেশক টিনের খোলের সাহায্যে অসংখ্য mirror-spot, float-spot এবং optical projector-এর কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কীরকম কাজ চলেছিল তার প্রমাণ শেষ দৃশ্যের জলোচ্ছ্বাসে টিনের কৌটোয় পেরেকের ফুটো দিয়ে প্রতিফলিত আলো আল্‌কাথীনের চাদরে জলোচ্ছ্বাসে বাংলা তথা ভারতীয় "সৎ" থিয়েটারশিল্পের সম্ভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থেকেই বোঝা যায়।

'অঙ্গার'-এর শেষে জলপ্লাবনে দর্শকমনে সহসা যে উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, তাও বাস্তবিক বিচ্ছিন্ন নয়। এতক্ষণ ধরে অন্ধকারের দম আটকানো পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠা মন জলের সাড়া পেয়েই একটা অদ্ভুত প্রাণোচ্ছল মুক্তির বোধ লাভ করে। শৈল্পিক ফর্ম হিসেবে আঙ্গিকের সুপরিকল্পিত প্রয়োগে অনুভূতির এই transition রচনা নিশ্চয়ই নিছক হাততালি কুড়োবার ব্যবসায়িক চেষ্টা নয়। দর্শকের মনের গভীর আশঙ্কা এসে অবসাদ ও বিষাদকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে এক নাটকীয় সমাপ্তি রচনার সাফল্যেই আঙ্গিকের এই প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য।

উপসংহারে 'কল্লোল'

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, থিয়েটার অনেকগুলি শিল্পকর্মের সমন্বয়। এর প্রতিটি অঙ্গের স্বকীয় সম্ভাবনা, নাটকেরই দাবিতে, প্রসারিত হয়। নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর মতনই এক-একটি অঙ্গ দৃশ্যবিশেষে বা নাটকবিশেষে প্রাধান্য লাভ করতে পারে, অর্কেস্ট্রায় যেমন অংশবিশেষে কোনো বিশেষ যন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। এই প্রক্রিয়ারই সর্বাধুনিক উদাহরণ উপসংহারে আলোচ্য। বহু আলোচিত ও বহুবিতর্কিত উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকে দৃশ্যপট রচনা, আলোক, সংগীত, শব্দের আকর্ষণের গুরুত্ব বা আবেদন হয়ত থাকতই না, যদি নাট্যবস্তুর মধ্যে এক অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, রাজনৈতিক বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা বা শ্লেষ এবং হয়তো নানা কারণে আজকের দিনের ঝিমিয়ে পড়া হতাশ বিভ্রান্তিকর বিষণ্ণতার মধ্যে বহুকাল পরে বা হয়তো এই প্রথমই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও ভাবে একটি পৌরুষদীপ্ত বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা না থাকতো। কর্তৃপক্ষীয় অস্বস্তি, বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা ও বিরোধিতা কাটিয়েও 'কল্লোল' যে সাড়া জনমনে নাট্যজগতে আজকের এই রাজনৈতিক বিভ্রান্তির অসহায়তার মধ্যেও এনেছে, তারই উত্তেজনায় 'কল্লোল'-এর জাহাজ, বয়লার রুমের দৃশ্যবৈচিত্র্য 'কল্লোল'-এর আলোকবিন্যাসে এত

জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শেষ কথা বলা যায়, একটা বিশ্বজনীন ভাষায় থিয়েটারের বিভিন্ন অঙ্গকে সার্থকতায় আনার অন্যতম বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তের 'কল্লোল' এক নির্ভীক চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে এই নাটকের প্রয়োজন ছিল।

'ছেঁড়া তার' থেকে 'কল্লোল'-এর এই ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক imperfections-এর মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত অনেক দুর্বলতা থেকে গেছে। কিন্তু এইটুকু জানি, পেশাদারী বা অপেশাদারী মঞ্চে যেটুকু কাজ করা গেছে, থিয়েটারের নতুন আলোর ভাবনা ও সম্ভাবনাকে যতটুকু সঞ্চার করে দেওয়া গেছে, আদর্শ, চিন্তা বা ফর্মের দিক থেকে আরো সম্পূর্ণ বা সার্থক নাটক বা প্রযোজনার জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে সেইটুকুও তো সম্ভব হত না এবং এইটেকেই আমি বলি 'পজিটিভ্ অ্যাক্শন'।

থিয়েটার, সিনেমা : সম্পর্কের সঙ্কট

বয়সে বড় থিয়েটার

মঞ্চের নাটক ও অভিনয় আমাদের দেশেও পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশের মতই বয়োঃজ্যেষ্ঠ। স্বভাবতই চলচ্চিত্রের আদি পর্বে থিয়েটার থেকে অভিনেতার ট্যালেন্টকে ধার করতে হয়েছে। আমাদের নবনাট্যের প্রথম কীর্তি "নবান্ন"-এর নতুন সাড়া জাগানোর আগের যুগেও পাশ্চাত্য থিয়েটারের ঢঙে গড়ে ওঠা বাংলা থিয়েটার (লেবেডেফ-গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমারের ঐতিহ্যে লালিত) এবং-ভ্রাম্যমান পার্শী থিয়েটার দলেই, বোধ করি, অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে চলন্ত সজীব বায়োস্কোপেরও একটা আকর্ষণ ছিল। সে ছবি নির্বাক, কিন্তু আলোছায়ায় গড়া ছবি দ্রুত পা ফেলে চলছে, লাফাচ্ছে ইত্যাদি মজাদার তাজ্জব ঘটনার সমাবেশ। এই সময় থেকেই চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের অশুভ-শুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের যে অনলস সাধনা ও চর্চা দেশে বিদেশে আজ চলেছে, তারই ফলে শিল্পের নতুন নতুন ফর্ম আসরে অবতীর্ণ হয়েছে—একের পর এক আমরা পেয়েছি নাটকাভিনয়ের জন্য ফোনোগ্রাফ, গ্রামোফোন, অচল ছবিকে সচল করবার বায়োস্কোপ এবং তাকে কথা বলাবার জন্য আজকের সবাক ফিল্ম, তাকে আরও জীবন্ত করার জন্য রঙীন ছবি ত্রিমাত্রিক ছবি সিনেমাস্কোপ এবং আরো হাজারো রকমের 'স্কোপ'। ক্রমে এসেছে রেডিও এবং সাম্প্রতিকতম টেলিভিশন। সর্ব প্রাচীন 'পার্ফমিং আর্ট' হিসেবে সংগীত নৃত্য ও নাট্যের অভিনয়মঞ্চকে পরবর্তী কালের উক্ত আবিস্কারগুলির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে রেডিয়ো, গ্রামাফোন বা সিনেমার অনেকগুলো চমকপ্রদ উপাদান এই আদিম ফর্মের আয়ত্তে না থাকার ফলে থিয়েটারের অন্তিম অঙ্কে উপনীত হওয়ার আশংকা সবদেশেই থিয়েটারের লোকদের চিন্তিত করে তুলেছে। পৃথিবীব্যাপী এই সমূহ প্রতিযোগিতার মধ্যে এদেশের সংকট অবশ্য থিয়েটার ও সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমাবদ্ধ।

আজ যখন বাংলা নাট্যজগতের নাট্যসৃষ্টির এক নতুন পর্বে সৃজনশীল ক্ষমতাবান শিল্পীদের মধ্যে অনেককেই মঞ্চ ও চিত্রজগতের মধ্যে সময় ও ট্যালেন্ট ভাগ করে দিতে হচ্ছে, তখনই বিশেষ করে এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। থিয়েটারের লোকেদের সিনেমাপাড়ায় আনাগোনা, সিনেমার জনপ্রিয়তাকে থিয়েটারে কাজে লাগানো, বা থিয়েটারের জনপ্রিয়তাকে সিনেমায় ব্যবহার—এর ভালোমন্দ দুইই আছে, এবং ব্যাপারটা নতুন নয়। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে মাঝামাঝি এক জায়গায় এদেশে চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের প্রথম যুগে থিয়েটারে অর্জিত জনপ্রিয়তাকে চলচ্চিত্রায়িত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। যখন ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বা মেলায়, রঙ্গালয়ের অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে, কিংবা কলকাতার দুয়েকটিমাত্র প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে, তখন থেকেই অপেরা থিয়েটারের সঙ্গে 'কম্‌প্রোমাইজ্‌' বা

'অ্যাকমোডেট্' করার ব্যাপারটা চালু হয়ে যায়, যেমন আজকেও নিউ এম্পায়ার নিয়মিত সিনেমা শো বন্ধ করে থিয়েটার হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া দেয়। তখন শুধু থিয়েটারের শিল্পীদেরই নয়, সাহিত্যের জনপ্রিয়তাকেও কাজে লাগিয়ে সিনেমা প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কপালকুণ্ডলা', 'বেন্‌হুর', 'লাস্ট্ ডেজ্ অফ্ পম্পিয়াই', 'অল কোয়াএট' অবলম্বনে ছবি তৈরি হচ্ছে।

এই সময়ে শিশিরকুমার চলচ্চিত্র সৃষ্টির চেষ্টায় নেমেছিলেন। ভ্রাম্যমান পার্শী নাট্যসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী মালিক ম্যাডান কোম্পানিও প্রথম যুগে চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই যুগে দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ উভয় জগতের সাফল্যের সঙ্গে আসা যাওয়া করেছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী ও নরেশ মিত্র প্রথমে থিয়েটারে, পর চলচ্চিত্রে উভয় ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মধু বসু, সতু সেন ও মন্মথ রায় উভয় ক্ষেত্রের সঙ্গেই দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। বিদেশেও নতুন ফর্ম হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠা লাভের কালে চলচ্চিত্রে সারা বার্ণহার্ড বা ফর্বস্ রবার্টসনের অভিনয় কিংবা এমিল্ জ্যানিংস অভিনীত 'ওথেলো'র চিত্ররূপ উল্লেখযোগ্য।

থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের মধ্যে শিল্পীদের এই আদান প্রদানের ব্যাপারটা আজকের দিনে নতুন গুরুত্ব ও জটিলতায় পৌঁছে গেছে, ভাবতে হচ্ছে, নাট্যপরিচালকের ক্রিয়েটিভ্ আর্টিস্ট্ হিসাবে চলচ্চিত্রের দায়িত্ব পালনে মঞ্চের প্রতি তাঁর দায়িত্বপালনে কোন বিঘ্ন ঘটছে কিনা। আজ বাংলাদেশে নতুন থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ডাইন্যামিক অপেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর কর্মসূচীর মধ্যে থিয়েটার 'কলেক্টিভ্ আর্ট ফর্ম' বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, বিষয়ে ও আঙ্গিকে পরীক্ষানিরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে, সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও তার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনসংগ্রামের হয়ত অংশীদার হওয়ার দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়েছে। এই সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যৌথ আত্মত্যাগ এবং সংঘশক্তিই অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা। ঠিক এই জায়গাতেই আজ চলচ্চিত্রের এই আকর্ষণ দ্বিবিধ। প্রথমত, ব্যবহারিক দিক থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিচিতি, জনপ্রিয়তা এবং আর্থিক ও অন্যজাতীয় 'স্টেবিলিটি'-র সুযোগ নাটমঞ্চের ক্ষুদ্র পরিসরের আপাতচিন্তায় সাময়িক সাফল্যের তুলনায় স্বভাবতই অনেকাংশেই বেশি। দ্বিতীয়ত, আজকের উন্নত যন্ত্রায়নের অধিকতর সহজ প্রাপ্যতায় চলচ্চিত্রের যে-কোন আধুনিক 'ইম্যাজিনেটিভ্ আর্টিস্ট্'-এর সামনেই সিনেমাকে শিল্প হিসেবে ব্যবহার করার অবশ্যম্ভাবী তাগিদ আসবে।

দুই জগতের আকর্ষণ

একটু পিছিয়ে গিয়ে ভাবতে শুরু করলে গিরিশোত্তর যুগেই শিশিরকুমার নতুন শিল্পচেতনার স্পন্দন তুলেছিলেন, এবং মোটামুটি ঐ সময়েই অন্যদিকে ব্যবসা ও শিল্পের ভিত্তিতে নির্বাক চলচ্চিত্র থেকে সবাক চলচ্চিত্রের উত্তরণ ঘটে। প্রথমে ম্যাডান কোম্পানী প্রভৃতি কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পস্থায়ী প্রচেষ্টার পর প্রধানত কিছু তথাকথিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্র নির্মিত হয়। তারপরই ত্রিশের দশকের গোড়া থেকেই নিউ থিয়েটার্স-এর নেতৃত্বে নতুন বাংলা সিনেমা শিল্পের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়, এবং অতি

স্বল্পকালের মধ্যেই ‘পূর্ণ’ এবং ‘চিত্রা’ সহ একাধিক নতুন চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একদিকে নব্য বাংলার সংস্কৃতিবান মানুষ শিশিরকুমারের মঞ্চপ্রচেষ্টায় আগ্রহ বোধ করতে থাকেন। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদকেই মূলধন করে পুরনো ধারাও পুরনো ধরনেই পাশাপাশি চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভিন্নধর্মী নাটকগুলি এই সময়ে রচিত হতে থাকলেও বাংলাদেশ তার যথার্থ পরিচয় পায় প্রায় এক যুগ পরে। এই সময় থেকে ক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত তিন-চারটি স্থায়ী রঙ্গালয়কে অবলম্বন করেই বাংলা থিয়েটারের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। এ সময় কিছু প্রতিভাধর নাট্যশিল্পী থিয়েটারের প্রতি দর্শক সমাজের আকর্ষণ বজায় রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই সময়ে মঞ্চব্যবস্থায় আধুনিকতার প্রমাণস্বরূপ ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন, শিল্পসম্মত আলোকসম্পাতের অভিনবত্ব ইত্যাদি চলচ্চিত্রের থেকে দর্শকের মনোযোগ অত্যল্পকালই ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও ‘স্পেক্‌ট্যাকুলার’ দৃশ্যের অবতারণাতেও তেমন ফল হয়নি—থিয়েটার ব্যবসায়ের ক্ষীয়মান আলো আরো নিষ্প্রভ হয়েছে। এখন মোটে তিন চারটি থিয়েটার—কিন্তু কোনটাতেই যেন আসর ঠিক মত জমে উঠছিল না। মাসান্তে ঠিক সময়ে মাইনে না পাওয়া, নাম-করা শিল্পীদের অমুক থিয়েটাব থেকে অমুক থিয়েটারে ‘স্থায়ীভাবে যোগদানের’ প্রচার—এরই মধ্যে শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু, দুর্গাদাস তাঁদের একক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা নিয়ে দর্শকদের ধরে রাখতেন। অন্য দিকে নতুন চিত্রগৃহের আধুনিক কেতার সাজসজ্জা এবং জনপ্রিয় সাহিত্যকীর্তির চিত্ররূপ নিত্যনতুন দর্শক সমাগমে চিত্রগৃহকে তথা চলচ্চিত্র ব্যবসায়কে জনপ্রিয় কবে তুলছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের কাঠামোয দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় ধর্মীয় উপাখ্যানের নাট্যরূপকে উপজীব্য কবে থিয়েটারের তখন অপেক্ষাকৃত বিবর্ণ বিষণ্ন জীবনযাপন।

থিয়েটারে বিদ্রোহী মতবাদঃ নবান্ন থেকে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক দুর্যোগ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কালোবাজার কালো টাকার বিচিত্র খেলার মধ্যেই বিদ্রোহী রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে ঐ বিষম অন্ধকার ভেদ করে এক নতুন শিল্পচেতনার সূত্রপাত হয়। এই নব প্রাণোদ্‌গমের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি নবনাট্যের চিন্তায় সচেতন কিছু শিল্পী ও নাট্যকর্মীর বলিষ্ঠ সংঘবদ্ধ প্রয়াস গণনাট্য সংঘের ‘নবান্ন’ ও তার পরবর্তী শিল্প প্রচেষ্টা। এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থিয়েটার অর্থে বোঝাতো পূজো পালাপার্বন উপলক্ষে সৌখীন নাট্য সমাজের সাময়িক কর্মতৎপরতা। এই কর্মতৎপরতায় অবশ্য এতকাল কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত ও মুদ্রিত নাটকাবলী অনুসরণেই নাটক অভিনীত হয়ে আসছিল। নিজেদের নাট্যকারের লেখা নাটক অভিনয়ের উদ্যম বা প্রচেষ্টা যে একেবারেই হয়নি, এমন কথা অবশ্য জোর করে বলা যায় না। কিন্তু বিশেষ একটি আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা নিয়ে নিপীড়িত মানব সমাজের চিন্তা এবং তার সংগ্রামের ভাবনাকে প্রধান উপজীব্য করে নবতর ভঙ্গিতে ও আঙ্গিকে ‘নবান্ন’-র নাট্য প্রকাশ স্পষ্টতই নতুন উদ্দীপনা ও চমক সৃষ্টি করেছিল। এই নতুন ধরনের নাট্যচিন্তা এবং নতুন শিল্পীদের বাস্তবধর্মী জীবন্ত অভিনয় ধারা আগের অভিনয়, প্রযোজনা ও পদ্ধতি থেকে এমনই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে হাজির হয়েছিল যে আজকের জনপ্রিয় নাটকের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক রজনী অভিনীত হলেও জনচিত্তে তার চাঞ্চল্য লেখক মহলে, পেশাদারী

থিয়েটারে এবং চলচ্চিত্র শিল্পের একাংশকেও হঠাৎ থমকে ভাবতে বাধ্য করেছিল। এবং আরেকবার থিয়েটারের নতুন সম্ভাবনা ও নতুন জাতের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল। এই কাজে লাগানোর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অন্যায় বা অবাঞ্ছনীয় নয়, বা সমগ্রত ব্যবসায়বুদ্ধি প্রণোদিত, তাও নয়। এই শিল্পীদের, এই নতুন তারকাদের নিয়েই সেদিন একটি ছবি তৈরী হয়েছিল, যার ক্রেডিট টাইটেল্‌-এ বোধহয় সেই ঘোষণা ছিল—People's Theatre Stars the People 'নবান্ন'-এর শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি ভাদুড়ী 'নবান্ন'-এর অনুপ্রেরণায় চলচ্চিত্রায়িত আব্বাসের 'ধরতি কী লাল'-এ অভিনয় করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ডেভিড, বলরাজ সাহনি, জয়রাজ, সঙ্গীতে রবিশংকর। বাঙলাদেশেও নিমাই ঘোষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদেব জীবনালেখ্য চলচ্চিত্রে সৃষ্টি করলেন। তাঁর তারকামালার মধ্যে ছিলেন 'নবান্ন'-এর গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শোভা সেন এবং গণনাট্যের নবান্নোত্তর শিল্পীবৃন্দ। নিমাই ঘোষের এ ছবিতেও বাংলা ফিল্ম-এর চির পরিচিত নায়ক-নায়িকা, সঙ্গীত, ড্রয়িংরুম, ঐশ্বর্য বৈভব অনুপস্থিত। সদ্য বিভক্ত বাংলার নাড়ী ছেঁড়া বেদনার হাহাকার, স্টুডিও চত্বরের বাইরে বাস্তব ট্রেনের বাস্তব ফোটোগ্রাফি নিয়ে বলিষ্ঠ, স্পষ্ট জীবনচিন্তার এই প্রকাশ মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক যোগাযোগ ও যৌথ পদক্ষেপের একটি ঐতিহাসিক মাইলস্টোন।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে নিউ থিয়েটার্স প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, দেবকীকুমার বসুর সৃষ্টিতে সায়গল, কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গীতে সারা ভারতের জনচিত্তকে জমজমাট করে রেখেছিলেন, সেই নিউ থিয়েটার্স-এর হাতীর ছাপ নিয়েই এক অখ্যাত পরিচালক এর কিছু আগেই আরেক নাম না জানা কাহিনীকারের চিত্রনাট্য অবলম্বনে কয়েকজন সম্পূর্ণ অচেনা অতারকা নিয়ে ছবি সৃষ্টি করেছিলেন। এ ছবিতে সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য, শোষণ, অত্যাচার, ধর্মঘট, মিছিল, শ্রমিকবস্তি ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল। নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক, সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল ছাড়া এই ছবিতে আরেকজন পরিচিত শিল্পী ছিলেন, যাঁকে দর্শকেরা মঞ্চের শিল্পী বলে চিনতেন। অপরিচিত পরিচালক বিমল রায় যে একজন পরিচিত অভিনেতাকে তাঁর এই ছবিতে স্মরণীয় চরিত্রে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর নাম বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। এই ছবিতে তাঁর অভিনয়ের অপূর্ব গম্ভীর ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবেই স্মরণীয়। চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের সচলতায়, কম্পোজিশনের বৈচিত্র্যে 'উদয়ের পথে'র চিত্রনাট্যে ও সামগ্রিক presentation-এ চলচ্চিত্র শিল্পের বিশেষ নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর স্বীকৃতি ছিল।

এমারেলড রূপবাণীঃ ব্যবসায়িক বিরোধ

ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে গেছে। অবশ্য বিষয় বিচারে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক কাহিনী এবং সাহিত্য-কীর্তির ব্যাপক পরিচিতির সুযোগই গ্রহণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের জন্য লিখতে গিয়ে শৈলজানন্দ ও প্রেমাংকুর আতর্থী শরৎচন্দ্রের সেন্টিমেন্টাল রোম্যান্টিক রীতিকেই হুবহু অনুসরণ করে গেছেন। তবু ষোল আনা বাঙালী মেজাজেই সিনেমা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিত্রা, পূর্ণ বা রবীন্দ্রকৃত নামকরণ রূপবাণী, এইসব নামেও বাংলা রুচি ও ভাবনা অনুভব করা যায়।

উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় শহরে উপকণ্ঠে এবং বাইরেও বহু সিনেমা গৃহের উদ্বোধন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে অস্বাভাবিকভাবে জমানো টাকার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই চিত্র ব্যবসায়ে নির্মাণ পদ্ধতিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসে। এতদিন স্টুডিয়ো মালিকেরাই চিত্র নির্মাতা ছিলেন। এই সময় থেকেই একাধিক স্বাধীন প্রযোজক স্টুডিও ভাড়া নিয়ে ছবি করতে থাকেন। এই নতুন ব্যবস্থার ভালোমন্দ আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। একটার পর একটা ছবির জনপ্রিয়তা, টিকিটের অপেক্ষাকৃত কম দাম, চলচ্চিত্রকে এমন একটা সর্বজনস্বীকৃত এন্টারটেনমেন্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করল যে অন্যদিকে থিয়েটার ব্যবসায়িকভাবে তখন বিপর্যস্ত। এমারেল্ড, স্টার, গ্রেট ন্যাশনাল—সত্তর আশি বছর ধরে শুধু এই হাত বদল নাম বদলই চলছে। রূপবাণী, চিত্রা, পূর্ণ, উত্তরার অনেক পরে শিশিরকুমারের হাতেই থিয়েটার গৃহের বাংলা নামকরণ হয়—প্রথমে নাট্যমন্দির, পরে শ্রীরঙ্গম। পরিবেশে টিকিটে ইত্যাদিতে দেশী ভাবও প্রথম আসে শিশিরকুমারের থিয়েটারেই।

এই সময়ের পরেও দুটি নাট্যগৃহ নাট্যমন্দির ও নব-নাট্যমন্দির শ্রী ও গ্রেস চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যবসায়িক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আরো দু' একটি নাট্যগৃহের চিত্রগৃহের লাভজনক নিশ্চিত ব্যবসায়ের পথে যাওয়ার অশুভ অসমর্থিত সংবাদ আজও মাঝে মাঝে কানে আসে একদিকে ষাট সত্তরটি চিত্রগৃহ, অন্যদিকে বহুদিন ধরেই চারটি থিয়েটারকে ভিত্তি করে যে নাট্য প্রচেষ্টা, তার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি বা দুর্বলতা সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে যে, এরাই পাদপ্রদীপের শিখা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখে এসেছে। এই চারটি থিয়েটারের একটানা বেঁচে থাকার ঘটনাও সারা ভারতের নাট্য মানচিত্রে একক উদাহরণ। তবু সংস্কৃতির বিশেষত নাট্য সাহিত্য ও নাট্য সংস্কৃতির শীর্ষস্থান কলকাতার মাত্র চারটি নাট্যগৃহের অস্তিত্বকে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক তোলপাড়ের মধ্যে এই চারটি থিয়েটারের জীবনেও জরাজীর্ণ, ভেঙে পড়া অবসাদের ছাপ পড়েছিল। শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম সহ উত্তর কলকাতার চারটি নাট্যগৃহে এবং দক্ষিণে কালিকার এই সময়ের জনপ্রিয়তা ও লোকসমাগম সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু কী চেহারা সেই থিয়েটারের? অভ্যন্তরীণ সংগঠনের মধ্যে অভিনবত্ব বলতে ছিল রিভলভিং স্টেজের পুঁজি ও টাটকা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। তখনকার থিয়েটারে রিভলভিং স্টেজ বা cover-discover এর ফর্মূলায় প্রয়োগপরিকল্পনা, বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় দিক্‌পাল অভিনেতাদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় এবং অনেকাংশেই মেলোড্রামার অপরিমিত প্রভাব প্রকট। সিনেমার তুলনায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আসনের ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকা, মেঝের পানের পিক এবং মঞ্চের পর্দায় দাদের মলম থেকে মুস্কিপাতি জর্দার বিজ্ঞাপনের কুৎসিত অলঙ্করণ কিছুতেই আর নিয়মিতভাবে সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর্শক টানতে পারছে না। একেবারেই ধরাবাঁধা এক দর্শকগোষ্ঠীর মধ্যেই থিয়েটারের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই দর্শকগোষ্ঠীর বৃহদংশই ছিলেন মফস্বল থেকে কলকাতায় বেড়াতে আসা লোক এবং কিছু নিষ্ঠাবান নাট্যামোদী। শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমের আসরেও সেই একই অর্থনৈতিক সংকট দেখে তাঁর ভক্ত তরুণসমাজও সেদিন থিয়েটারকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার সাহস পাননি। যে ধারায় নাটক পরিবেশিত

হত, অর্থাৎ ঘন ঘন নাটক বদলে, তাতেই এই অর্থনৈতিক সংকটেব বীজ নিহিত ছিল। এক নাটকেব একটানা অভিনয় পঞ্চাশ কি একশো বাত্রি ধবে চললেই তা অস্বাভাবিক সাফল্যেব মাপকাঠি বলে ধবা হত। একটি থিযেটাবেব অর্থনৈতিক স্থিবতাব জন্য একটি নাটকেব যতখানি জমা উচিত, যে বেভেনিউ থিযেটাবকে সাবা বছব stable কবে বাখতে পাবে, সেই ধবনেব একটানা সাফল্য থিযেটাবেব জীবনে তখনও আসেনি। যদিও 'নবান্ন' ব পবেই তুলসী লাহিড়ীব 'দুঃখীব ইমান' এব মত বাস্তবধর্মী বিষযবস্তু গ্রহণ কবে শিশিবকুমাব নবনাট্যেব নবচিন্তাকেই উৎসাহ ও স্বীকৃতি দিযেছিলেন, তবু সাতচল্লিশেব স্বাধীনতাপ্রাপ্তিব কিছু আগে পর্যন্ত শবৎচন্দ্রেব কাহিনী এবং দেশপ্রেমেব অনুপ্রেবণায ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকই অবিচ্ছিন্ন ধাবায অভিনীত হযে এসেছে। একদা যেমন চলচ্চিত্রেব আবির্ভাবে নাট্যজীবন বিচলিত হযেছিল, সামযিকভাবে জনপ্রিযতা হাবিয়েছিল, ঠিক তেমনই সেদিনকাব নাট্যব্যবসাযীবাও তাঁদেব সেই সমযকাব ব্যবসাযেব ম্রিযমাণতাব মধ্যে নবনাট্যেব বিস্ময়কব জনপ্রিযতায ব্যবসাযিকভাবে বিচলিত হযে বেশীদিনেব জন্য তাঁদেব মঞ্চ এই নতুন নাটকওযালাদেব ভাড়া দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন। এই বকম ঘটনা আত্মবক্ষাব সহজাত তাগিদেই ঘটে থাকে, এবং এবকম দৃষ্টান্ত আজও বিবল নয। একই মঞ্চে পবিবেশিত দুই নাটকেব জনপ্রিযতাব আকর্ষণেব তাবতম্যে অপেক্ষাকৃত অক্ষম বা দুর্বলেব পক্ষে হযত ঐ ব্যবহাবই স্বাভাবিক।

থিয়েটার থেকে সিনেমায় : শিল্পীর সমস্যা

যে সমযে অর্থকবী দিক একজন শিল্পীব জীবিকানির্বাহ বা পবিবাব প্রতিপালনেব দিক থেকে আকর্ষণীয নয, থিযেটাবে যখন ভবিষৎ স্থিবতাব কোন সর্বনূন্যন গ্যাবান্টিও নেই, সেই সময়েই চলচ্চিত্র ব্যবসাযে সংশ্লিষ্ট শিল্পীবা খ্যাতি ও সন্তোষজনক অর্থোপার্জনেব একটা স্তবে এসে পৌঁছেছিলেন। গণনাট্য সংঘেবও বিভিন্ন পর্যাযে নানান শিল্পী বিভিন্নভাবে চলচ্চিত্রে যুক্ত হতে থাকেন। সত্যেন বসুব 'পবিবর্তন', 'ববযাত্রী' ইত্যাদিতে সলিল চৌধুবী ও কালী বন্দ্যোপাধ্যাযেব যোগদান উল্লেখযোগ্য। এইসময়ে থিযেটাবেব সঙ্গে শিল্পীব সম্পর্ক প্রধানত কতকগুলি নাট্যসংস্থাব মধ্য দিয়েই—এই সম্পর্ক অপেশাদাবী ও অব্যবসাযিক, এক্ষেত্রে কেবল মহৎ আদর্শেব অনুপ্রেবণায নিছক শিল্পসৃষ্টিব প্রেবণায নিষ্ঠা ও নিযমানুবর্তিতাব সঙ্গে নাট্যসংস্থাব মধ্যে নাট্যচর্চা ও অনুশীলন স্বাভাবিকভাবেই শিল্পী বা অভিনেতাব কাছে প্রত্যাশিত। খেয়ে পবে বেঁচে থাকাব দাযিত্ব প্রত্যেকেবই নিজেব নিজেব পদ্ধতিতে ঠিক কবে নিতে হয়েছে—অফিসে চাকবি কবে, ইনস্যুবেন্স্-এব দালালি কবে, ছবি এঁকে, খববেব কাগজে বিপোর্টাবগিবি কবে, প্রাইভেট টিউশন কবে, যেভাবেই হোক না কেন! আমাব মত বিশেষ ট্যালেন্টেব লোকদেব নিত্য নতুন ধাব কববাব অভিনব থেকে অভিনবতব বাস্তা আবিস্কাব কবতে হয়েছে। অনেকেব সামনে নিজেদেব ক্ষমতাবলে অথবা ঘটনাচক্রে তাঁদেব শিল্পপ্রতিভাব একটা অংশ অন্যত্র ব্যবহাব কবেও অর্থোপার্জনেব সম্ভাবনা ছিল যেমন চলচ্চিত্রাভিনযে, বেতাবাভিনয়ে, নাটকবচনায়, বা অফিস ক্লাবেব নাটক পবিচালনায়। এই প্রয়োজনেব তাগিদেই অনেক থিয়েটাবকর্মী শিল্পসৃষ্টি এবং জীবিকার্জনেব পথ হিসেবে চলচ্চিত্রশিল্পে নিজেদেব নিয়োজিত কবেছেন। এখানে খ্যাতিব বহবটা বেশ বড় বকমেবই, আব টাকাব অঙ্ক নাটকেব জীবনে যা তখন পাওয়া সম্ভব ছিল না বা আজও যায

না, সেই পরিমাণ টাকা এখানে সহজলভ্য। যে-কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেই তিনি কবিই হোন আর অভিনেতাই হোন; তাঁর শিল্পকীর্তির প্রতি সমাদর ও আগামী দিনের প্রশংসার প্রত্যাশা প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক শিল্পসৃষ্টির মূলে সমস্ত অনুপ্রেরণার প্রভাব ঘটবে—থিয়েটারের শিল্পীর সৃষ্টিব সার্থকতা দর্শকের সামনে নিজের শিল্পপ্রয়াসকে হাজির করা, এবং যে শিল্প একজন শিল্পীকে থিয়েটাবেব একটি বিশেষ নাটকের সীমিত দর্শক সমাজের নয় বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে, সেই সিনেমা শিল্পের প্রতি একজন অভিনেতা বা পরিচালকের আন্তরিক তাগিদ থাকবেই। সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় বলতে গেলে, "অজিতেশবাবুর 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'র স্মরণীয় নাট্যমুহূর্তটি যদি তিন হাজার কি দশ হাজার দর্শক দেখতে পায়, তাঁর চলচ্চিত্রের অভিনয় অনায়াসেই ত্রিশ হাজার কি তিন লাখ দর্শক দেখতে পাবে। সে-সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন?" (তিন লাখ কেন, ত্রিশ লাখও হতে পারে, "হাটে-বাজারে"ই হয়ত তা প্রমাণ হবে।)

সত্যিই ত, থিয়েটার না হয় মুক্ত অঙ্গন থেকে এম্পায়ার, নিউ এম্পাযার থেকে মিনার্ভা কি মার্কস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতির মণ্ডপে, জামশেদপুরে, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজে অভিনীত হবে, কিন্তু সিনেমা হাট থেকে বাজারে, বাজার থেকে গঞ্জে, তিনসুকিয়া থেকে গোয়া-দিউ দমন, আদ্দিস আবাবা, তেহেরান, শেষ পর্যন্ত মস্কো, বার্লিন, নিউ ইয়র্ক, ভেনিস, কান, এমন কি আউটার স্পেসেও পৌঁছে যাবে, আর কোথায় ১২৩ নম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মুক্ত অঙ্গন? এই আকর্ষণেই এদেশে বিদেশে অনেক শিল্পীই থিয়েটার ছেড়ে চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছেন, যদিও তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ডলার, নিশ্চিন্ত আরামের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি অত্যন্ত স্থূল ইহলৌকিক বৈষয়িক ব্যাপারগুলোও তুচ্ছ করবার নয়। থিয়েটারেব গুণী শিল্পী রিচার্ড বার্টন শেষ পর্যন্ত বক্স্ অফিসের সস্তা জনপ্রিয়তায় তলিয়ে গেলেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। একা বার্টনই নন, বিদেশের চলচ্চিত্রজগতে থিয়েটারের বহু শিল্পী আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেউ কেউ হয়ত তাঁদের মঞ্চজীবনের প্রথম দৃশ্যাভিনয়গুলিকে একেবারেই অতীত ইতিহাসের বিষয় করে ফেলেছেন, কেউ হয়ত দু'ক্ষেত্রেই সমান সার্থক হয়েছেন—যেমন, রাইনহার্ট, চেরকাশভ, অর্সন ওয়েল্স, লরেনস্ ওলিভিয়র, লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন, ইঙ্গেমার বার্গমান, টনি রিচার্ডসন, এলিয়া কাজান, লুচিনো ভিস্কোন্তি, অ্যালেক গিনেস। এঁদের অনেকরই শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ থেকে দুই শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ আছে।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা, সীমাবদ্ধ সময় ও ক্ষেত্রে প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে থিয়েটার ব্যবসায়িকভাবে চলচ্চিত্রের কাছে অনেকটাই হেরেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চলচ্চিত্রের টাকা ও খ্যাতিকে থিয়েটারে প্রয়োজনে ব্যবহার করার মহৎ সঙ্কল্প থিয়েটারের শিল্পীরা অনেক সময়েই তাঁদের যোগদানের যুক্তিরূপে উপস্থিত করেছেন। যুক্তি হিসেবে এ যুক্তি অন্যায়ও নয়। শিশিরকুমারেরও এতে আপত্তি ছিল না।

থিয়েটার অভিনয়ের পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়, তবু তাঁরা ঐ সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ সিনেমা সরিয়ে মঞ্চ পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পৃথ্বীরাজের মুখেই শুনেছি, চলচ্চিত্রের উপার্জন তিনি অকাতরে ব্যয় করেছেন, থিয়েটারের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বহু বৎসব ধরেই তা করতে হয়েছে। অথচ আজ পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর

শক্তিশালী শিল্পীবৃন্দ তাঁদের পাপাজী-র (পৃথ্বিরাজের দলের লোকরা তাঁকে ঐ নামেই ডাকতেন) আদরের থিয়েটার থেকে অনেকদূরে খ্যাতি ও অর্থের অবিশ্বাস্য শিখরদেশে আসীন। এঁদের মধ্যে রাজকাপুর, শাম্মীকাপুর, শশীকাপুর, সজ্জন এবং সঙ্গীত পরিচালক রাম গাঙ্গুলী ও শঙ্কর জয়কিষণ উল্লেখ্য। উইংসের আড়ালে বসে যে শংকর জয়কিষণ একদা হারমোনিয়ম বাজাতেন, আজ তাঁদের অর্কেস্ট্রার যে-কোন একজন যন্ত্রীরই যে বাড়ি-গাড়ি সম্পত্তি আছে, সেদিনের পৃথ্বী থিয়েটার্সের শংকর জয়কিষণের তা কল্পনাতীত ছিল। পৃথ্বীরাজ সিনেমার টাকা থিয়েটারে ঢেলেও তাঁর থিয়েটারকে বাঁচাতে পারলেন না। এভাবে থিয়েটার কখনও সার্থকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে কিনা সেইটেই ভাববার বিষয়। পৃথ্বী থিয়েটার্স যখন যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করল, তখন যাঁরা আগেই সিনেমায় চলে গেছেন তাঁদের বাদ দিয়ে, আরো অনেকে যাঁরা এই বিরাট নাট্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অনেকেই চলচ্চিত্র শিল্পে বা অন্য কোথাও স্থান করে নিলেন। বাকীদের কথা সকলেই ভুলে গেছেন, আমরা জানি না, পৃথ্বীরাজ নিশ্চয়ই তাঁদের ভোলেননি, হয়ত তাঁদের খোঁজ-খবর রেখেও থাকেন। কিন্তু নাট্য প্রচেষ্টার ঐখানেই শেষ।

যে সমস্ত কারনে ঐ থিয়েটারের একজন তরুণ নায়ক আজ সারা পৃথিবীর একজন পরিচিত শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন, শিল্পের আকর্ষণে প্রতিপত্তি আকাঙ্ক্ষায় এবং টাকার নেশায় সেই চলচ্চিত্রের বিবাট বিপুল সাংঘাতিক দানবীয় ক্ষমতায় ত সেই একই কারণে একজন শিল্পীর সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি কর্মপ্রেরণা ও সংগঠন-সচেতনতা সত্ত্বেও একান্ত মানবিক আকর্ষণেই বড় এবং আরো বড় শিল্পী হবার স্বাভাবিক ইচ্ছায়, প্রতিদিনের বিষণ্ণ জীবনযাত্রায় ধারদেনা এবং নিত্যনতুন কায়দায় সাংসারিক জটিলতাগুলো ম্যানেজ করার দুষ্ট চক্রের হাত থেকে এবং প্রতিদিন নিচু হওয়া ও খাটো হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার অলীক আশ্বাসে, চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা এলেই শুরু হয় মঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে চলচ্চিত্রলোকের মোহময় কল্পনার অস্তিত্বের দিকে প্রথম দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ। কেউ কেউ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন, কেউ সাময়িক বিরতিতে ফিরে আসেন মঞ্চকে oblige করতে, কেউ সময় ভাগাভাগি করে নিয়ে চলতে চেষ্টা করেন, কেউ আর ফেরেন না, অনেক দূরের ছায়ার জগতের মানুষ হয়ে যান। তাঁর গ্রুপের সহশিল্পীবা কোন এক মঙ্গলবার কি শুক্রবার মুক্ত অঙ্গন যাওয়ার পথে রাসবিহারীব মোড়ে তাঁদের বন্ধুর ১০×১২ ফিট মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে থমকে হয়ত একটু দাঁড়িয়ে পবে ভাবতে থাকেন মুক্ত অঙ্গনে আর কতগুলো বুধবার পেরিয়ে তাঁকেও একদিন যেতে হবে কল-কার্ড নিয়ে টালিগঞ্জ ব্রিজ পেরিয়ে ট্রামডিপো ছাড়িয়ে—স্টুডিয়োয়! সবাই যে থমকে দাঁড়ান তা নয়, সবাই যে টালিগঞ্জ থেকে ফিরেও আসেন না, তাও নয়, এ বিষয়ে অনেকের হয়ত স্পষ্ট চিন্তা বা বিশ্লেষণও আছে, এবং আমি মনে করি যে, যে-কোন সৃজনশীল শিল্পীই এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে seriously মনোনিবেশ করতে পারেন এবং সার্থকতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টাও করতে পারেন। একজন শিল্পীর জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যক্তিগত অর্থের প্রয়োজন যদি তিনি তাঁর নিজের শিল্পসাধনার মাধ্যম থেকেই মেটাতে পারেন, তবে সেইটেই সব চেয়ে ভাল। থিয়েটারের ক্ষেত্রে 'প্রোফেশনল্' (সৎ অর্থে) মানে পৌঁছানর পর সেইটেই প্রোফেশন হওয়া উচিত। কিন্তু থিয়েটার এখনও এদেশে বা বিদেশেও

আত্মনির্ভর হওয়ার জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। ফলে আজ কেউ যেমন ওই শিল্পের নিজস্ব তাগিদেই চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করবেন, তেমনি আবার কেউ নিজের নাট্য সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করবাব আগ্রহ থেকেই চলচ্চিত্রে আসবেন। সদাগরি আপিসেব চাকরি, স্কুলে মাস্টারি, পোস্তায় আলু চালান দেওয়াব ঠিকেদাবি বা হোটেল ম্যানেজারি না করে যদি আরেকটি অ্যালায়েড বা নিকটবর্তী শিল্পচর্চা—যেমন, কমার্শিয়াল আর্ট, সিনেমা, বা গ্রামোফোন, রেডিও থেকে তার রুজিরোজগার করতে পারেন, তাতে মনের খানিকটা কাছাকাছি এক ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে থাকবাব সুযোগ পান। আজকেব এই বিভিন্ন নতুন নাট্য পবীক্ষার প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যেও অনেক শিল্পীকেই অন্যত্র নিজের অভিনয় ক্ষমতাকে নিয়োগ করে ভাড়া দিয়ে নিজের ও নিজের দলের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের ভার লাঘব করার চেষ্টা করতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটু ব্যক্তিগত কথায় আসতে চাই। আমার শিল্পক্ষমতাকেও হযত কখনও অশুভ বা অ-শিল্পসুলভ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বাঁধা রাখতে হযেছে—নিজের অনিচ্ছা ও অনুৎসাহ সত্ত্বেও সীরিয়স থিয়েটারের ক্ষেত্রে অনেক বাত্রি জাগরণে, অনেক চিন্তা ও অনেক পবিকল্পনা খাটিযে যে শিল্প-চেতনা, আলোক পরিকল্পনা বা মঞ্চ প্রয়োগ আমি রচনা করেছি, শিল্পের দিক থেকে কল্পনা শক্তিব দিক থেকে তা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ না কবলেও বিদগ্ধজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ কবেছে। তবু সেগুলো এ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ফিন্যানশিযালি কাটিয়ে সব সময় ঠিক টাকা বোজগাব করার কথা ভাবা যায়নি, সম্ভবও হয়নি। কিন্তু ব্যবহারিক নিত্য-নৈমিত্তিক প্রযোজন মেটাবাব তাগিদেই আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক আমাব জ্ঞান-বুদ্ধিকে একাধিক কাজে লাগান হযেছে টাকা পাওয়ার জন্য এবং আরো বেশি টাকা পাওয়ার জন্য, আবো বেশি প্রয়োজন মেটাবার জন্য। এইখানেই প্রশ্ন উঠবে এই আরো টা গিয়ে থামবে কোথায়? নেহাৎ ব্যবহাবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে কম্প্রোমাইজ থেকে হয়ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলুপ্তি—এইভাবেই ব্যাপারটা এগোয়।

থিয়েটার থেকে চলচ্চিত্রের মহাকাশে এই আরো-কে আমরা শুরুতে একভাবে justify করি, হয়ত অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই। কিন্তু আমি একজন আলোকশিল্পী, কিংবা উনি একজন শিল্পী; প্রথমে নিতান্তই অভিনেতা, পবে চিত্রাভিনেতা, পরে চিত্রতারকা কিংবা পরিচালক, হিল্লি দিল্লী বম্বে মাদ্রাজ কান ভেনিস কার্লোভিভারি জানেওয়ালা, কেউই কি সবসময়ে নিজের ইচ্ছামত থামতে পাবি না থেমেছি? সুযোগ থেকে সুযোগ, কন্ট্রাক্ট থেকে কন্ট্রাক্টের বন্যা যখন আসে, তখন সৃষ্টির নেশা ও টাকার নেশাকে মহৎ নাম ও মূল্য দিয়ে তাকে justify করার ঔদ্ধত্য ত কলকাতা তেকে টালিগঞ্জ, লণ্ডন থেকে হলিউড এবং ইউরোপের আরো সমস্ত মঞ্চ ও চিত্রজগতে আনাগোনার পথে প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। জীবিকার জন্য, প্রয়োজনে, খ্যাতির মোহে বা আকর্ষণে, অন্য কিছু করা, আরো কিছু করা, নতুন কিছু করার মধ্যে—সে আমার আলোক-সম্পাতেই হোক, বা আর কারো চলচ্চিত্র প্রয়াসেই হোক, বা সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী শ্রমিকের জয়গানই হোক—থিয়েটারের কর্মব্যস্ততার যে জীবনযাত্রা, সেই জীবনযাত্রায় সবসময়ই যে অসাধু মনোবৃত্তি কাজ কবে, তা আমি মনে করি না। কিন্তু থিয়েটারের স্বার্থের কথা ভাবলে অন্যত্র এই বিচবণ বা আস্ফালন হয়ত কিছুটা অশুভই। থিয়েটারকে বাঁচানর

জন্য আরো ভালো অভিনয়ের সুযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থায়ী আধুনিক রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করবার জন্য আরো বেশী প্রভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থের সংস্থান করবার উদ্দেশ্যে থিয়েটারের লোকদের চলচ্চিত্রে অধিকতর পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা সহায়ক হতে পারে, এমন একটা মত শোনা যায়। এ সম্পর্কে গোঁড়ামি বা কোন ধরাবাঁধা একপেশে নিয়ম, আইন শৃঙ্খলা চাপানোর কথা অবান্তর চিন্তা। ছোটবড় শিল্পীর মনে অধিকতর পরিচিতি, অধিকতর প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে। দলীয় শৃঙ্খলার নামে এই আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখা হয়ত ভুল, এবং দলের বাইরে কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে গিয়ে তার ফলও হয়ত শিল্পীমনের উপর খারাপই হয়। কিন্তু মঞ্চকে এবং মঞ্চের জীবনকে শুধু মাত্র একটি stepping stone বা springboard হিসেবে ব্যবহার করার সুপ্ত বাসনা ক্রমেই হয়ত নিজের মনেরও অগোচরে গড়ে ওঠে এবং ক্রমে তার সপক্ষে যুক্তিজালও তৈরি হয়ে যায়। থিয়েটারের ফর্মের সবচেয়ে বড় প্রাণশক্তি যে অন্তরঙ্গতা, দর্শকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং একাত্মতার যে উন্মাদনা যে ম্যাজিক, তার প্রতি সমস্ত মমত্ব, ভালোবাসা ও ঐতিহ্যের দোহাই জানিয়ে আমি শুধুই বলব, সিনেমার শিল্পরূপে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, ক্যামেরার সচলতা ও সম্পাদনার অন্তহীন সম্ভাবনার ও তার বিপুল কর্মকাণ্ডের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার কথা ভাববার আগে থিয়েটার কর্মীরা যেন আমাদের এই অনেক দিনের পুরানো নিবিড় চেনাপরিচয় ও ভাবের আদান প্রদানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ মহান শিল্পকোণটির কথাও মনে রাখেন।

তাঁরা যেন মনে রাখেন, রঙ্গমঞ্চে সিনেমার প্রথম প্রবেশের সময় থেকেই যে বারবারই থিয়েটারের চূড়ান্ত 'প্রস্থানে'র আশঙ্কা করা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছে অভিনয় শিল্পী হিসেবে দুই জগতের দায়িত্ব পালনে একাধিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সংকট। সে ক্ষেত্রে যাঁরা অপেক্ষাকৃত নামকরা বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁদেরই চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষ খানিকটা খাতির করে থাকেন, অনেক সময় অনেক রকম বিবেচনা করে থিয়েটাবের কাজকর্মের সুবিধে করে দেবার দিকে দৃষ্টি রাখেন। এঁদের ক্ষেত্রে কলকাতার বাইরে লোকেশন শুটিং-এব দিনগুলোয় অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং স্টুডিওর শুটিং প্রোগ্রামেও থিয়েটারের খাতিরে সময়মত প্যাক্-আপ করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী যেটা দাবি করতে পারেন, অপেক্ষাকৃত নবাগতদের অনুরোধে উপরোধে তা কেবল প্রযোজক-পরিচালকদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। তাই ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, নেতৃত্ব ও প্রভাবের জোরে কেবল দু'এক জনের পক্ষেই অপেক্ষাকৃত ভাবে সময় ক্ষমতা ও প্রতিভার সমবণ্টন সম্ভব, অন্যাদের ক্ষেত্রে নয়।

থিয়েটারের বয়োজ্যেষ্ঠতার দাবিতে কোন অনুরোধই করব না। থিয়েটার নিজের ক্ষমতাতেই নিজের পায়েই আরো বহুকাল দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি রাখে। থিয়েটার স্ব-মর্যাদায় সগৌরবেই বেঁচে থাকবে, যতদিন মানুষ থাকবে, মানুষের চোখ থাকবে, মানুষের মন থাকবে এবং মানুষের হৃদয় থাকবে। মানুষের কৌতূহলী আগ্রহী অনুসন্ধানী মন প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন শিল্পোপকরণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ দানে সমৃদ্ধ হবে এবং সঙ্গে নব নব শিল্পরূপ ও ফর্মের আবির্ভাব ঘটবে। থিয়েটার তারই প্রয়োগবিজ্ঞানের নানা নতুন ও জটিল কলাকৌশলের আধুনিক সম্পদে শক্তিমান হয়ে তার মৌলিক আকর্ষণ নিয়েই অন্য তাবৎ শিল্পরূপের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবে। থিয়েটারের অভিনয়বিশেষ যদিও সেই মুহূর্তেই অভিনয়ান্তেই মহাকালের বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায়, তবু স্বকীয় স্বতন্ত্র মূল্যেই থিয়েটার কালজয়ী।

কল্লোল ও তার প্রয়োগকলার সমস্যা

মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল' নাটকের অভিনয় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক প্রচন্ড আলোড়ন উপস্থিত করেছে। কথাটা যে সত্যি তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। 'কল্লোল' নাটক নিয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এ-পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে পরিমাণগত দিক থেকে তা সত্যিই বিস্ময়কর। অন্ততঃ সাম্প্রতিককালে অন্য কোন নাটকের ভাগ্যে তা জোটেনি, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। বাংলা বা ভারতীয় পত্র-পত্রিকার কথা বাদ দিলাম। পূর্ববাংলার ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত প্রগতিশীল পত্রিকা 'জনতার'-র পৃষ্ঠাতেও এই সে-দিন দেখলাম কল্লোলের উচ্ছ্বসিত আলোচনা। অর্থাৎ, খন্ডিত বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের সেতু রচনার ক্ষেত্রে 'কল্লোল'-এর ভূমিকা আংশিক ভাবেও আজ স্বীকৃত। এবং কলকাতার দর্শক, যারা এই শত রজনী ব্যাপী 'কল্লোল'-এর প্রতিটি 'শো' 'হাউসফুল' করে রেখেছেন। তাঁরাও প্রমাণ করলেন 'কল্লোল' তাঁদের জীবনেরই কল্লোলিত প্রতিধ্বনি।

এই ঘটনা মিনার্ভার মত একটি মঞ্চকে কেন্দ্র করে কি করে সম্ভব হল, এই প্রশ্ন আপনারা সঙ্গতভাবেই করতে পারেন। এর জবাব আমার কাছে যেমন কঠিন তেমনি সহজও বটে। কঠিন এই কারণে যে, আমাদের সীমিত ক্ষমতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় 'কল্লোল'-এর মত নাটককে মঞ্চে উপস্থিত করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু শ্রম, নিষ্ঠা আর সততা দিয়ে আমরা বিশ্বাস করি: শিল্পকলা শুধু গৃহ-সজ্জার জন্য নয়, শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার হাতিয়ারও বটে। এবং ভয় বর্বরতা ও স্বার্থপরতাই এ-যুগের শত্রু, সেইহেতু বর্তমান অলস, ভীরু, সংগ্রামবিমুখ, পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন কিংবা প্রতীক ও ক্লাসিজমের নামে নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগ বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী জগতে কল্লোলের সোজাসুজি ভাল-মন্দ ও শত্রু-মিত্র বিচারের সাহস ও স্পর্ধা এবং ভয়, বর্বরতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামীমনোভাব যে দর্শকমনে সাড়া জাগাবে, এই আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই নিহিত আমার সহজ জবাবটি।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে 'কল্লোল' মঞ্চস্থ হয়েছে। এখন 'কল্লোল' দেখার পর কেউ কেউ বলেছেন, এর অভূতপূর্ব মঞ্চ-দৃশ্য, আলোর জাদু, শব্দ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি আঙ্গিককলার মাধ্যমেই নাকি আমরা দর্শকমন জয় করেছি। অর্থাৎ, অভিযোগকারীদের বক্তব্য: 'কল্লোল' নাটকে নাট্যবস্তু তেমন কিছু নেই, আছে প্রয়োগকলার মনভুলানো খেলা। 'কল্লোল'-এর একজন প্রয়োগ-শিল্পী হিসাবে এর জবাব নিশ্চয় আমি দিতে পারি। এবং আমার জবাবে আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে, 'কল্লোল' নাটকের পরিপূর্ণ নাট্যবস্তু যদি আমার মত প্রয়োগ-শিল্পীকে অনুপ্রাণিত না করতো তবে আমার এবং আমার সহকর্মীদের পক্ষে ঐ 'মনভুলানো খেলা'য় জয়ী হওয়া কোনক্রমেই

সম্ভব হত না। প্রকৃত পক্ষে, 'কল্লোল' নাটক রচনার পর যেদিন নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্ত আমাদের নাটকটি পড়ে শোনালেন সেদিনই আমরা 'কল্লোলে'র বলিষ্ঠ নাট্যবক্তব্যে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম যে, এর বিষয়বস্তু অনুযায়ী আঙ্গিককলা কী ভাবে উদ্ভাবন করা যায় সেই চিন্তাই আমাদের মনকে বারংবার আলোড়িত করে তুলেছিল। সুতরাং আঙ্গিকনৈপুন্যে আমরা নাটকের দুর্বল বিষয়বস্তুকে আড়াল করতে চাইনি; বরং নাটকের বলিষ্ঠ বিষয়বস্তুকে দৃশ্যপটে উপস্থিত করতে আমাদের আঙ্গিককলা তথা প্রয়োগ-বিদ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং 'কল্লোল' নাটকের মঞ্চ, আলো, শব্দ কিংবা জাহাজী ও অফিসারদের পোষাক-পরিচ্ছদ আর ওয়াটার ফ্রন্টের সংগ্রামী মানুষদের ঘর-গৃহস্থালী, সংগ্রাম ইত্যাদি দৃশ্যপট 'কল্লোলের' বলিষ্ঠ নাটকীয় মুহূর্তগুলির হাত ধরেই মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া মঞ্চ-আঙ্গিকের যে বৈচিত্র্যময় বিশালত্ব দর্শকেরা মুগ্ধ বলে শুনেছি, তাও 'কল্লোল' নাটকেরই দান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাট্যকার যদি ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের বিশাল পটভূমিতে তাঁর নাটকীয় দৃশ্যপটগুলি একের পর এক অঙ্কন না করতেন তাহলে আমরা কোথায় পেতাম উন্মুক্ত আকাশের নীচে অথৈ নীল সমুদ্রে খাইবার জাহাজের বিশাল দৃশ্য, বয়লার রুমের মিটার, স্পিকিং টিউব, ফার্নেস কিংবা বয়লারের রক্তিম আলোর আভাষ, স্টোক হোলের চাপা যান্ত্রিক পরিবেশ, কামানের গর্জন, ওয়াটার ফ্রন্টের ব্যারিকেড লড়াই এবং তৎসংক্রান্ত দৃশ্যপট, আলোর খেলা আর শব্দিত গতিবেগ? অথবা উল্টে আমি যদি বলি, কল্লোলের ঐ জাহাজে বয়লারের দৃশ্য মঞ্চে উপস্থিত করা হল আমরা বর্তমানে যা করেছি, তার চেয়ে আরও অনেক আকর্ষনীয় আলো-শব্দ-সঙ্গীত তথা আঙ্গিক-নৈপুণ্য সহযোগে, কিন্তু সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হল 'কল্লোল' নাটকের বলিষ্ঠ কাহিনীটি, তাহলেও কি দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে দেখবেন 'কল্লোল'-নাটকটির অভিনয়? ক্ষমা করবেন, এ চিন্তা উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন ব্যক্তির চিন্তায় স্থান পেলেও পেতে পারে আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ও-চিন্তা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আমার বিনীত অভিমত: সূত্রধারের প্রথম প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে বয়লার রুমের রহস্যময় আলো-ছায়ার সঞ্চরণ, নাবিক জীবনের বৈচিত্র্য, বিপদ, দুঃসাহসিকতা, খাইবার-ডেকের অভূতপূর্ব বিভিন্ন উপস্থাপনা, ওয়াটার ফ্রন্টের বস্তি, সহমর্মী নাবিক-পরিবারের সংগ্রামী ঐক্য, বৃটিশ অফিসারদের নৃশংসতা, কংগ্রেসী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ছবির পর ছবি, যা দর্শক-মনকে ধাক্কা দেয় ও উদ্বেলিত করে তোলে তা যেমন আঙ্গিককলা ও প্রয়োগ-বিদ্যার সাহায্য ছাড়া শুধু অভিনয় নৈপুণ্যে পরিস্ফুট করা সম্ভব নয় তেমনি জীবন্ত মানুষের ঘাত-প্রতিঘাতময় অভিনয় ভিন্ন শুধু প্রয়োগ-বিদ্যার বাহাদুরীতে সেই এফেক্ট সৃষ্টি করাও অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের কাহিনীতে অভিনয় ও পরিবেশানুযায়ী মঞ্চসজ্জা এবং আলোক শুধু পরস্পরের পরিপূরক বল্লে ভুল হবে, এখানে জাহাজের বিভিন্ন অংশ, অন্ধকার আকাশ, নাবিকদের সংগ্রামী পতাকা প্রভৃতি পরিবেশের প্রতিটি খুঁটিনাটিও নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির কাজে এক 'সক্রিয় ভূমিকায়' অবতীর্ণ। এমনকি নাবিকের পোষাকপড়া সারি সারি মানুষ, বস্তিবাসী শ্রমজীবী জনতা সামরিক বাহিনী ও অফিসার—এরা শুধু অভিনেতা নয়, এরা নিজেরা এবং এদের অঙ্গাবরণ, চালচলনও এই নাটকের পরিবেশ পরিস্ফুটনে

যথেষ্ট সাহায্যকারী। অর্থাৎ, আধুনিক নাটকে, এই ধরনের বাস্তববাদী কাহিনী মঞ্চে উপস্থাপনায়, অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চসজ্জা-আলোক, শব্দ ও সঙ্গীত, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-বলা—এই সব কিছুই অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য বলে আমি মনে করি। এবং নাট্যকার এই সব উপাদান তাঁর নাটকে সার্থকভাবে উপস্থিত করায় প্রয়োগ-শিল্পীরূপে মূলতঃ আমরা নাট্যবস্তুকেই অনুসরণ করেছি। আর ঠিক এরি ফলেই সম্ভব হয়েছে সার্থক নাটকীয় মুহূর্তগুলির মধ্যে দর্শক মনকে কল্লোলিত করা।

এবার আমাদের কাছে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপন করা হচ্ছে প্রয়োগ-কলার দিক থেকে আমি তার জবাব দিতে চেষ্টা করবো। অনেক বন্ধু, রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, আমাদের কাছে 'কল্লোল'-কে বৃহত্তর জন-জীবনের সম্মুখে উপস্থিত করার দাবী জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, মহানগরীর একটি রঙ্গালয়ের সীমিত পরিসরে 'কল্লোল'-কে আবদ্ধ রেখে আমরা কি বৃহত্তর জনতার রসপিপাসাকে অবহেলা করছি না? এবং এর ফলে গণনাট্যের মৌলিক লক্ষ্যও কি বিঘ্নিত হচ্ছে না?

বন্ধুদের অভিযোগ আংশিক ভাবে সত্য। কারণ, 'কল্লোলে'র বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে আমরা যদি কলকাতার পরিধি ছাড়িয়ে বাংলা তথা ভারতের গ্রামে-মাঠে শহরে-নগরে, কলে-কারখানায়, সভায়-মিছিলে উপস্থিত হয়ে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মনে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারতাম তবে নিশ্চয় গণনাট্যের মূল লক্ষ্য আরও সার্থকভাবে প্রতিপালিত হত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়, 'কল্লোল' নাটককে আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা যে-ভাবে মঞ্চে উপস্থিত করেছি তা হুবহু কি ভাবে নির্দিষ্ট মঞ্চের সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে কলকাতার বাইরে মঞ্চস্থ করা সম্ভব? তবে নিশ্চয় 'কল্লোলে'র মূল বক্তব্যকে অক্ষুণ্ন রেখে অন্যভাবে নাটককে পরিবেশন করা যায় এবং সেই পরিবর্তিত নাটক নিয়ে কলকাতা ছেড়ে দূর-দূরান্তরে পাড়ি জমিয়েও ঈপ্সিত ফল আমরা লাভ করতে পারি। এ-নিয়ে নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্ত যে চিন্তা করছেন না, তা নয়। কারণ, আমরাও চাইনা 'কল্লোলে'র মত বিষয়বস্তু-সমৃদ্ধ নাটক শুধুমাত্র ব্যয়-বহুল মঞ্চ এবং সর্বাধুনিক প্রয়োগকলার ক্রীতদাস হয়ে থাক। কিন্তু কলকাতার মঞ্চে আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণভাবে কেন আমরা ব্যবহার করব না? এতে গণনাট্যের মূল লক্ষ্য বিঘ্নিত হওয়া দূরে থাক বরং তার সাফল্যকেই সূচিত করেছে। অন্ততঃ তথাকথিত পেশাদার মঞ্চের একাধিপত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কলকাতা, তার শহরতলী এবং সুদূর মফঃস্বলের নাট্যামোদী নরনারীকে আমরা এই প্রথম ব্যাপকভাবে 'কল্লোলে'র মত বিষয়বস্তু দেখতে উৎসাহিত করতে পেরেছি। সুতরাং আমার বক্তব্যঃ বলিষ্ঠ এবং নির্ভীক বাস্তববাদী বিষয়বস্তু যে-ক্ষেত্রে একটি শহরের রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করা হবে তখন তার সাজ-সজ্জা, মঞ্চ-আলো, শব্দ-সঙ্গীত ইত্যাদি ষোলআনা 'স্পেকটাকুলার' করেই উপস্থিত করা উচিত। এবং দৃশ্য, সঙ্গীত, আলোর যে জাদুকরী প্রভাব, যে ম্যাজিকের আকর্ষণ—তাকে শিল্প-সম্মত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে যে সম্ভাবনা উপস্থিত করেছে তাকে সার্থকভাবে ব্যবহার না-করা আমরা নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করি। কিন্তু যেখানে এ-সব উপকরণের অভাব বিদ্যমান কিংবা মঞ্চের সীমাবদ্ধতা এবং প্রায়োগ-বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেখানে পূর্বকথিত [illegible] যে নিশ্চয়ই 'কল্লোল'-নাটককে মঞ্চস্থ

করা যায়। আর সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা বা ভারতের নাট্যঐতিহ্যে এমন সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বিস্ময়কর দৃশ্যসজ্জা, আলো বা সঙ্গীত বাদ দিয়েও 'কল্লোলে'র মত বলিষ্ঠ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুকে অভিনয়-নৈপুণ্যে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। এই বাংলাদেশে মুকুন্দ দাস কিংবা গণনাট্য সংঘের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো আমার কথারই সাক্ষ্য দেয়। অতএব, যে সব বন্ধু 'কল্লোল'-কে কলকাতায় সীমাবদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উত্থাপন করছেন পূর্বোক্ত উপায়ে তাঁরাও গণনাট্যের অন্যতর দাবী মেটাতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই দরিদ্র এবং যান্ত্রিক দিক দিয়ে অনগ্রসর দেশে আধুনিক পরিচালক এবং মঞ্চ-শিল্পীর যে নতুন দায়িত্বের কথা এসে পড়ে তাও নিঃসন্দেহে বিবেচ্য। একজন প্রযোগ-শিল্পীরূপে প্রতিকূল পরিবেশে নতুন বাস্তব প্রযোগ-পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা আমি অস্বীকার করতে পারিনা। আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং অন্যান্য প্রকরণের অভাবের জন্য ছোট ছোট শহর ও গ্রামের মানুষ খাইবারের সংগ্রামী নাবিকদের লড়াইয়ের বর্তমান নাটকীয অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকছে, এ কথা প্রযোগ-শিল্পী রূপে আমাকে বেদনাহত করে।

অবশ্য এ-কথাও আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই যে, আমরাও মিনার্ভা মঞ্চের সীমাবদ্ধতার জন্যে আমাদের ঈপ্সিত পরিকল্পনাকে অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। এর একটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে উপস্থিত করছি, যেমন, আমরা যখন মঞ্চ-পরিকল্পনার সুবিধার্থে একটি যুদ্ধ-জাহাজ পরিদর্শন করে এসে মঞ্চে সেই জাহাজকে রূপায়িত করতে যাই তখন দেখি মিনার্ভা মঞ্চের ২৬'×৪০' ফুট পরিসরে প্রকৃত যুদ্ধ জাহাজকে সংস্থাপিত করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ, যুদ্ধ-জাহাজের উপস্থিতি ভিন্ন 'কল্লোলে'র অভিনয় কী করে সম্ভব? আবার একই মঞ্চে জাহাজ, ডেক, বয়লার ইত্যাদির সঙ্গে ডাঙার মানুষ, অর্থাৎ ওয়াটার ফ্রন্টের বস্তিবাসীদের ঘর-বাড়ি, জীবন-যাত্রা এবং তাদের সংগ্রামের দৃশ্য পরিস্ফুট করতে হলে কি ভাবে এই সীমিত পরিসরে তা সম্ভবপর এবং যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে সমাধা করা যাবে, সেই সমস্যারও আমরা সম্মুখীন হয়েছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি, বাস্তব প্রয়োজনে আমাদের পরিকল্পিত অনেক কিছুরই রদ-বদল করে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ অতিক্রম করেই তবে আমরা বর্তমান মঞ্চ-সজ্জায় পৌঁছাতে পেরেছি। এই ব্যাপারে 'চিল্ড্রেন লিট্‌ল থিয়েটার'-এর 'পাপেট' বিশেষজ্ঞ সুরেশ দত্তের তৈরি নানা মডেল নিয়েই আমরা চালিয়েছিলাম আমাদের সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। স্থাপত্য-বিজ্ঞানের নানা জটিল জ্যামিতিক-পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে মিনার্ভামঞ্চের পরিসরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক গঠনের পরিমাপে কি ভাবে মঞ্চ-সজ্জার ব্যবস্থা করলে জাহাজের বিশালত্বের পাশাপাশি স্থাপত্য-বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘিত না-হয় সে সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন থাকতে হয়েছে। আলোর ব্যাপারেও আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন থাকতে হয়েছে। তবু মোটের উপর সব কিছুর নিখুঁত সমাধান বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও আমরা দর্শক-মনে মঞ্চ-মায়ার একটি বাস্তব গ্রাহ্য পরিবেশ হয়তো সৃষ্টি করতে পেরেছি, এটাই আমাদের সান্ত্বনা।

আমি পুনর্বার বলছি, প্রয়োগ-কলাই 'কল্লোল' নাটকের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, নাটকের দাবীতেই এখানে প্রয়োগ-বিদ্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়-বস্তুর সার্থক প্রকাশের জন্যই আঙ্গিককলা, এ-কথা 'কল্লোল' নাটক যে-ভাবে প্রমাণ করেছে—তা আমার শিল্পী-জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

আঙ্গিকের হাততালি ও হাততালির আঙ্গিক

নিকষ কালো অন্ধকার। কালোমানিকের উজ্জ্বলতাকে পাতালপুরীর নিঃসীম কালো গাঢ়তর করে তুলেছে। কয়লাখনির সংকীর্ণ গুহাপথের ভারী বাতাস গ্যাসের পুতিগন্ধে ক্রমশঃ আরো ভারী হয়ে আসছে। সামান্যতম অক্সিজেন কার্বনডাই-অক্সাইডের বিষাক্ততায় পরিণত হচ্ছে। কয়লাখনির এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় আটক হয়ে পড়ে আছে বিংশশতকী সভ্যতার ভারবাহী সাতটি অমূল্য প্রাণ, আদিম যুগের অসহায় মানুষের মত। চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা। মনে বাঁচার দুরন্ত আগ্রহ। চারিদিকের কালোর সমারোহ চোখের আলোকে ঘন হতে ঘনতর করে আনে। মৃত্যুর বীভৎস বর্বরতা সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে হেসে ওঠে। ভয়ে আর আতঙ্কে পাগল হয়ে ওঠে সাতজন মানুষ। চোখের সামনে মৃত্যুর হাতছানি। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় শুষ্ক কণ্ঠনালী তৃষ্ণায় ফেটে পড়ে। এমন সময় প্রবহমান বন্যাস্রোতের কল কলধ্বনি। তৃষ্ণার পানীয় নয়—পরিতৃপ্তির আনন্দ নয়—নিশ্চিত মৃত্যুর নির্মম ঘোষণা নিয়ে এলো জল। সেই জলে ডুবে মরলো অসহায় আতঙ্ক সাতটি প্রাণ। ফিরে এল না প্রিয়জনের কাছে। মা হারালো সন্তান, সন্তান হারালো পিতা, নারী হারালো স্বামীকে।

এই বিষাদময় পরিবেশেও আঙ্গিকের উদ্দামতায় দর্শক হাততালি দেয়। আনন্দ কোথায় এ বিষাদে? কিন্তু তবু হাততালির প্লাবনে মঞ্চপ্লাবন ভেসে যায়। মঞ্চপ্লাবনে নাট্যশিল্প বিপন্ন হয়, বিব্রত বোধ করে। তবু রক্ষা, অপ্রতিহত দুর্বার গতিতে যে ট্রেন এলো তা আত্মহত্যায় উদ্যত নায়িকাব মৃত্যু ঘটলো না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রিয়াকে উদ্ধার করলো প্রেমিক স্বামী। রক্ষা পেল নায়িকা, রক্ষা পেল মঞ্চ আঙ্গিক। দর্শক খুশী হলো। খুশী হলো ক্রিটিক। কেন? সে কি নায়িকার নিরাপত্তায় না অন্য কিছু? যদি ট্রাজেডি ঘটতো? তীব্রগতি কানাডিয়ান ইঞ্জিন যদি চাপা দিয়ে যেত নায়িকাকে? তবু কি হাততালি পড়তো. না? নিশ্চয়ই পড়তো। হাজার হাজার দর্শকের উচ্ছাসের প্রতিধ্বনি ১০৮৪ তম অভিনয়কে অতিক্রম করে বন্যাধারায় ছুটে যেত হাতহালির ধ্বনি প্রতিধ্বনি। কিন্তু কেন? বিষাদময় বিয়োগান্ত ঘটনায় দর্শকচিত্তে উল্লাসের সঞ্চার হয় কেন।

উত্তর পেতে ফিরে যেতে হবে জলপ্লাবনের উৎস মুখে। বিশ্লেষণ করতে হবে মনের কৌতুহল উদ্দীপনার বৈচিত্র্যসন্ধানী রূপের যাচাই করতে হবে জলপ্লাবনের পরিণতির আগের ঘটনাবিন্যাস, দৃশ্যসংস্থাপন, অভিনয় ও অঙ্গসজ্জাকে। নাটকের ঘটনা সংস্থাপন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত ঘনীভূত হতে হতে বিপদাশঙ্কার চরম প্রকাশের মধ্যে গিয়ে পড়ে। অন্ধকার হতে গাঢ়তর অন্ধকার লোকে নিয়ে যায় পরিণতিকে। মনের অন্ধকারও ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। দৃশ্যের পর দৃশ্য এগিয়ে চলে। সজ্জায়, অভিনয়ে মঞ্চে যে আলোক বিন্যাস, যে ভাব প্রকাশ নাটককে প্রয়োজনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, আলোর পরিকল্পনা যে আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত বহন করে, উদ্ধার কার্যের কর্মব্যস্ততা

যে অমঙ্গলজনক ভয়বিহুলতার ছবি আঁকে প্রাক্ সমাপ্তি দৃশ্যে, খনির মধ্যে অবরুদ্ধ মানুষগুলির ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে যাবার যে পরিণতি ঘনিয়ে আসে। উত্তর খুঁজতে হবে তার সাথে মিলিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে এককভবে শেষ দৃশ্যে নয়। তা না হলে সামগ্রিক অবয়বকে দেখা যাবে না—হবে অন্ধের হাতী দেখার হাস্যকর প্রয়াস।

শেষ দৃশ্যে বাংলা তথা ভারতীয় মঞ্চে প্রথম দৃশ্যমান হয় এক অবিশ্বাস্য শ্বাসরোধকারী অন্ধকারেব ছবি। খণ্ড খণ্ড কালোর জমাট মৃত্যুর মতই হিমশীতল। আলোর কয়েকটি মাত্র রেখা বিপন্ন অবরুদ্ধ কয়েকটি কালো কালো প্রেতমূর্তিকে কালো কয়লার সাথে মিশিয়ে দিয়ে জীবনের কালোকে আরও প্রকটতর করে তোলে। অবরুদ্ধ সাতটি প্রাণের ভীত সন্ত্রস্ত মনোভাব দর্শকমনে সঞ্চারিত হয়। সঙ্গীত, শব্দ, ভয়ার্ত মানুষের অসহায় আর্তনাদ মিলেমিশে এক অদ্ভুত ভয়াবহ জগতে নিয়ে যায় দর্শককে।

নাটকের গোটা কাঠামো বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে দর্শক মনে এক চূড়ান্ত শ্বাসরোধকারী অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। আনন্দ, হাসি, আলো ক্ষীয়মান হতে হতে হতাশায় অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। অস্পষ্ট আলো আঁধারির মায়ায় আচ্ছন্ন হয় মঞ্চ, অনিশ্চিত আশঙ্কা ক্রমশঃ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় দর্শককে সাতটি প্রাণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। জীবন-নাট্যের যে প্রিয় চরিত্রগুলি কোমলে কঠোরে, মধুরে ভয়ঙ্করে আমাদের সামনে নিবিড় পরিচিতিতে ধরা দিয়েছিলো—অসহায় দর্শকের চোখের সামনে তা তীব্র হতাশায় মৃত্যুবরণ করলো। আতঙ্কবিহ্বল আর্তনাদের রেশ মিলিয়ে গেল প্রবল বন্যাবেগে। বাকরুদ্ধ দর্শক অশ্রুরুদ্ধ আবেগের মধ্যেও করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহে মৌনচেতনাকে সচকিত কবে তুললো। এ হাততালি কি নাট্যকারের, অভিনেতার, পরিচালকের, রূপসজ্জাকরের, মঞ্চসজ্জাকরের পরাজয় বহন করে নিয়ে এলো, না জয় সুনিশ্চিত করলো? এ হাততালি কি নাট্যঘটনার প্রতি সমর্থন জানালো, না নিন্দা করলো? অথবা প্রয়োগশিল্পের সাফল্যকে অভিনন্দিত করলো?

সামগ্রিক চরম সার্থক উপস্থাপনার প্রতি সমর্থন জানালো এই হাততালি। দৃশ্য পরিকল্পনায় আলোর বৈশিষ্ট্যে, অভিনয় সৌকর্যে, পরিবেশ রচনায় নাটকের সার্বিক সাফল্যের ফলে যে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এ হাততালি তাকে অভিনন্দন জানালো। কোন বিশেষ আঙ্গিকের প্রতি এ সমর্থন নয়। এ সমর্থন কোন বিশেষ ঘটনার প্রতিও নয়। এ হলো নাটকের সর্বাঙ্গীন সাফল্যে। মর্মন্তুদ ঘটনার উদ্ঘাটনে শৈল্পিক সার্থকতার স্বীকৃতি।

নাটকে হাততালির একটা আলাদা মনস্তত্ত্ব আছে। নাট্যমঞ্চের হাততালি, যে শুধু বিশেষ ঘটনাকেই সমর্থন জানায় তা নয়, সে বিশেষ ঘটনা প্রকাশের শৈল্পিকরীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। সৃষ্টির সার্থকতাকে অভিনন্দিত করে, রসোপলব্ধির নিবিড় আনন্দঘনতায় মুগ্ধ হয়, বিস্মিত হয়, উল্লসিত হয়। রসিকজন রসসৃষ্টির সার্থক প্রকাশে অভিভূত হয়। তা যে কোন রসেরই হোক না কেন। চরম আনন্দের রসোপলব্ধি যেমন ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের চোখে জল আনে, বিষাদগম্ভীর বিয়োগব্যথার সার্থক রূপায়ণও তেমনি অনুভূতির পরতে পরতে দোলা দেয়, শিহরণ আনে, আনন্দেরও সঞ্চার করে।

শৈল্পিক প্রকাশের সার্থকতায় হাসতে হাসতে দর্শকের চোখ জলে ভরে আসে আবার কাঁদতে কাঁদতে দর্শক হেসে ফেলে। রসানুভূতির স্তরভেদে স্ববিরোধী অনেক মিশ্রঅনুভূতি

মানুষের মনোজগতে অজানা প্রাকৃতিক নিয়মে মিশ্ররাগের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে দেখেছি শেষদৃশ্যে মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতের পর সিরাজের নাটকীয় মৃত্যুর শোচনীয়তার চরম প্রকাশকে দর্শকদের করতালধ্বনিতে অভিনন্দিত হতে। সে কি সিরাজের মৃত্যুর প্রতি সমর্থন না অভিনয়শৈলীর সার্থক প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ? আবার চন্দ্রশেখর নাটকে অনুতাপদগ্ধ অর্দ্ধোন্মাদ শৈবলিনী অর্দ্ধচেতন অবচেতনার অনুশোচনা প্রকাশকালে সরযূদেবীর অভিনয়কে করতালধ্বনিতে সম্বর্দ্ধিত হতে দেখেছি। শৈবলিনীর প্রতি করুণায় মন যখন আচ্ছন্ন হয় ঠিক তখনই অভিনয় সৌকর্যের এই নৈপুণ্যের প্রতি দর্শকবৃন্দের উল্লসিত অভিনন্দন। জল প্লাবন তাই মঞ্চকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, বরং নাট্যমঞ্চকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করে। কানাডিয়ান ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া, ঘড় ঘড় শব্দ, হেডলাইটের সুতীব্র চোখ ধাঁধানো আলো নাট্যমঞ্চের প্রাণশক্তিকে নিষ্পেষিত করে না, প্রাণসঞ্চারের সহায়ক হয়।

আঙ্গিকের প্রাধান্য সম্পর্কে সমালোচকদেব যে সব বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ, তার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। অসংযত আতিশয্য আমিও সমর্থন করি না। সৃষ্টি কর্মে রূপ না রূপাঙ্গ, কার ভূমিকা প্রধান—রসচর্চার ইতিহাসের এই পুরোনো বিতর্কে যুক্তি ছোঁড়াছুড়ি করার কোন প্রয়োজন দেখি না। ওটা বিতর্ক সভার পেশাদারী তার্কিকদের জন্য তোলা থাক। আমি মঞ্চশিল্পী,—আমি জানি বৈচিত্র্য জিনিষটাও রূপসৃষ্টির একটি প্রধান শর্ত। এবং নাট্যকৃতির পক্ষে রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টির দুটি দায়িত্বই পালন করতে হবে! উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক সব মিলিযে প্রত্যেকটি রূপাঙ্গের স্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করে সমগ্র নাট্যকৃতির রসকৈবল্যে যদি দর্শকমন আনন্দস্নান করে তবেই শিল্পীর প্রয়াস সার্থক।

অধিকারীভেদ সব ক্ষেত্রেই আছে। সেটা নির্ভর করে ব্যক্তির প্রতিভা ও দক্ষতার ওপর। কেউ যদি সঙ্গীত চর্চার নামে নিছক কণ্ঠবাদন করেন, অভিনয়ের নামে লম্ফঝম্ফ করেন, সেটা নিশ্চয়ই অভিনয় বা সঙ্গীতের দোষ নয়—দোষ শিল্পীর। তাই অনেক সময় যেমন চিত্রকলা শিল্প না হয়ে হয় রঙের দোকানের বিজ্ঞাপন, নৃত্যকলা শিল্প না হয়ে হয় নিছক পেশী সঞ্চালন, ঠিক তেমনি আঙ্গিক নির্দেশকও শিব তৈরী করতে গিয়ে বাঁদর তৈরী করেন। তার জন্য নিশ্চয়ই আঙ্গিক বর্জনের কথা উঠবে না? বিচারের মাপকাঠি নিশ্চয়ই শুধুমাত্র হাততালি নয়। আঙ্গিকের হাততালি না হাততালির আঙ্গিক-এ বিচারের অধিকারী রসিকসুজন। ইতিহাসই আসল বিচারক।

আধুনিক নাটকে আলোর ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালের নাট্য প্রযোজনায় আলোর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্বকীয় ভূমিকা আছে। ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে গ্রুপ থিয়েটারগুলি নাট্য ক্রিয়ায এ বিশিষ্টতা বেশীমাত্রায় স্বীকৃত। গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাটক নিয়ে নানা পবীক্ষা-নিবীক্ষায় অভ্যস্ত। শুধু বিষয়বস্তুর পরিবর্তনই নয়, নানা ফর্মেরও আমদানী এখানে। বস্তুবাদ, সাংকেতিক বাদ বা কিমিতি বাদ—নামের দিক থেকে যাই হোক না কেন আজকের নাটকের বেশীর ভাগই মানব মনের গভীরতর ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া নিয়েই নাড়াচাড়া করে বেশী। আলোকেও তাই অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠতে হয়। মনোবিশ্লেষণে—আলোকসম্পাত অকল্পনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। সাম্প্রতিক বহু নাটকে একাধিক আলোক শিল্পী এ সত্যকে দৃঢ়বনেদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অবচেতন মনের নানা জটিলতা, ভিন্ন শ্রেণীব মানুষের বহুবিচিত্র মনোভঙ্গি, একই ঘটনার ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া—এ সব কিছুকেই আলো একটি বিশিষ্ট রূপে দর্শকদের কাছে প্রকাশ করে থাকে। বিমূর্তকে মূর্তি পরিগ্রহে সাহায্য করে, অস্পষ্টকে স্পষ্টতর করে তোলে, অরূপকে রূপের সীমায় এনে বাঁধে। প্রতিটি নাট্যঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য কে অনুসরণে সাহায্য করে। নাট্যবাণী যে অব্যক্ত মানসিকতাকে প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না, সুরের মূর্ছনার মতো সূক্ষ্ম-আলোর রেখা সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে মানব মনের সেই অতলান্ত গভীরে দর্শককে টেনে নিয়ে যায়। দর্শক-কল্পনাকে প্রসারিত করে দেয় নাট্য ক্রিয়ার গভীরে—জীবন সত্যের সন্ধানে। সাম্প্রতিক নাট্যে আলোর ভূমিকা তাই অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ—এক কথায় অনন্য।

নিয়মিত রঙ্গালয়গুলিতেও আজকের নাটক আর সেই পুরাতন পরিচিত পথে বিচরণ করতে পারছে না। সচেতন দর্শকমণ্ডলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে ব্যবসায়িক মঞ্চকেও কালের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগুতে হচ্ছে। যদিও এঁদের গতি কিছুটা মন্থর, কোথাও বা দ্বিধাগ্রস্থ। তাই এখানে গমকের চেয়ে চমকের আদর এখনও কিছুটা বেশী। অথচ এক যুগ আগেও এ নিয়ে নাট্যানুরাগী মহলে কী প্রচণ্ড বাদানুবাদের ঝড় বয়ে গেছে। আঙ্গিকের অতি প্রাধান্যের বিরুদ্ধে যেমন উঠেছে সোচ্চার প্রতিবাদ, তেমনি তাকে নিতান্ত অবহেলায় পেছনে ফেলে রাখার বিপক্ষেও নানা যুক্তির হয়েছে অবতারণা। এ সবই ঘটেছে দ্বিধাবিভক্ত সমাজের খণ্ডিত মানসিকতার ফলে। অথচ একটু সহনশীলতা নিয়ে ভেবে দেখলেই বোঝা যেত দু'পক্ষের বক্তব্যেই আংশিক ফাঁক ছিল।

নাট্য যেহেতু যৌথ শিল্প—তাই এখানে কোন একটি অঙ্গ বা অংশের একক প্রাধান্য অসম্ভব এবং অশোভন। আবার দৃশ্যকাব্য বলেই দেখার (ভিস্যুয়েল) দিকটাকেও অবহেলা করার সঙ্গত কারণ নেই। মূল কথাটা হলো বিভিন্ন অংশের বা বিভাগের রাসায়নিক

সংমিশ্রণ। যান্ত্রিক সংযোজন নয়। অথচ আমাদের নাট্যশিল্পে সংযোজন ছিল কিন্তু সংমিশ্রণ ছিল না। অবশ্যই বিভিন্ন আঙ্গিক প্রকরণের সুনির্দিষ্ট অংশভাগ নেই নাট্যশিল্পে (অর্থাৎ সংলাপ কতটা, আলোর কত পার্সেন্ট অংশ, ফ্রেম বা দৃশ্যপটের শতকরা ভাগ কত—এমন ধরণের নির্দিষ্ট তত্ত্ব নেই)। নাট্যবক্তব্যের বিভিন্নতায় প্রকরণ বিভাগেও তারতম্য ঘটে। যে নাটকের বক্তব্য তির্যক, চরিত্রেরা যেখানে সমাজের নানা অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ঘটনা প্রবাহ যেখানে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত, সেখানে প্রকরণ অর্থাৎ আঙ্গিকের নানা অংশের নানাধরণের বিভাগ অবশ্যম্ভাবী। যেমন 'অঙ্গার' 'কল্লোল' বা 'পুতুল খেলায়' আঙ্গিক প্রকরণের সমবিভাগ বা সমান্তরাল প্রয়োগ অসম্ভব বা অকল্পনীয, অঙ্গারের রেস্‌কিউ দৃশ্যে সংলাপের থেকেও পরিবেশ গভীরতর অর্থ বহন করে। আলো তাই এখানে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরীন খনি দুর্ঘটনাব পর বাইরের অপেক্ষমান মানুষগুলোর অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, আশঙ্কার সঙ্গে উদ্ধারকাবী দলের তৎপরতা নাট্য পরিবেশকে এক শ্বাসরুদ্ধকারী অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়। দৃশ্য এবং কম্পোজিশনের সঙ্গে মিলেমিশে আলোকেও তাই ছুটাছুটি করতে হয় নিতান্ত অস্থিরতায়। আবার বিপরীত তৎপরতাকে এক সূত্রে গেঁথেও দিতে হয়। 'কল্লোলে' জাহাজের ইঞ্জিন ঘর বা ওয়াটারফ্রন্ট বস্তির দৃশ্যে ও অস্থিরতা বা বৈপরীত্য বিদ্যমান ছিল কিন্তু তার প্রকৃতি আলাদা হওয়ায় আলোর কাজও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। শাদা কথায় বলতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার ক্ষেত্রে, পরিবেশের গুরুত্ব অনুসারে, নাট্য ক্রিয়ার ঘনীভূত গভীরতা তাৎপর্যকে দর্শক মানসে স্পষ্টতর করে তোলাই আলোকসম্পাতের প্রধান কাজ। আলোর কার্যক্রম শুধুমাত্র বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, মঞ্চ স্থাপত্য বা নাট্য কম্পোজিশনকে একটা অর্থবহ চেহারা দেওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। এতে ক্ষেত্র বিশেষে একই বস্তুর ভিন্ন রূপও প্রতিফলিত হতে পারে। অর্থাৎ আপাত দৃশ্যমানকে ছাড়িয়ে গভীরতর অন্য অর্থও প্রকাশিত হতে পারে নাটকের মূল বক্তব্যানুযায়ী। আলোর সঙ্গে তাই আঁধারের সম্পর্ক গভীর। গুরুত্বও সমান ব্যবসায়িক মঞ্চে দীর্ঘকাল আঁধারের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়নি। ইদানীং অবশ্য ধীর গতিতে হলেও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যবসায়িক মঞ্চ ও ক্রমশঃ আলো-আঁধারের নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হতে শুরু করেছে।

বিশেষজ্ঞ ছাড়া আলোকসম্পাতের প্রক্রিয়াটা অনুধাবন করা শক্ত। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে নানা রকমের লেন্‌স, ভিন্ন ভিন্ন ডিমার, কাট্ অফ্ ফানেল, শাটার ইত্যাদির ব্যবহার করে আধুনিক কালের আলোকে প্রয়োজন মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার কথা আজ আর সংশ্লিষ্ট কারুরই অজানা নেই। অর্থবহ রঙ এর ব্যবহার দ্বারা মঞ্চের স্বপ্নময়তাকে কাব্যিক ব্যাঞ্জনা দেওয়া আলোর কাজ। দক্ষ আলোক শিল্পী নানাভাবে অজস্র প্যাটার্ণ সৃষ্টি করে চলেছেন আজকের নাট্য প্রযোজনায়। রচনা পরিবেশনায় যেমন নানা কর্ম, সংলাপ বলার যেমন নানা ঢং, তেমনি আলোক প্রক্ষেপণেরও নানা কৌশল। এ ব্যাপারে অভাবিত বা আপাতঃ অপ্রয়োজনীয় বহু জিনিষই কাজে লাগতে পারে। চাই শুধু শৈল্পিক দৃষ্টি, বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা এর উদ্ভাবনী প্রতিভা। পাশে, উপরে, নীচে, দূরে বা কাছে—প্রয়োজনের সীমায় আলোকের উৎসকে আজ নানা অংশে বিন্যস্ত

করেন শিল্পী। উদ্দেশ্য—দৃশ্যে প্রধান আলোর উৎসকে কেন্দ্র করে সমগ্র সোরস্ গুলিকে কেন্দ্রীভূত বা ঐক্যবদ্ধ করা। সিন্‌ক্রোনাইজেশন। মোট কথা আজকেব জটিলতর মানসিক পটভূমিকে সার্থক ভাবে দর্শকের কাছে উপাস্থত করতে হলে আলোর অনন্য ভূমিকাকে স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আজকের নাট্যক্রিয়ায় আলো একটি চরিত্র।

অভিজ্ঞতার আলোয়

আজ থেকে প্রায় ৩৬।৩৭ বছব আগে বনফুলের নাটক 'বিদ্যাসাগর' দিল্লীতে মঞ্চস্থ হয় এবং ঐ নাটকেই আলোকসম্পাতের দায়িত্ব আমি প্রথম গ্রহণ করি। তারপর আমি দুটি ছাযানাট্য প্রযোজনা করি। একটি পরশুরামেব "ভূষণ্ডীর মাঠে" অপবটি রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"। বলা বাহুল্য যে এই দুটি প্রযোজনাতেও আলোব কাজেব দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করি। আলোক শিল্পী হিসাবে নিয়মমাফিক দীক্ষা আমি কাবো কাছে গ্রহণ করিনি। আমার শিক্ষা বাস্তব জীবন থেকে। সকাল সন্ধ্যায় রাতদিনের নানা পবিবেশেব আলো অন্ধকারেব নাটকীয়তা ও সাহিত্য, কাব্য এবং চিত্র শিল্পে অল্পসল্প আগ্রহ থাকার জন্য 'বিজ্ঞান ও শিল্পেব সার্থক সমন্বয় হিসাবে আলোক শিল্প আমার কাছে একটি অন্যতম আর্টফর্ম বলে মনে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক, বিশেষ কবে ইলেক্‌ট্রিসিটি, রেডিও ইত্যাদিতেও আমার কিঞ্চিৎ আগ্রহ এবং চর্চা ছিল। তা ছাড়া গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং নিকোলাস বোরিখের চিত্রে আলো আঁধারের রঙেব সমাবেশ আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত কবে।

দ্বিতীয মহাযুদ্ধের শেষদিকে পেশাদারী মঞ্চে কিরকম একটা বিষণ্ন নিরানন্দ একঘেয়েমি লক্ষ্য করি। যেটা আলো এবং মঞ্চ সজ্জাব ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম। সেই কারণেই দিল্লিব গণনাট্য সঙ্ঘের (যার আমি একজন অন্যতম founder member ছিলাম) বিভিন্ন নাট্য প্রাযোজনায বিশেষ করে shadow play ইত্যাদিতে আলোর গুরুত্ব আমাকে আবো সক্রিয এবং আরো নিবিড়ভাবে টেনে আনে। পরবর্তীকালে ক্রমশঃ আমি কলকাতার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। যার মধ্যে ১৯৪৯/৫০ সালে নাট্যচক্রের 'নীলদর্পণ', বহুরূপীর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার', গণনাট্য সংঘের 'ভাঙা বন্দর", 'দলিল' ও 'বিসর্জন' এবং লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের 'সাংবাদিক", 'ম্যাকবেথ', 'অচলায়তন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গত ৩০ বছব ধরে ছোট এবং বড় বিভিন্ন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। যখনই যে পরিচালকের সঙ্গে কাজ করি তখন প্রথম তাঁর প্রযোজনার বিষয়বস্তুকে বুঝে নিতে চেষ্টা করি এবং থিয়েটারের অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের মত পরিচালকের পরিকল্পনাকে পরিস্ফুট করবার জন্য আলো অন্ধকারের ব্যবহার করতে সচেষ্ট হই। প্রাথমিক পর্য্যায়ে কোন নির্দিষ্ট প্রযোজনা সম্পর্কে চিন্তায় ভাবনায় কিছু অস্পষ্টতা থাকে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ আলোচনা এবং মহলার মধ্য দিয়ে পরিচালকের ধারণা এবং সেই বিশেষ দলের অবস্থা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী আমিও আমার চিন্তাকে পরিস্ফুট করতে অগ্রসর হই। নাটকের ভাব এবং পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য প্রধানতঃ নাট্য পরিচালকেব নির্দেশ মতই আমি আলো প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা করি।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে composition বিশেষ করে দৃশ্য এবং মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে আমিও আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করি এবং সেক্ষেত্রে বেশী সময়ই বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে পরিচালক আমার Suggestion মেনে নেন্। স্মৃতির ভাঁডাব হাতড়ে আমার যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবতঃ লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের 'অঙ্গার' এবং বহুরূপীব "রক্তকরবী" নাটকে আলোর কাজে বোধ হয় প্রথম দিকে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে ছিল। কারণ এই দুই নাটকেব পবিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই কাজে পবিচালকবা আঙ্গিকের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশ। শব্দ প্রযোগ এবং মঞ্চসজ্জা stage composition সব কিছু মিলিয়ে নতুনভাবে মৌলিক চিন্তায় নানান বিচিত্র চিত্রকল্প সৃষ্টি করাতে মনন্‌শীল আলোর ভূমিকা নাটকের তথাকথিত নায়কের থেকেও সম্ভবতঃ বড় ছিল। ১৯৩৮/৩৯ সালে স্কুল জীবনে প্রথম থেকেই আমি স্বাধীন আলোকশিল্পী হিসাবে কাজ শুরু করেছি এবং সেই সময় থেকে আলো সংক্রান্ত ব্যাপাবে পর্য্যাযক্রমে প্রায যখন যে নাটক হাতে নিযেছি অল্পবিস্তব সেই সব নাট্য প্রযোগে আলোছাযার একটা অন্তর্নিহিত কাঠামো, একটা আবছা scheme করে নিযে পবে প্রথম অভিনয়ে তার application, আলোর সাজ সরঞ্জাম ও মঞ্চসজ্জাব সমন্বয, প্রতিক্ষেত্রেই একটা exciting কাজ বলে মনে হয়ে আসছে আজ পর্য্যন্ত। প্রথমে সম্পূর্ণ দেশী কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী স্টাইলে কিছু উপকরণ দিয়ে আমি আমার শিল্প সৃষ্টি শুরু করি। সেই সময বিদেশের stage craft ও আলোকসম্পাতের জ্ঞান বা স্পষ্ট কিছু ধাবণা ছিল না। কিন্তু কাজ শুরু কবে ধাপে ধাপে আলোর সাজ সরঞ্জাম সম্পর্কে এবং এ বিষযে বিদেশের যে সব বই পত্র, জার্ণাল প্রভৃতি পাই তাতে আগ্রহ জন্মায এবং সেগুলো আমাকে আবো নতুন নতুন চিন্তা করতে সাহায্য করেছে এবং কবছে।

যখন থেকে আমার আলোক পরিকল্পনা একটা সুস্পষ্ট ছকে ধবা পড়ল তখন থেকেই আলোকে কেবলমাত্র দিন রাত্রি বা সমযেব আভাস ছাডাও বিশেষ চরিত্রের অবস্থার Mood অনুযায়ী আলো ও ছায়ার তারতম্য ঘটিযে মঞ্চে ছবি আঁকাব কাজ বলে মনে করেছি। একই দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাউকে আবছা আধো আলো অন্ধকারে এমনকি কোন কোন চরিত্রকে কয়েকবার সম্পূর্ণ অন্ধকাবে রেখেও অভিনয় করিয়ে কথা বলিয়ে নাটকের তথা পরিচালকের মনোমত আবহাওয়া সৃষ্টি কবতে সক্ষম হয়েছি। হয়তো কেউ একপাশ থেকে আলোকিত কিন্তু তাব মুখের অন্যপাশ সম্পূর্ণ অন্ধকারে অদেখা। এই আলো এবং অন্ধকারের তারতম্যের বৈচিত্র্যে অভিনযেব situation এব বক্তব্যের মধ্যে একটা নতুন তাৎপর্য্য বা dimension আনার কাজটাকে আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি একটু বেপরোয়াভাবেই বহু বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পরিচালকের এবং অভিনেতাদের সক্রিয় সহযোগীতায় সম্ভব করতে পেরেছি। শুধু আলো এবং অন্ধকারই নয়, রঙীন্ আলো নানা রঙের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার এবং unconventional, বেয়াড়া angle বা অবস্থান থেকে আলোকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন অপ্রত্যাশিত effect সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। এযাবৎ যত নাটকের পরিকল্পনায় আমার হাত ছিল তাতে এইটা একটা অন্যতম significant ব্যাপার বলে আমাব মনে হয়।

আমার এই আর্ট সম্পর্কে সবচেযে বড় উপলব্ধি হল যে, আলো, মঞ্চসজ্জা এবং

অভিনেতাদের stage composition সব মিলিয়ে যে total effect একটা নাটকে প্রয়োজন তার সঙ্গে আলোর সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি দৃশ্য ও মঞ্চ সজ্জা এবং sound ও music effectএর যাবতীয় উপকরণ এবং যথেষ্ট মহলার গুরুত্ব অপরিহার্য্য। এক্ষেত্রে আমাদের থিয়েটার বিশেষ করে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর আর্থিক সঙ্গতি ও সামর্থের কথাটা অপরিহার্য্যভাবেই এসে পড়ে। কিন্তু এদেশে অত্যন্ত সীমিত আর্থিক সুযোগ সুবিধায় সব সময় সবরকম equipment পাওয়া সম্ভব হয় না, যার মধ্যে অনেক কিছুই বিদেশ থেকে আনতে হয়। যেমন spot light, dimmer board, tape recorder ইত্যাদি। এবং এগুলো যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যদিও এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিষ ইদানিং পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো দাম সাধারণভাবে অসম্ভব রকমের বেশী। তবু এরই মধ্যে গত ২৫।৩০ বছরে বাংলা থিয়েটারে আমার কাজ শুরু করবার পর spot light, dimmer, tape recorder এর প্রচলনও হয়ে গেছে এবং তার বেশ সৃজনশীল প্রয়োগের পরিচয় আমরা একাধিক প্রযোজনায় দেখতে পেয়েছি।

বিভিন্ন ধরণের indigenous জিনিষপত্র যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, সস্তায় অথবা প্রায় বিনামূল্যে সেইসব মালপত্র দিয়েও অনেক সময়েই প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের সৃষ্টি সম্ভব করতে পেরেছি। যেমন বিভিন্ন বার্লি বা লজেন্সের কৌটো, ডালডার টিন, পুরনো ক্যানেস্তারা ইত্যাদি মালমশলাই ছিল অঙ্গার নাটকের জলপ্লাবনের দৃশ্যে অন্যতম আলোকসম্পাতের উপকরণ। ঠিক ঐ effectই হযত সৃষ্টি করা সম্ভবই হোত না, যদি না মিনার্ভা থিয়েটারে (লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে) দারুণ অর্থ-সমস্যা ও উপকরণের অভাবের সম্মুখীন হয়ে আমরা না পড়তাম। এই সঙ্কটের মধ্যেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আলোকে, ছায়াকে, জলপ্লাবনকে এবং কয়লাখনির খাদের কালো অন্ধকারকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এই সঙ্কট আমার মনের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের মতন, obsessionএর মতন পেয়ে বসেছিল। যাই হোক্ বিদেশের অনেক দামী, প্রায় দুঃসাধ্য stage craftএ যেটা সম্ভব, সে ব্যাপারটাকে আমরা রবিশংকরের সঙ্গীত ও শব্দ প্রয়োগের সহায়তায় উৎপলের নাট্য পরিকল্পনায় practically ৩৬ টাকার পুরানো বিস্কুটের টিন ও কয়েকটা ১০০ ওয়াটের বাল্‌বএর সাহায্যে 'অঙ্গারে' খাদের মধ্যে জলপ্লাবনের শেষ দৃশ্যটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ রকম আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বড় কথা হচ্ছে আলো করতে গেলে উপযুক্ত দৃশ্যসজ্জা, পরিচালক তো চাইই, উপরন্তু আলোক সম্পাত, আলো ছাড়া আলোর উপযুক্ত equipment ও কুশলী electricianএরও প্রয়োজন। যেখানে যেমন বাস্তব অবস্থা তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে imagination কে, চিন্তাকে সৃজনশীল তাগিদে অনুপ্রাণিত হলে সীমিত অবস্থার মধ্যেও significant হয়ে ওঠার মতন নাটকীয় মুহূর্ত, চিত্রকল্প তৈরী করতে পারা যায়। এটা আমার অভিজ্ঞতায় বার বার একটার পর একটা ছোট এবং বড় বিখ্যাত প্রযোজনায় ঘটেছে। অনেক সময়েই বাস্তব limitation সত্যিকারের শিল্পীর প্রেরণা তৈরী করে এবং তা নতুনতর কিছু সৃষ্টির সহায়ক হয়ে থাকে। পয়সা নেই, মহলা হচ্ছে না, আলো নেই বলে গোমড়া মুখে বিষন্ন অভিযোগ না করে হাতে যে নাটক এসেছে তাকে আলো এবং মঞ্চসজ্জায় জীবন্ত করতে গেলে বর্তমান অবস্থায় কি করা যায় তার জন্য উঠে পড়ে লাগলেই উন্নততর

শিল্পসম্মত আধুনিক আলোর প্রয়োগকর্মের দিকে একটু একটু করে অনেকখানিই এগোনো সম্ভব; এবং সবিনয়ে সসঙ্কোচে এটুকু নিবেদন করতে পারি যে, একেবারে অল্প, প্রায় কিছু না থাকার অবস্থা থেকে আজ আমরা অন্ততঃ কয়েকটি production এর ক্ষেত্রে যে standard এনেছি তা নেহাৎ দেশ-বিদেশের আধুনিক প্রযোজনার চেয়ে বিশেষ নীচু তো নয়ই বরং এক-আধবার হয়ত আন্তর্জাতিক নিরিখেও একটা উচ্চমানের নজীর সৃষ্টি করেছে।

পেশাদারী থিয়েটারে কাজ করে আমার বহুদিনের একটা ধারণা পাল্টে যায়। এই থিয়েটারগুলোর নিজস্ব মঞ্চ তথা প্রেক্ষাগৃহ থাকায় আমার ধাবণা ছিল সুযোগ পেলে এখানে একটানা একটি set এবং দৃশ্য তৈরী করে দিনের পর দিন তার আলো এবং অন্যান্য technical কাজকে একটা চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু দু'একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া প্রথম দিকে দেখতাম যে সুপরিকল্পিত কোন প্রয়োগ পরিকল্পনা, দৃশ্যপট সম্পর্কে ধারণা বা চিন্তা না করেই নাটক নির্বাচন এবং তা মহলায় ফেলা হোত। পর পর দৃশ্য সংস্থাপনে মঞ্চের পুরো depth ব্যবহার করে কাহিনীর প্রয়োজনে নাটকের বিন্যাস এমনই হত যে কেবল মাত্র নাটকের গতির জন্যই revolving stage ব্যবহার করা হোত। revolving stage নিলে তার প্রধান অসুবিধা হোল—একটি মঞ্চের সীমিত space কে তিন ভাগে ভাগ করে দৃশ্যক্রম অনুযায়ী set গুলোকে সাজাতে, খুলতে, ভাঙ্গতে এবং আবার সাজাতে হয়। তিনটি sector এ মঞ্চের revolving disc-এ ভাগ করায় প্রতিটি দৃশ্যের depth অসম্ভব কমে যায়। পরিপূর্ণ stage space না পেলে এবং তার বিভিন্ন level এর শিল্পসম্মত ব্যবহার না হলে শুধু মানুষগুলোর মুখে আলো খেলিয়ে সত্যিকারের কিছু সার্থক মঞ্চ composition বা pictorial effect একেবারেই অসম্ভব। দর্শকের প্রায় চোখের সামনে সঙ্কীর্ণ পরিসরেব মধ্যে প্রায় line বেঁধে শিল্পীদেরও এক আড়ষ্ট জড়তার মধ্যে প্রবেশ-প্রস্থান, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যুর অভিনয় করে যেতে হয়। আর পেছনে থাকে তিন পাটে বা চার পাটে ভাঙা flat এবং তাই দিয়েই drawing room, কুটীর, বস্তী, কারখানা এবং উন্মুক্ত প্রান্তব দেখানো হয়। ব্যাপারটা বুঝুন, আকাশ, গাছপালা, মেঘ, জঙ্গল, অট্টালিকা সবই ঐ তিন চার ভাঁজের ভাঙ্গা flat এ বা বড় জোর কতকগুলো two dimensional cut-out এ তৈরী। সীমিত সময়ে, সীমিত স্থানে নাট্যকারের প্রয়োজনে, পরিচালক এবং থিয়েটার কর্তৃপক্ষের তাডায় ওরই মধ্যে যাবতীয় নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। এমনকি এক set-এ বা পুরো revolving disc-এ দুটি sector-এ ভাগ করেও মঞ্চের পুরো গভীরতাকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করার কথা তুলে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। যদিও অল্প-বিস্তর adjustment 'বিশেষ অনুরোধে' সম্ভব হয়েছে, কিন্তু major অদল বদল technical প্রয়োজনে গোড়ার দিকে আমি করাতে পারিনি এবং এই জন্যই এদেশে revolving stage এর প্রবর্তক সতু সেন একদিন বলেছিলেন আমাকে যে "বাংলা stage এ revolving disc এনে আমি একটা খারাপ কাজ করেছি, কারণ revolving এর কল্যাণে আজ কাল উপন্যাসের dramatisation হয় না, chapterisation হয়ে থাকে"। revolving stage এর artistic ব্যবহার যে একেবারেই হয়নি তা নয়। তবে সাধারণভাবে নাটকের গতি এবং

আড়াই তিন ঘণ্টায় ১০/১২ কি তার বেশী দৃশ্যের আয়োজন revolving stage এ ঠেসে গাদা যায় বলে এ এক বেয়াড়া দম আটকানো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আমার পেশাদাব থিয়েটারে যোগদানের পর এর প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বোধ হয় 'সেতু' নাটকে—যেখানে একটি চলন্ত ট্রেনের illusion এর প্রয়োজনে পুরো মঞ্চের space টাকেই সফলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। তাবপব অবশ্য মিনার্ভায় এল, টি, জি পেশাদাবী মঞ্চ হিসাবে না ধরলেও সাধারণ রঙ্গালয়ে কাজ করবার আর এক ধরণের অভিজ্ঞতা এখানে অর্জিত হয়েছে। মিনার্ভায় যদিও revolving stage ছিলনা, কিন্তু পরিচালক, নাট্যকার উৎপল দত্ত এবং অভিনয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সার্থক সমন্বয়ে, নির্মল গুহরায় ও সুরেশ দত্তের মতো কৃতী শিল্প নির্দেশকের দৃশ্যসজ্জায় আলো ও stage craft নিয়ে চূড়ান্ত experiment করবার সুযোগ এখানে পাওয়া গিয়েছিল। শিল্প নির্দেশক নির্মল ও সুরেশের সঙ্গে এবং বিশেষ করে পরিচালক উৎপলকে নিয়ে আমরা একটি টিম হিসাবে নাটকেব প্রয়োগে, technical প্রয়োজনে, নাটকের বিন্যাসে আগাগোড়া রদবদল করতেও আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে একটানা মহলার সুযোগ সম্পর্কে আর একটা বড় অসুবিধা উল্লেখ না করে পারছি না—সেটা হোল এই যে, নতুন নাটক খোলার মুখেও প্রস্তুতি পর্বে নানা office ক্লাবকে মঞ্চ ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। যাকে বলা হয় amature booking। তাই নির্মীয়মান set এবং আলোব ব্যবস্থাকে বার বারই disturb করে ঐ সব পূর্ব নির্দিষ্ট ক্লাব বা অফিসকে stage ছেড়ে দিতে হয়। অনেক আগে থেকে নতুন নাটকের time, rehearsal schedule তৈরী করে stage এ বাইরের লোকেরbooking বন্ধ রাখা সম্ভব এবং অনেক ক্ষেত্রে তা করাও হয়। আবার এই পেশাদার থিয়েটারে বাইরের নাট্যগোষ্ঠীর হয়ে কাজ করতে গেলে দীর্ঘ সময়ের জন্য stage হাতে নিয়ে set তৈরী, আলোর adjustment করার. জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাও ঠিক মত অনেক সময় পাওয়া যায় না।

থিয়েটাবে একটা উল্লেখযোগ্য সময় ছিল আমার পূর্বসূরীদের সময়ে বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় সতু সেন যখন revolving stage এবং আধুনিক আলোক ব্যবস্থার প্রচলন করেন কলকাতাব থিয়েটারে; কিন্তু তারপর বহু বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে পেশাদার থিয়েটার একটা গতানুগতিক একঘেঁয়েমী, দৈন্যদশা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়ায় নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল আবার থিয়েটারে শিফ্‌টার, ইলেকট্রিশিয়ানরা বেশীরভাগ সময়েই ভাড়া করা নাট্যগোষ্ঠীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

নানা নাট্য সংস্থা, যাদের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি, গত ২৫ বছরেরও বেশী তাদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হোল, মহলা দেবার মত ভাল বড় জায়গা তাদের নেই এবং নিজস্ব stage না থাকায় যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই একটা কি বড়জোর দুটো stage rehearsal দিয়েই প্রথম রজনীর অভিনয়ে দর্শকের দরবারে হাজির হতে হয়। অনেক complicated production ও এইভাবেই আমাদের করতে হয়েছে। যথা 'রক্তকরবী', 'ব্যারিকেড', 'টোটা', 'চাকভাঙ্গা মধু', 'কলকাতার হ্যামলেট'। কিন্তু আগে যে কথা বলেছি—অসঙ্গতি অসামর্থ, অসুবিধাগুলিকে চ্যালেঞ্জ মনে করে তার মোকাবিলা করতেই হয় এবং তা করাও হয়েছে। বহুরূপীর 'রক্তকরবী'

নাটক মঞ্চস্থ করবার অনেক আগে থেকেই পরিচালক শম্ভু মিত্র ও শিল্প নির্দেশক খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে রক্তকরবী নাটকের দুরূহ প্রয়োগ সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ছবি, নক্সা, Model এর সাহায্যে একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকটি অভিনয়ের এবং কোন বিরতি বা তথাকথিত দৃশ্যভাগ ব্যতিরেকেই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক পর্যালোচনা করা হয়। এ নাটকে একটি composite set এ একই সঙ্গে নানা পরিবেশ ও দৃশ্যের আভাস আনতে হয়েছে, stage এর নানা level কে নানা ভাবে ব্যবহার করে সময়ের, নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগের ইঙ্গিত ও ঐ মঞ্চসজ্জা এবং নানা কোনের নানা আলোর pattern সৃষ্টি ক'রে। রক্তকরবীর আলোক পরিকল্পনার বিশেষত্বই ছিল পুরো নাটকে এক দৃশ্যের lighting pattern থেকে প্রায় দর্শকের অলক্ষে, অগোচরে আর এক lighting pattern এর মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া। এ নাটক যাঁরা দেখেছেন তাঁরা হয়তো মনে করতে পারবেন আলোর পার্টটা ঐ নাটকে কি রকম ছিল। সাঙ্কেতিকভাবে আলোর রঙ্ নেপথ্যচারী অদৃশ্য রাজার ঘরে রক্ত চক্ষুর মতনই দুটি লাল আলোর lense রাজার নেপথ্য কণ্ঠস্বরের সঙ্গে জ্বলে ওঠে। আবাব বিশু নন্দিনীর রোমান্টিক সংলাপ মুহূর্তে সমস্ত মঞ্চ জুড়ে আবছা আলো অন্ধকারের পরিবেশ সেই রোমান্টিক mood-কে আরো গভীরভাবে হৃদয়ে স্পর্শ করতে সাহায্য করেছে বলেই মনে হয়।

নাট্যগোষ্ঠীদের সঙ্গে কাজে যেটা বড় কথা সেটা হোল নাট্য আন্দোলনে এই সব দলের সংগ্রামী ভূমিকা। সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামে একাত্ম হয়ে এদের বেশীর ভাগ নাটকের বক্তব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতা, ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করেও যে নিষ্ঠার সঙ্গে এঁরা কাজ করে চলেছেন, বিশেষতঃ আজকের বিপর্যস্ত বিপন্ন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদে এরা যে শত অসুবিধা ও বাধা অতিক্রম করে উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে চলেছেন তা সত্যিই আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছে এবং করবে। আমি মনে করি বাংলা নাটকে সাধারণ মানুষের জীবনের ও আলোর জয়যাত্রা চলছে চলবে।

চলছে চলেবে

গণনাট্য সংঘের নাম আমার কাছে এক অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রথম দেখা দেয় বাংলার দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় বিনয় রায়ের নেতৃত্বে একটি গানের স্কোয়াড যখন চল্লিশ দশকের মধ্যভাগে দিল্লীতে অনুষ্ঠান করতে আসেন। সেই বলিষ্ঠ গান, সুর ও বিষয়বস্তু আমাকে এবং দিল্লীর আরও অনেক শিল্পী বন্ধুকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারপর শুরু হয়ে গেল আমাদের কর্মোদ্যম। নিরঞ্জনদার (নিরঞ্জন সেন) নেতৃত্বে দিল্লীর গণনাট্য সংঘ স্থাপিত হ'লো। আজ আমার ভাবতে গর্ব হয় সেই প্রথম দিল্লী গণনাট্য সংঘের সংগঠকদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন এবং আলো জ্বালানোর কাজটাও যে নতুন ভাবে এক রকম অর্থবহ হতে পারে—এই সম্ভাবনা আমাদের মাথায় সে দিন হয়তো সূত্রপাত হয়েছিল।

আজও, বহু বছরের ব্যবধানে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দিল্লীর গান্ধী-ময়দানে বিরাট shadow screen-এ দুর্ভিক্ষের ওপর রচিত ছায়ানাটকের জীবন্ত দৃশ্যগুলো। সেই ছায়ানাট্য দিল্লীতে সাড়া তুলেছিল। তারই পরবর্তী কালে ক'লকাতায় নিরঞ্জনদা গণনাট্য সংঘের আরো অনেককে নিয়ে বিখ্যাত ছায়ানাট্য "শহীদের ডাক" মঞ্চস্থ করেন।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যৌথ পরিচালনায় নতুন এক মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল নাট্যসংস্কৃতির। ভারতীয় গননাট্য সংঘের স্কোয়াড সৃষ্টি করেছিল "স্পিরিট অফ্ ইণ্ডিয়া" অমর নৃত্যনাট্য। এই সব মহৎ শিল্পকাণ্ড যা জনজীবনে নতুন সংগ্রামী সমাজ চেতনার সঞ্চার করেছিল। তারই পরবর্তী অধ্যায়ে আবার নতুন ক'রে ক'লকাতায় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগসূত্র স্থাপিত হ'লো।

১৯৪৯ সালে, সাউথ-ইষ্ট এশিয়া পীস কনফারেন্স উপলক্ষ্যে আমাদের একটি নতুন ছায়ানাট্য প্রযোজনার কথা ছিল। রিহার্সাল হলেও সে নাটক নামেনি। সেই সময়েই প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে ও প্রত্যক্ষ আক্রমণে উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী ব্যহত হয়। ঐ দিনগুলোতেই গণনাট্য সংঘের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় ডিক্সন লেনে গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা আক্রান্ত হন। আহত হন জ্ঞান মজুমদার, নিরঞ্জনদা। সুশীলবাবু ও ভবমাধব ঘোষ শহীদ হন।

কিন্তু গণনাট্য সংঘ থামেনি। পরবর্তী অধ্যায়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, কালী ব্যানার্জী, ঋত্বিক ঘটক, পানু পাল, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, গীতা সোম, মৃণাল সেন, ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী, সজল ও রেবা রায়চৌধুরী ও আরো অনেকে নতুন ক'রে গণনাট্যের নতুন নতুন নাট্য প্রযোজনা শুরু করেন। প্রথমে নাট্যচক্র নামে নতুন একটি সংস্থা বিজন ভট্টাচার্য্যের পরিকল্পনায় "নীলদর্পন" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। আমিও তখন থেকেই এই দলে জুটে যাই এবং সমস্ত নাটক, নৃত্যনাট্য সব কিছুর মধ্যে আলোক শিল্পীর ভূমিকায় আমার পাকাপাকি কাজ শুরু হয়ে যায়।

তখন উৎপল দত্ত নামক একজন তরুণ শিল্পীকে জানতাম যিনি মধু বসুর "মাইকেল" চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি ইংরাজীভাষী নাট্যসংস্থা লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের পরিচালক হিসাবে পরে কফি হাউসে পরিচিত হই এবং তখন থেকে হাউসের টেবিলে নানা নাট্য সম্ভাবনার উত্তেজিত আলোচনায় আমরা মত্ত থাকতাম। সেই সময় ভবানীপুরে শান্তি সম্মেলনের মাঠে উৎপলদের অভিনয় দেখি। তারপর এল-টি-জি ক্রমে বাংলা নাটকের প্রযোজনা শুরু করে। গণনাট্য সংঘেও কিছু কাল উৎপল ও আমি এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম, এবং উৎপলের সমস্ত প্রযোজনাই সমাজ সচেতন বলিষ্ঠ দৃষ্টি ভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত। পরে উৎপলের আর এক বিরাট রূপান্তর হয় নাট্যকার হিসেবে, একটার পর একটা মৌলিক নাট্যরচনায় এবং বেশ কিছু সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। অনেক সময় চলে গেছে। গণনাট্য সংঘ হয়তো আজ ঠিক সেভাবে কাজ করছে না। কিন্তু নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে গণনাট্য শাখা প্রশাখায়। অনেক ইউনিট, তাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাও অসামান্য। গণনাট্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক নাট্য সংস্থা সেই আদর্শকে নিয়ে চলেছেন।

এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বহুরূপী ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বহুরূপীতে শম্ভুমিত্র ও খালেদ চৌধুরীর সহযোগিতায় পথিক, রক্তকরবী, পুতুলখেলা, চার অধ্যায়ের প্রযোজনায় মঞ্চপ্রয়োগের এক উচ্চ মানের সূচনা কবেছিল। বিশেষ করে রক্তকরবীতে আধুনিক মঞ্চে পরিচালনা, অভিনয় মঞ্চ পরিকল্পনা, সঙ্গীত ও আলোর এক সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ পরবর্তীকালে মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁদের নাট্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। বহু ইতিহাসের সাক্ষী ঐতিহ্যমণ্ডিত সাধারণ রঙ্গালয়ে এল-টি-জির অভিনয় আবার এক নতুন ধারার সূচনা করল। পুরানো জরাজীর্ণ স্যাঁতসেতে নোনা ধরা মিনার্ভা থিয়েটার হঠাৎ যেন এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কলকাতা তথা সারা ভারতের নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে। নীচের মহল, ছায়ানট, অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ থেকে কল্লোল নাট্যসংস্কৃতির এক কল্লোল যুগ সৃষ্টি করলো। এল টি জি-র সার্থক নাট্য সৃষ্টি মানুষের অধিকারে এবং তীরের মতো নাটক চিরকাল মনে থাকবে।

মিনার্ভায় এল-টি-জির চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। উত্থান পতনের অনেক ইতিহাস অনেক সাংগঠনিক অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা মনে রাখার মতো। প্রথম হচ্ছে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার নির্দেশে "নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল" বিরোধী সংগ্রামে এল-টি-জির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে কুখ্যাত এ বিলের বিরুদ্ধে লড়াই-এ জয়ী হয়েছিলাম আমরা এবং তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লসেন মশাই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনে এটি বোধহয় কংগ্রেস সরকারের প্রথম নতিস্বীকার জনমতের কাছে।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো, বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্যে কল্লোল নাটক চলার সময় তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এক আঘাত হানেন নাটকীয় ভাবেই। সরকার ডি-আই-আর প্রয়োগ করে কল্লোলের নাট্যকার পরিচালক ও অন্যতম অভিনেতা উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করলেন বিনা বিচারে। উদ্দেশ্য, বলাই বাহুল্য, কল্লোল প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তাই তারা ভেবেছিলেন কল্লোলের অন্যতম স্রষ্টা পরিচালক ও শিল্পীকে

কারারুদ্ধ করলেই ঐ নাটক বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয় নি। সেই দিনই এল-টি-জির সমস্ত সভ্যরা স্থির করেন উৎপল দত্তের অনুপস্থিতিতেও কল্লোল যেমন চলছিল তেমনি চলবে। উৎপল দত্তকে অন্যায় ভাবে বন্দী করার জন্য একই সঙ্গে সমস্ত নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বিরাট এক আন্দোলন গড়ে উঠল। কল্লোল আরো বেশী করে সাধারণ মানুষকে উদ্দীপিত করে তুলল।

তৃতীয় ঘটনা কল্লোল নাটকের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বন্ধ হঠাৎ বিনা কারণে বিনা নোটিশে (সরকারের নেপথ্য নির্দেশে?) এবং বিশেষ একটি দৈনিকের অতি উৎসাহী কমিউনিস্ট বিরোধিতার বাহাদুরীর বাসনায়। সেই সংগ্রামে কল্লোলই বিজয়ী হয়েছিল, বিপুল গণসমর্থনে ও অগণিত নাট্যকর্মীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে। এখানে একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না প্রায় সব কাগজে বিজ্ঞাপন বন্ধ করায় আমাদের সহসা এক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বিজ্ঞাপন বিভাগের দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিল। সেদিন আমরা দেশবাসীকে "আনন্দ সংবাদ" শিরোনামায় জানিয়েছিলাম বিনা বিজ্ঞাপনে কল্লোলিত নগর কলকাতায় কল্লোল "চলছে চলবে"! আজও সেই শ্লোগান সমস্ত জনজীবনে রাজনীতিতে প্রতিধ্বনিত। আজ "চলছে চলবে" স্লোগানের ব্যাপকতা দেখে এর সৃষ্টিতে আমার যোগসূত্রের কথা স্মরণ করে সবিনয়ে বলি "চলছে চলবে" কথা দুটি আমার মাথা থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল এক উত্তেজনার মুহূর্তে। কল্লোল চলতে না দেবার চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য চলছে চলবার মতো সাড়া জাগানো একটা স্লোগান বিস্ময়করভাবে দেশের মানুষকে চঞ্চল করে তুলেছিল এবং এ স্লোগান এখনো চলছে এবং চলবে।

আর একটি কথা মনে পড়ছে। কল্লোল নাটকের প্রস্তুতি পর্বে এল-টি-জির শিল্পনির্দেশক নির্মল গুহরায় ফরাসী দেশে ছিলেন নাট্যশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা লাভের জন্য। তখন আমি এক তরুণকে পরিচালক উৎপল দত্তর কাছে নিয়ে যাই। উৎপল দত্ত এই তরুণের উপর কল্লোল নাটকের শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কল্লোল নাটকের মঞ্চসজ্জা ভারতীয় নাট্যপ্রযোজনায় এ অবিসংবাদিত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শিল্পনির্দেশক এই প্রতিভাবান তরুণের নাম সুরেশ দত্ত। কল্লোলেই তার প্রথম শিল্পনির্দেশনা। এ দেশের নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে এ নাম আজ আর অবিদিত নেই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহু নাট্য প্রযোজনা শিল্প নির্দেশকের ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করে চলেছেন সুরেশ দত্ত।

শেষ করার আগে বলতে চাই, হয়তো ঠিক যে রকম ব্যাপকভাবে গণনাট্যের আন্দোলন ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিল তার অনেকখানি অনুপস্থিত একথা অস্বীকার করতে পারি না। তবু, আজ এবং আগামী কালের নতুনের দল সেই পুরনো দিনের উন্মাদনা, উদ্দীপনা সৃষ্টি করবেন এই আশায় রইলাম। আমাদের কয়েকজনের যতটুকু করা দরকার ছিল সবটা হয়তো করতে পারি নি, কিছুটা তো করেছি। এখন যারা কাজে নেমেছেন তাঁদের আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সহযোগিতা করে যাব এই আমাদের প্রতিশ্রুতি।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য' নতুন প্রত্যয়ে কল্লোলিত নগর কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতায় নাটকের জয়যাত্রা নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও চলছে চলবে।

যথাযথ না যুগান্তকারী

সেদিনও বংশী ছিল শ্রীরঙ্গমের শেষ কয়েকটি দিন। ভগ্নপ্রায় মঞ্চ। পলেস্তারা খসা দেওয়াল। কিন্তু নিজস্ব চেয়ারে রাজকীয় মহিমায় আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন শিশিরকুমার। ঘরে অনেক পাওনাদার,.....ড্রপ ওঠার সময় হয়ে এল, চুরুটের ছাই ঝেড়ে শিশিরকুমার বললেন, 'চলি, আমার আবার এখন মাইকেল করতে হবে।' পাওনাদারদের প্রায় অগ্রাহ্য করে শিশিরকুমার বেরিয়ে গেলেন। নাটক আর জীবন কত কাছাকাছি। সেদিন মাইকেলের আলো দিয়েছিল বংশী।

শিয়ালদহ ই বি আর ম্যানসন ইনস্টিটিউট (এখন নেতাজী সুভাষ মঞ্চ)-এ নাট্যচক্র নামে একটি দল নীলদর্পণ করছে, পরিচালনা করছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। সাবিত্রীর ভূমিকায় ছিলেন শোভা সেন। শেষ দৃশ্যে সাবিত্রী পাগল হয়ে বেরিয়ে যায়—আলো ফেলবার দায়িত্ব ছিল তাপস সেন নামে এক ছোকরার। মঞ্চের পিছনে একটা দরজা ছিল যেটা দিয়ে নেমে সোজা রাস্তায় চলে যাওয়া যায়। তা সেই দৃশ্যে একটা ফ্লাড লাইট বাইরে রাখা হল, শোভা সেন শ্যাম্পু করা আলুথালু চুল নিয়ে আলোর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে রাস্তার অনন্ত অন্ধকারে হেঁটে গেলেন। কিছু খরচাপাতি না করেও একটা নতুন ডাইমেনশন আনা গেল। অসুবিধে একটু হয়েছিল পেছনের রাস্তার আলোগুলি নিয়ে। কর্মীরা ছিলেন খুব সিনসিয়ার, আমরা কয়েকজন মিলে তৎপরতার সঙ্গে রাস্তার আলোগুলো সযত্নে ঢিল মেরে আগেই ভেঙে দিয়েছিলাম। সাবিত্রীর এক্সিট-এর সঙ্গে তাপস সেনের মঞ্চে এনট্রান্স ঘটল, ঐ ম্যানসন ইনস্টিটিউট-এর ব্যাকডোর দিয়ে।

ঠিক তিরিশ বছর আগে নিউ এমপায়ার মঞ্চে পরশুরামের 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ছায়া অভিনয় হল। পরিচালনা আলো সব কিছুই সেই তাপস সেন নামে ছোকরার। অকৃপণ সাহায্য করেছিলেন সুরকার সুবল দাশগুপ্ত ও ফণী দাশগুপ্ত। শো-এর শেষে দর্শক খেপচুরিয়াস। কোথায় তাপস সেন, শালা পয়সা ফেরৎ দাও। দিল্লীতে আগে কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে ভুশণ্ডীর মাঠে হয়ে গেলেও কলকাতা চেনা ছিল না তাপস সেনের। জানা ছিল না কাগজ অফিস বা অন্য কিছুর সুলুক সন্ধান। ভালই হল, অল্পবয়েসে ঐ রকম একটা নাগরিক সংবর্ধনা পাওয়ার পর জেদ চেপে গেল, ঠিক আছে, কলকাতাকে চিনতে হবে, চেনাতে হবে। সুযোগ পাওয়া গেল পর পর তরুণ রায়ের পরিচালনায় জাতীয় নাট্য পরিষদ-এর রূপকথা, 'দি লাইট দ্যাট শোন ইন ডার্কনেস।' বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার থিয়েটার সেনটার, দক্ষিণীর 'অরূপরতন' গীতবিতানের নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা', কমলা গার্লস স্কুলের 'চণ্ডালিকা' কত উজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত নিউ এমপায়ার। এই মঞ্চে উদয়শঙ্কর, পি সি সরকার ছাড়াও মার্থা গ্রাহাম, মার্শেল মাঁর্সু এসব দিকপালেরা শিল্প নিবেদন করেছেন। স্টেজ ম্যানেজার সুলতান, চিফ ইলেকট্রিশ্যান মনসুর সব দেখেছেন। এ যুগের অভিনয়

দেখে ওঁরা তাজ্জব। কারো সঙ্গে কারো মেলে না। কত বিচিত্র নাটক, কত বিচিত্র তার প্রয়োগরীতি। অনেক বন্ধু গালাগালি দিতেন, শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে গণসংস্কৃতি। কিন্তু যে-কোন প্রযোজনা এখানে করে যে আনন্দ পাওয়া যেত অন্যত্র সেটা সুলভ ছিল না—মেজাজটাই ছিল অন্য রকম। নিউ এমপায়ার আক্ষরিকভাবেই নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। স্টেজ ম্যানেজার সুলতান মিয়া তাঁর বিশেষ চেয়ারে বসে কত কিছু দেখে এলেন দীর্ঘ মঞ্চজীবনে। শুধু সীমায়িত দর্শক নয়, অগণিত জনতার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ মিলল। এক নতুন উন্মাদনায়, মহম্মদ আলী পার্কে শান্তি সম্মেলন, পার্ক সার্কাস ময়দানে, রঞ্জি স্টেডিয়ামে যুব উৎসব হল। একই সঙ্গে মিউজিয়ামের সামনে সমর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত সি এল টির শিশু রং মহল। এখানেই আজকের পাপেট থিয়েটারের সুরেশ দত্তকে আবিস্কার করা গিয়েছিল। এই শিশু রংমহলের অবনপটুয়া, মিঠুয়া জিজো প্রভৃতি প্রযোজনায় আলো দিয়ে শিশুদের খেলার সক্রিয় সহযোগী হতে পেরেছিলাম।

দক্ষিণ কলকাতায় একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল, ঘূর্ণায়মান ব্যবস্থা সমেত, নাম কালিকা থিয়েটার। এখন সেই কালিকা থিযেটার হিন্দী ফিল্মের সেক্স ভায়োলেন্সের পীঠস্থান। এই কালিকা থিয়েটারে একটি নতুন দল উত্তর সারথি প্রযোজনা করলেন 'নতুন ইহুদী', নাট্যকার সলিল সেন। ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায, সুশীল মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল নাগ, বাণী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায যেমন 'নবান্ন' বাস্তুহারা সমস্যার পটভূমিকায় তেমনি নতুন ইহুদী সকলকে চমকে দিয়েছিল। আলোর দায়িত্বে ছিল সেই একই ছোকরা। শ্রীরঙ্গম ছাড়ার পর শিশিরকুমার বসেই ছিলেন। শ্রীরঙ্গমে লিটল থিয়েটার গ্রুপের মহলা দিচ্ছি তখন দেখতাম শিশিবকুমার হেঁটে চলে যেতেন যেন কতকটা উপেক্ষা করেই—সব কিছুর সঙ্গে যেন যোগাযোগ ছিন্ন। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজন করলেন শিশিরকুমারকে দিয়ে মাইকেল মঞ্চস্থ কবার। শ্রীরঙ্গম ছাড়ার পর ইউনিভার্সিটি ছাড়া চার দেয়ালের বাইরে খোলা ময়দানে জনতার মুখোমুখি শিশিরকুমারেব এই আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। সম্মেলনের কর্ণধার পরিমল চন্দ্র আমাকে নিয়ে গেলেন শিশিরকুমারের কাছে, 'এঁর নাম তাপস সেন। এ আপনার নাটকে আলো করবেন।'

উদাসীন শিশিরকুমার একবার চোখ তুলে দেখলেন, কি দেখলেন না। চলে আসছিলাম, হঠাৎ ছড়ি তুলে ডেকে বললেন, 'শুনুন, কি যেন নাম? আলোবাবু। ঐ যে ন্যাতাটা ঝুলছে ওটা হাসপাতালের দেওয়াল। ওখানে আমি মরব। দেখবেন ছায়াটায়া যেন না পড়ে। আর পড়লেই বা কি করা।

সংকোচের সঙ্গে আমি কোনমতে বললাম, 'চেষ্টা করব'।

না কাজ করে একবাব একশো টাকা আগাম পাওয়া গেল। সেটাই বোধ করি থিয়েটার থেকে আমার প্রথম উপার্জন। রঙমহলে ঠিক হল পেশাদারীভাবে নিয়মিত 'নীলদর্পণ' হবে। কিন্তু হল না। বোধ হয় 'নীলদর্পণ' নাটক এবং অভিনেতা অভিনেত্রীর (মূলত নাট্যচক্র গোষ্ঠী থেকেই) যে সমাবেশ, তার খুব একটা কমার্শিয়াল কদর ছিল না। আরো আছে, আমাদের সকলের গায়েই রাজনৈতিক রং ছিল, কারো ফিকে, কারো বা একটু বেশি মাত্রায় গাঢ়। আরও কয়েকদিন পরে, তখন বহুরূপীর রক্তকরবী অভিনীত হয়েছে

দু-এক জায়গায়। তার মঞ্চ প্রয়োগ পরিকল্পনা রঙমহলের নতুন কর্তৃপক্ষকে আকৃষ্ট করেছিল। যদিও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দূরভাষিণী মঞ্চস্থ হয়েছিল, কিন্তু প্রথম আমাদের সঙ্গে কথা হলেও আমরা দূরেই রয়ে গেলাম। মঞ্চব্যবস্থা, আলোকবিন্যাস ইত্যাদির যে খসড়া আমি দিয়েছিলাম সেটা নাকি তাঁদের সাধ্যাতীত। বহুরূপীর শিল্পীরাও সরে গিয়েছিলেন অন্য কারণে।

এরপর আবার একটু পিছিয়ে যাই, আধুনিক কায়দায় যাকে বলে ফ্ল্যাশব্যাক। কলকাতার স্টেজের নানা রঙের আলো, ঘোরানো স্টেজ সব কিছু মিলে আমার কাছে ছিল এক বিচিত্র বিস্ময়কর আকর্ষণ। কিছু ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি নিয়ে হাত পাকাচ্ছি দিল্লীতে সরস্বতী পূজোয়, দুর্গোৎসবে প্রবাসী বাঙালীর নাট্য প্রযোজনায়। ঘটনাকাল ১৯৩৮। কলকাতার থিয়েটারে একটা এনট্রি নেওয়াব বাসনা ছিল প্রবল। 'রাষ্ট্র বিপ্লব' নাটক প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার কিছু কথা হযেছিল, তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, যার শেষাংশ এই রকম 'শ্রীমান তাপস সেন উইলবি এ ভেরি ইউজফুল হ্যান্ড ইন এনি স্টেজ প্রোডাকশন, দ্যাট ডিম্যানডস টু স্টেজ লাইটিং।

এর প্রায় দশ বার বছব বাদে আমি শচীনদার কাছে ঘোরাঘুরি করছি মঞ্চে নতুন আলোর ভাবনা এবং সতু সেনের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা নিয়ে। রঙমহলে 'পথের দাবী' হবে, নাট্যরূপ: শচীন সেনগুপ্ত। রঙমহলে যেদিন অ্যাপয়েনটমেন্ট ছিল সেদিন কোন কারণে শচীনদা আসতে পারেননি। শচীনদার নাম করায় কর্তৃপক্ষ আমায় সেদিন একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে অনুমতি দিলেন। রঙমহলের ব্যধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ চেহারা, আলোর সবঞ্জামও অপ্রচুর। অল্প বয়সের গরম, এসব নিয়ে কাজ করা অসম্ভব এরকম একটা ডিসিশন নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পরের দিন সকালে শ্যামবাজারে শচীনদার বাড়িতে গেলাম—সেই বিখ্যাত আড্ডা, যেখানে দিকপাল অনেকেই জমায়েত হতেন। সেদিনও ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কালীশ মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, বিভূতি লাহা, শিব ভট্টাচার্য (যাত্রা); সন্তোষ সিংহ এবং অবশ্যই মধ্যমণি শচীন্দ্রনাথ। শচীনদা হেসে বললেন—কি খবর? সব দেখলে টেখলে?

আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম হ্যাঁ গিয়েছিলাম, কিশসু নেই, অসম্ভব—সব ফেলে দিতে হবে, ও সব দিয়ে কিছু করা যাবে না।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের চেহারা পালটে গেল, রুদ্রমূর্তি শচীনদা কাঁপতে কাঁপতে খাটের উপর দাঁড়িয়ে উঠেছেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। এতদিন ধরে কত শিল্পী, কত কর্মী বাংলা স্টেজকে বাঁচিয়ে রেখেছে কত কষ্টে, তুমি এক কথায় তাকে নস্যাৎ করে দিলে—এত দম্ভ!

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দৌড় মারলাম। অনেকদিন পরে আমি পার্ক সার্কাস ময়দানে শান্তি সম্মেলনে চারটি মঞ্চের দায়িত্ব নিয়ে গেঞ্জি গায়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটোছুটি করছিলাম, শচীনদা বোধ হয় তখন গণনাট্য সঙ্ঘের সভাপতি—শম্ভু মিত্রকে বলেছিলেন আমাকে দেখিয়ে, ওকে দেখে আমার ভাল লাগে, খুব খাটিয়ে। ওকে দেখলেই আমার সতু সেনের কথা মনে পড়ে যায়, সতুও ঐ রকম কাজ পাগলা লোক ছিল। কথাটা আচমকা আমার কানেও এসেছিল, শুনে খুশিই হয়েছিলাম।

নিবেদিতা দাস ও বীরেশ মুখোপাধ্যায় অল্প পয়সায় বেশী লোককে থিয়েটার দেখানোর এক মহৎ পরিকল্পনা চালু করেছিলেন। তাঁদের পরিচালনাধীনে শৌভনিক সংস্থা ভবানীপুরে ডি এন মিত্র স্কোয়ারে বিরাট আকারে ওপেন থিয়েটার আঙ্গিকে নাট্যোৎসব করলেন, নাম দিলেন গণ-রংমহল। এই বাৎসরিক গণ-রংমহল কয়েক বছর বেশ ভালভাবেই চলেছিল। প্রকৃতিব নিদারুণ পরিহাস, মুক্তঅঙ্গনের বদ্ধ থিয়েটারে শৌভনিক আবদ্ধ হয়ে পড়ল। অবশ্য মুক্তঅঙ্গন আজ দক্ষিণ কলকাতায় বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর এক অন্যতম ওয়ার্কশপ।

ভালোয় মন্দয় বহুরূপী, এল,টি,জি, থিয়েটার সেনটার, একাধিক নৃত্যগীত শিক্ষায়তন, শিশু-রংমহলের অনুষ্ঠান আলোকিত করে চলেছি। ইতিমধ্যে বিশ্বরূপা থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগসূত্র স্থাপন হয়েছিল। 'সেতু'র ট্রেনও চলতে শুরু করেছে। এই সময় নাট্যকার শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যয় প্রস্তাব আনলেন, স্থায়ীভাবে মির্নাভা থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণের জন্য। এই প্রস্তাব প্রথমে গিয়েছিল বহুরূপীর কাছে, একাধিক কারণে ওঁরা রাজী হননি। পরে এল টি জি এবং উৎপল দত্ত সহ সবাই আমরা উৎসাহিত হয়েছিলাম। প্রথম কিছুদিন, লোয়ার ডেপথ (নীচের মহল) ছায়ানট, ওথেলো চালানো হল—দেনা বেড়েই চলল। এরপর ঠিক হল এমন একটি নাটক করতে হবে যা হবে জাইগ্যানটিক। কয়লাখনি চিনাকুড়ি, বড়াধেমো দুর্ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্তের লেখা নাটক: 'অঙ্গার'।

'অঙ্গার'এর জন্য আমরা ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার নিয়ে সদলবলে কয়লাখনি অঞ্চলে গিযেছিলাম। কয়লাখনির একাধিক দৃশ্য, শ্রমিকদের গান, নানারকম যান্ত্রিক শব্দ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। ওই সব উপকরণ নিয়ে কাজ শুরু হল। কিন্তু বাস্তব টুকরোগুলোকে জোড়াতালি দিযে সৃষ্টি করতে বার বার ঠেকে যাচ্ছিলাম। ঐসব বিশাল কয়লাখনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তার ব্যাপ্তি, সেই গভীর অন্ধকার, তার মাঝখানে শ্রমিকদের জীবন মিনার্ভার স্বল্প পরিসরে কি করে দেখানো সম্ভব! শেষ পর্যন্ত আমরা সেইসব দৃশ্যই বেছে নিলাম, যা একেবারে তথ্যগতভাবে লজিক্যাল এবং রিয়ালিস্টিক না হযেও চোখ মন, ও হৃদয় একসঙ্গে নাড়া দিতে পারে। সেইসব দৃশ্য অভিজ্ঞ দক্ষ শ্রমিক, এনজিনিয়ার বা মালিক পক্ষ হয়ত একেবারেই বাতিল করে দেবে। কিন্তু মঞ্চের প্রয়োজনে উৎপল দত্ত, রবিশঙ্কর এর সঙ্গে এল টি জি-র বলিষ্ঠ শিল্পী গোষ্ঠীর সহায়তায় আলোয় ও নির্মল গুহরায়ের স্মরণীয় দৃশ্যসজ্জায় যে কয়লাখনি জীবন্ত হল, তা আজও দর্শকের মনে অম্লান হয়ে আছে। উৎপল দত্তের দৃশসংস্থাপনের সঙ্গে সনাতনের ভূমিকায় রবি ঘোষের অভিনয় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'অঙ্গার' নাটকের উদ্বোধন রজনীর কয়েকদিন মোটে বাকি—রিহার্সাল চলছে জোর কদমে। শেষ দৃশ্যে আমরা সবাই থেকে গেছি, বিশেষত উৎপল এবং আমি। রবিশঙ্কর খালি প্রেক্ষাগৃহে বসে রিহার্সাল দেখছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কি হবে?' উৎপল বোধ হয় বলেছিল, সেই বারশো ফুট গভীরে কয়লাখনির অন্ধকারে প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকবে ক্রমে জলপ্লাবনে আটকে পড়া শ্রমিকেরা প্লাবিত হয়ে যাবে। শেষবারের মত খনির উপরতলায় পৃথিবীর মানুষের কাছে তাদের শেষবার্তা জানাতে থাকবে, সর্বগ্রাসী জলে আস্তে আস্তে তারা ডুবে যাবে।

রবিশঙ্কর মোটামুটি একটা কাঠামো পেয়ে গেলেন, এবং দুই একদিনের মধ্যে মিউজিক

রেকর্ডিং হয়ে গেল।

ই বি আর ম্যানশনে পিছনের দরজা দিয়ে সাবিত্রীর হারিয়ে যাওয়া, নীলদর্পণে হয়ত সহজেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কয়লাখনির সুড়ঙ্গের মধ্যে জল ? জল ! জল ! তখন কয়েকদিন ধরেই শয়নে স্বপনে জাগরণে জল! জলের শব্দ, জলের স্রোত, কলের জল, ঝরণার জল, নদীর জল, স্বচ্ছ জল, ঘোলাজল আমাকে যেন ভূতের মত পেয়ে বসল।

প্রথমত সমস্যা হল, যে জমাট অন্ধকারের অনুভূতি আসানসোলে কয়লা খাদে আমাদের দমবন্ধ করার উপক্রম করেছিল, সেই শ্বাসরোধকারী অন্ধকারের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অথচ ঐ কজন মানুষকে জলে ডোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারের পিছনের দর্শক থেকে সামনে দশ টাকার টিকিটওয়ালা মানুষের কাছেও চেনাতে হবে। কারণ প্রত্যেকের আলাদা পরিচিতি আলাদা চরিত্র। খুব কায়দা করে অন্ধকার-টন্ধকার দেখাতে গেলে হয়ত খুব ভাল ছবি হবে কিন্তু হলের দর্শকই আবার চেঁচাবেন সেই বহুকাল আগের ভুশণ্ডীর মাঠের মত 'আবার শালা তাপস সেন'। এই প্রবলেমটা আমার কাছে যেমন বড় তেমনি শিক্ষণীয়ও বটে। আমি হিসেব করে দেখলাম, এই ধরনের অন্ধকারত্ব বজায় রেখে মুখ চোখ দেখাতে হলে যে বিশেষ ধরনের লাইট দরকার সেগুলোর বিলেতী নাম 'মিরর' এবং 'ফ্লোট স্পট' এবং তাও একটা দুটো নয়—একগাদা দরকার। এত আলো ও তার নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র (ডিমার) কোথায় পাবো? বিলেত থেকে আনাতে সময় লাগবে ছয় থেকে আট সপ্তাহ, সরকারী ইমপোর্ট লাইসেন্স এবং অ-নে-ক টাকা, কয়েক হাজার!! অথচ আমাদের হাতে সময়, লাইসেন্স কিছুই নেই; টাকা তো নেই-ই!! মিনার্ভা চলছে ধারের উপর, উৎপল দত্তের কাঁধে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর দেনার খাঁড়া ঝুলছে। ক্ষীণকণ্ঠে ঐসব টাকা-পয়সার কথা তুলতে, এল টি জি-র তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট চিত্ত চৌধুরী এবং আরো সবাই প্রায় তেড়ে এল। আর একটা রাস্তা বহুরূপীর কাছ থেকে আলো ধার করা। কারণ একমাত্র বহুরূপীর ঐসব আলো কিছুটা ছিল, সবটা নয়। তাও বা মিনার্ভার নিয়মিত অভিনয়ের জন্য কি করেই বা চাই। সুতরাং কোন সমাধান হচ্ছে না অর্থাৎ রবিশঙ্করের জলপ্লাবনের সঙ্গীত, উৎপল দত্তের শেষ দৃশ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন প্ল্যান মাথায় আসছেই না।

নাটকের উদ্বোধন রজনী ঘোষণা হয়ে গেছে। ধার করে টাকা জোগাড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেছে। মিনার্ভা থিয়েটার-এর ইলেকট্রিসিয়ান, শিফটার থেকে উৎপল দত্ত, তাপস সেন সবাই টেন্স। এইরকম একটা মানসিক অবস্থায় জরাজীর্ণ মিনার্ভার পেছনদিকে রিহার্সালের ফাঁকে ঘোরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল বহু বছরের মিনার্ভার পরিত্যক্ত জঞ্জাল লোহালক্কড় কাঠ-কাটরার স্তূপের দিকে। কতকগুলো মরচে পড়া চারকোণা টিনের বাক্সর মত কি সব পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি ইংরেজিতে 'এক্সিট' (EXIT) লেখা। বুঝলাম, ঐতিহাসিক মিনার্ভার কোন এক অধ্যায়ে এই 'এক্সিট' লাইটগুলি দরজার মাথায় ছিল, পরে তারা 'এক্সিট' নিয়ে এখানে বিরাজ করছেন। কি রকম যেন বিদ্যুতের মত একটা আইডিয়া এল। এই টিনের টুকরোগুলোর মধ্যে যদি আমাদের সাধারণ ৪০ বা ৬০ পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালি, অন্যদিকগুলো বন্ধ করে দিই, তাহলে হয়ত খুব কাছে থেকে ব্যবহার করলে কতকগুলো বিচিত্র আলোর প্যাটার্ন সৃষ্টি হবে। স্টেজে

এনে দেখলাম বাল্ব জ্বলল, সোল্লাসে আবিষ্কার করলাম হাজার হাজার টাকার বিলেতী আলোর চেয়ে এই আলো অনেক বিচিত্র ও জীবন্ত। তখনই ঐগুলো সব তুলে এনে জড়ো করে পরিস্কার করতে হুকুম দিলাম। এই সঙ্গে আরো কিছু পুরোনো টিনের কৌটো কেনা হল—প্যারী ও মর্টন লজেন্সের। পরে ঐ লাইটগুলোর নামই হয়েছিল প্যারী ও মর্টন—ঐ নাম আজও আমার কাছে প্রিয়। ঐ টিনের কৌটোগুলোতে ছোট ছোট ফুটো করে—খাদের মধ্যে নকল কয়লার টুকরো তৈরী করে, তার আড়ালে সাজানো হল। এতে হল কি—অন্ধকারও থাকল অথচ আটকে পড়া কয়লা শ্রমিকদের মুখে ও কয়লা খাদের এবড়ো খেবড়ো দেওয়ালে অন্ধকারের বুকে সূক্ষ্ম তীব্র কতকগুলো আলোর আঁচড়ে মুখ চোখ দেখানোও সম্ভব হল। লাইসেন্স লাগল না। সময়ও লাগল না এবং ঐ টিনের কৌটো ও বাল্ব বাবদ বোধ হয় খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা। 'লো বাজেট লাইটিং' নয় কি?

এরপর হল জল। সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত জলপ্লাবন। জল কিন্তু জলবৎ তরলম মানে জলের মতই সোজা। ঐ কৌটাগুলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান সহজেই পাওয়া গেল। আগাগোড়া স্টেজের ডানদিকে থেকে বাঁদিকে লম্বা লম্বা পলিথিনের চাদর পেছন থেকে সামনে কায়দা করে ঢেউ খেলিয়ে একটু একটু করে তুলে ধরা হতে থাকল। সেই পলিথিনের উপর অন্ধকারের মধ্যে আলোর ভাঙাচোরা রেখাগুলো ঠিকরে পড়তে লাগলো, তার সঙ্গে মিশলো জলের ছলছল কলকল শব্দ; রবিশঙ্করের জলোচ্ছ্বাসের ইমপ্রেশানিষ্টিক কায়দায় মিউজিক সব মিলিয়ে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছতার মধ্যে অসহায় মানুষগুলোকে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। ক্রমে পলিথিন তথা জলের লেভেল ওদের মাথা ছাড়িয়ে যায়। এমনি সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একদম দর্শকের নাকের উপর ফুটলাইটের কাছ থেকে জল ক্রমে উঁচু হতে থাকে, সঙ্গীতের ক্লাইম্যাক্স তখন সবকিছু ছাপিয়ে গেছে। এবং দর্শকের বিস্ময়বিহ্বলতার মধ্যে শেষবারের মত পর্দা পড়ে যায়। এই চরম মুহূর্তে অনেকে হাততালি দিয়েছেন। হাততালি হল সঙ্গীতে সমের মত। অনেক ঝাপট তাল, বোলতালের পর আবেগের যে চরম মুহূর্তে দর্শক পৌঁছে গেলেন, সেটা কিন্তু নাটক, চরিত্র, সঙ্গীত, কলাকুশলী, মঞ্চকর্মী সকলের সার্থক যৌথ সৃষ্টি।

'রক্তকরবী' নাটকে কোন দৃশ্য বিভাগ নেই, সমগ্র দৃশ্যের সামগ্রিক বর্ণনা আছে, বিভিন্ন দৃশ্যের মুডও বিভিন্ন: খালেদ চৌধুরী-কৃত মঞ্চসজ্জায় একই মঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের অনুভূতি তৈরী করার চেষ্টা হয়েছিল, সুপরিকল্পিতভাবে আলোছায়া বিন্যাসের সহায়তায়। যেমন ফাগুলাল, চন্দ্রা ও বিশুকে নিয়ে একটি সিচুয়েশন, তার সংলাপ পড়লেই মনে হবে শ্রমিক বস্তির আঙিনা। সেখানে স্পষ্ট আলোয় সব কিছু দৃশ্যমান। এরপর একই জায়গায় নন্দিনী ও বিশুর যে দৃশ্য সেখানে অনেক গভীর নিবিড় রোমান্টিক পরিবেশ। আগের প্রখর আলোর বাস্তব প্যাটার্ণ থেকে প্রায় চুরি করেই দর্শকের অলক্ষ্যে আমরা আলোছায়ার একটি নতুন ডিজাইন তৈরী করতে চেষ্টা করেছি। সেই পঞ্চাশের দশকে যখন খুব বেশী আলোর সাজ-সরঞ্জাম আমরা দেখিনি—এবং এদেশে পাওয়াও যেত না—অতি সাধারণ দুটো পাঁচশো ওয়াটের ফ্লাড লাইটের সামনে খালেদ চৌধুরী মার্বেলের এফেক্ট সৃষ্টি করার জন্য কিছু সাদা কার্ডবোর্ড যোগাড় করেছিলেন। ঐ বোর্ড টুকরো

হাতিয়ে নিয়ে, ফ্লাডলাইটের সামনে নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা হল, তারপর ছুরি দিয়ে ছোট ছোট এলোমেলো ফুটো করা নকশা কাটা হল। যখন জোরালো আলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে, তখন এই ফুটো করা ফ্লাড লাইটের ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে এসে বিচিত্র আলো আঁধারির নকশা তৈরী করে— সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে আছে, খানিকটা যেন পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া চাঁদের আলোর মত মনে হয়। পরবর্তীকালে এই এফেক্ট মিরর স্পট, লেন্সের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তখন কিছুই হাতে ছিল না, জানাও ছিল কম, অথচ বিশেষ নাট্য মুহূর্তের প্রয়োজনে, এই পিচবোর্ড থেকে আলোছায়ার ছবি এঁকে আমরা "ঘুম ভাঙানিয়া, দুখ জাগানিয়া" গানের উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম শচীনদার রাগের কারণ কত কষ্ট কত সমঝোতার মধ্যে, ভালবাসার থিয়েটার টিকে আছে, তাকে সদম্ভে নস্যাৎ করা অপরাধ নয়, পাপ।

তিন দশক ধরে অনেক প্রযোজনায় অনেক মাথা ঘামিয়ে সূক্ষ্ম আলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'চার অধ্যায়' বা 'পুতুল খেলা'য় রঙীন আলোর বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু নাটকীয় মনস্তত্ত্ব বুঝে অনেক গভীর মুহূর্ত তৈরী করতে চেষ্টা করেছি, হয়ত কিছুটা সফল হয়েছি। নীচের মহল, অচলায়তন চাকভাঙা মধু, ব্যারিকেড, ডাকঘর আরো কত প্রযোজনা, সব কিছুতেই কিছু ভাববার চেষ্টা করেছি। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে অনেকদিন খুঁজেছি এ দেশের সমকালীন মঞ্চের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানার মত কোন বই আছে কিনা? অনেক গুরুগম্ভীর গবেষণা, ইতিহাস, রঙ্গকথা আছে কিন্তু পাক-প্রণালী নেই। একটা বই পেলাম 'মঞ্চে ও নেপথ্যে' লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত। পরে মহেন্দ্রবাবুকেও আমি বলেছি, একটা অভাব পূরণ আপনি করেছিলেন (সিনেমা নিয়েও এরকম একটা বই ছিল নরেন্দ্র দেবের)। আমরাও যা করেছি করছি, তাও বা লেখা হয় কোথায়? কতদিন ভেবেছি লিখে রাখা দরকার, ছবি ও নকশা রাখা, টেপও রাখা দরকার, কিন্তু হয়ে ওঠে না। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে গ্রুপ থিয়েটার আজ কয়েক দশক ধরে শুধু নিজেদের নিষ্ঠায় কত উজ্জ্বল প্রযোজনায় নাট্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করল, তার সালতামামি হয়েছে কতটুকু।

দর্শক সাধারণের কাছে আঙ্গিক চিন্তা হয়ত আলাদাভাবে খুব একটা বাহাদুরি পায় না, যতক্ষণ না, রক্তকরবীর সিদুঁরে মেঘ, সেতুর ট্রেন বা অঙ্গারের জল, মল্লিকার ট্যাক্সি চোখ ধাঁধানো চমক লাগায়—কেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি পাবলিকের মধ্যে হৈ চৈ না তোলে। বহুদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি খুব সীমায়িত দর্শক এমনকি সমালোচক যাঁদের আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, তাঁদের চোখ ও মন এড়িয়ে যায়। 'পুতুল খেলা'য় ডাক্তার রায় ও বুলুর মধ্যে ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসা আলো তাদের চোখে পড়ে না, নজরে আসে শুধু দম দেওয়া পুতুলে স্পটলাইট। অঙ্গার-এর প্লাবনের আগের দৃশ্য বা কল্লোলের কয়লার দৃশ্য খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তুলতে আলোও কম কাজ করেনি। কিন্তু সে সব উপেক্ষা করে শুধু অভিযোগ করা হয়, ট্রেন বা জল-প্লাবনে ভাপস নাটকের বারোটা বাজিয়ে দিল। তবে যাদুকরী কিছু থাকলেই তাঁরা নাড়া খান নচেৎ লেখা হয় 'আলোক সম্পাত যথাযথ প্রশংসনীয়।'

সমালোচকদের কথা বলতে গিয়ে আমার স্মৃতি আবার চলে যায় নিউ এম্পায়ার

যুগে। যাঁর কলমে যাঁর লেখায়, যাঁর মতামতে আমাদের অনেককে সত্যিকারের উৎসাহ দিয়েছে, তিনি বহুরূপীর বহু নাটক শিশু রংমহলে অবন পটুয়া এবং সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর সার্থক সমালোচনা লিখে প্রথমে তুলে ধরেন—তার নাম পঙ্কজ দত্ত। পঙ্কজবাবু সেই সময়কার নানা প্রযোজনার প্রয়োগ নৈপুণ্য ও আঙ্গিকের দিকগুলো সুন্দরভাবে উল্লেখ করতেন।

শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমের বংশী আজও আছে। অধুনা বিশ্বরূপায় সে 'দ্রুতদর্শন রীতিতে' আলোক সম্পাতের কাজে ব্যস্ত। যদিও তার চুল সাদা হয়ে গেছে, বয়স বেড়েছে, দৃষ্টিশক্তিও হয়ত ক্ষীণ। তবুও এই বংশীরা থিয়েটারের শুরু থেকে আছে, নীরবে এবং নেপথ্যে, আর এঁদের জন্যেই আলোক সম্পাত, মঞ্চসজ্জা,আবহ, যথাযথ অথবা চমকপ্রদ—কখনও বা যুগান্তকারী কখনও বা যথোপযুক্ত হয়ে থাকে।

কলকাতার মঞ্চ : কিছু স্বগত চিন্তা

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর নাট্যামেদীদের কাছে অ্যাকাডেমী। সেই অ্যাকাডেমীর দোতলা বন্ধ। কথাটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। কথাটা ঠাট্টার নয়, ভাববার। রীতিমত ভাড়া দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে সব আয়োজনের পর অনেক সময়ই দর্শক সমাজের সাড়া মেলে না। হয়ত একতলাটা পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দোতলার তালা খোলা হয় না—ওটা বন্ধ রেখেই শো চালাতে হয়। 'পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ' ঘোষণা করে। একথাটা মুক্তাঙ্গন কলামন্দির বেসমেন্ট বা হালের শিশির মঞ্চে ভাবতে হয় না, কারণ এইসব হলে দোতলার কোন বালাই নেই।

ব্যালকনি বা আপার স্টল অথবা গ্যালারীব ব্যবস্থাটা শুরুর থেকেই ছিল শ্যামবাজার পাড়ার সমস্ত পাবলিক থিয়েটারগুলোতে, এমনকি ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটেও ছিল—নতুনভাবে ইন্‌স্টিটিউট মঞ্চ সংস্কারের পর ওখানকার ব্যালকনি সম্প্রতি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চল্লিশের দশকের শুরুতে উত্তর কলকাতার চারটি পাবলিক থিয়েটার,—স্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, শ্রীরঙ্গম এবং দক্ষিণ কলকাতার স্বল্পায়ু কালিকা থিয়েটার এই ছিল নবান্নর যুগে মঞ্চের হিসেব। আর ছিল ই. বি. আর ম্যানসন ইন্‌স্টিটিউট শিয়ালদায়।

পঞ্চাশের দশকে অন্য থিয়েটার যখন আত্মপ্রকাশ করছে তখন থেকেই নিউ এম্পায়ার মঞ্চ নাট্যচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছে উত্তরোত্তর। যদিও ওই নিউ এম্পায়ার আর উত্তর কলকাতার ছায়াচিত্রগৃহ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, উদয়শঙ্কর, সাধনা বসু, মধু বসু, পি. সি. সরকারের নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঙ্গে রক্সি ও ধর্মতলার করিন্থিয়ানের নামও করা যায় যদিও এগুলো চিত্রগৃহ হিসাবে মূলতঃ ছিল, তবুও এগুলো মঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হত এবং তার জন্য স্টেজের ব্যবস্থাও অল্পবিস্তর পাওয়া যেত।

ক্রমে নিউ এম্পায়ারে ছুটির দিনে সকালবেলার অভিনয় বা বিশেষ বিশেষ সময় সন্ধ্যে বা রাতের সিনেমা শো বন্ধ রেখেও নাটক, নৃত্য বা অন্য অনুষ্ঠান হয়েছে। উদয়শঙ্কর, পি. সি. সরকার ত বটেই, মার্শাল মার্সো, ইহুদী মেনুহীন, মার্থাগ্রাহাম এবং তৎকালীন অভিজাত ইংরিজী নাট্যদল ড্রামাটিক ক্লাব অফ ক্যালকাটা, ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিক—এঁদের কত শত সার্থক হাউসফুল অভিনয়ে, সংগীতে, নৃত্যে ধন্য হয়েছিল সেদিনের নিউ এম্পায়ার।

সেইসঙ্গে আমাদের নাট্যদলগুলির প্রচেষ্টার কথাও মনে পড়ে। সকালের শোর জন্য আগের দিন নাইট শোর সিনেমা প্রদর্শনী শেষ হলে সারা রাত ধরে সেট, লাইট লাগাবার কাজে কাটিয়ে দিয়েছি। কত দিন, কত রাত এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে সবাই মিলে কী

উৎসাহে কাজ করেছি। রাত জেগেছেন অনেক দলের সক্রিয় শিল্পী, অভিনেতা কর্মী (কলাকুশলী শব্দটা বোধকরি তখনও ঠিকমত চালু হয়নি)। ওই যে অনেক সময় ধরে মঞ্চ, একটা গোটা থিয়েটার হল তার যৎসামান্য উপকরণ নিয়ে আমাদের হাতে কয়েকঘণ্টার জন্য নিরুপদ্রবে ধরা দিত—যখন সারা শহর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে, তখন আমরা নিশ্চিন্তে সেট বানাচ্ছি, আলো করছি, wings সরাচ্ছি, পর্দা নামাচ্ছি। এই করতে করতেই হাতে কলমে শিখলাম একটু একটু করে Masking কাকে বলে, সাইট লাইনের নানা নিউ এম্পায়ারীয় সমস্যার সমাধান করলাম—শুধু স্টেজ নয় পুরো অডিটোরিয়ামটা তখন আমাদের নিজেদের সাম্রাজ্য। তাই বারে বারে সামনে, পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে বসে সেট-এর ছবি দেখেছি, আলো দিয়ে আঁকবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছি। শেষ প্রান্তে পিছনের সারিতে এবং ওপরে কিছু বক্স বলে বসবার সারি ছিল exclusively অতিথিদের জন্য সেখানে গিয়ে দেখেছি, ব্যালকনিতে দোতলায়, আবার আরও ওপরে তিনতলায় গ্যালারী না upper stall কি নাম ছিল মনে নেই, সেখানে উঠেও দেখেছি রাতভোর। দৃশ্যমান অভিনেতার ওপর নীচে, ডাইনে বাঁয়ে কতটা কাটছে বা বাদ যাচ্ছে সেই হিসাবে আবার সমস্ত ব্যবস্থা একটু আধটু রদবদল করে এগিয়ে পিছিয়ে সামঞ্জস্য করতে হত। মূলত সিনেমার জন্য তৈরী বলে নিউ এম্পায়ারের আসন ব্যবস্থাও অন্য সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের মতই করা—তার মধ্যে কিন্তু আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ছাপও ছিল, যেমন বিশেষ করে একতলার সমস্ত সিটই একরকম সাধারণ কিন্তু আরামপ্রদ। কিন্তু একতলার হর্স-সু আকারের Layout plan হওয়ায় দুপাশের কিছু সিট ছিল যেগুলোর থেকে মঞ্চাভিনয়ের অনেকটা বাদ পড়ে যেত। ওই বাজে সিটগুলো ডি. সি. সির মত অভিজাত সংস্থারা নীল পেন্সিলে দাগিয়ে বাদই দিয়ে দিত। মোটকথা সাইট লাইন সম্পর্কে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ওই নিউ এম্পায়ারের কালেই। কিন্তু আজ দোতলার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে 'রক্তকরবীর' অভিনয়ের সময় এক নতুন অভিজ্ঞতার কথা। কোন কারণে সেইদিন তিন তলায় উঠে গিয়েছি নাটক চলার মধ্যে, কিন্তু সেই দেবতা বা God-দের আসন থেকে যে দৃশ্য দেখলাম যে—রবীন্দ্রনাথের যে 'রক্তকরবী' শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়, ভাবনায়, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনায় আমি অনেক শো এবং রিহার্সালে দেখেছি কাছের থেকে, পাশ থেকে, লাইট পার্চের ওপর থেকে অডিটোরিয়ামের নানান জায়গা থেকে ত বটেই, সেদিন হঠাৎ একঝলক সেই চেনা পরিচিত দৃশ্য সব যেন অন্যরকম লাগতে লাগল। সেই অত উঁচুতে, দূরত্বের ফলে যদিও মুখ চোখ খুব পরিষ্কার বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু Top view বা Birds eye view যাকে বলে সেটা কাছের থেকে বা নীচের লেভেল থেকে দেখার চেয়ে একেবারে অন্যভাবে অনেক অর্থবহ হয়ে দেখা গেল। সমস্ত পাথর, সিঁড়ি, চাতাল, থাম, রাজার ঘরে জালের দরজা, সিঁড়ির ধাপের সামনের সংকীর্ণ জায়গা—এবং সবকিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে যেন মঞ্চের কাঠের প্ল্যাঙ্ক floor space যার এতদিন ওই রকম কোন বিশেষ মানে ছিল না। Set-এর সঙ্গে সিঁড়ির সঙ্গে constant চ্যালেঞ্জ, প্রতিনিয়ত গতিশীল হয়ে উঠছে, নতুন একটা ভাষা তৈরী হয়ে যাচ্ছে—সর্দার, গোঁসাই, বিশু, নন্দিনী, খোদাইকরদের চলাফেরা, নড়াচড়া বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকার সাময়িক ভাস্কর্যের চেহারায়। আর

ওইখান থেকে দেখেই বোঝা গেল দৃষ্টিভঙ্গী বা দৃষ্টিকোণের বদলে কতকিছুই বেশী করে উপলব্ধি করা যায়। নিয়ত পরিবর্তনশীল space নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে—একজন, দুজন, তিনজন মানুষের বিশেষ অবস্থান ও দূরত্বের হেরফেরে ওদের নিজেদের মধ্যে আবেগের টানাপোড়েনে যেন এই space অদৃশ্য। দৃশ্যমান আঁকিবুকি কীরকম যেন অন্যভাবে নতুন নতুন নক্সা তৈরী করে দর্শকের কাছে আরও একরকম নাটকীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলে।

হয়ত, হয়ত ওই ওপর তলার ওই কম দামের টিকিট কেনা দর্শকেরা অনেক কিছুই miss করেছেন, নাটকের অনেক শান্ত intimate situation, যেমন বিশু নন্দিনীর রাজার ঘরের সামনে আলাপের অনেকটাই পাননি, পাননি চোখের মুখের expression, ছোটখাট সংলাপের modulation, যদিও নিউ এম্পায়ারের acsoustic, মনে রাখার মত এবং সমস্ত হলের এমনই সংগঠন যে নীচু পর্দার অভিনয়ও কুশলী অভিনেতা সমস্ত দর্শকের কাছেই পৌঁছে দিতে পারেন। আর দর্শকরাও চিরকাল খুশি হয়ে অভিনয় দেখেছেন ও শুনেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু ওই একটা পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ এবং দূরত্বের জন্য ওঁদের দেখা রক্তকরবীর পাওনাটা একতলার বেশীদামের টিকিটের দর্শকের থেকে একটু আলাদা তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। যদিও দুদিক থেকেই 'রক্তকরবী' সমান important এবং চেতনাকে নাড়া দেয়।

নিউ এম্পায়ারের স্বর্ণযুগ আজ অতীতের গল্পমাত্র। তারপর মুক্তাঙ্গন, রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, শিশিরমঞ্চ আর শ্রীরঙ্গমের বিশ্বরূপা নাম বদলের সঙ্গে এল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, রঙ্গনা, বিজন থিয়েটার, দক্ষিণের যোগেশ মাইম, তপন থিয়েটার আর নানা মঞ্চের সাময়িক আবির্ভাব যেমন প্রতাপ মেমোরিয়াল, রামমোহন, শ্যামাপ্রসাদ, সুজাতা, নেতাজী (আগের ই, বি আর ম্যানসন) ও বাসুদেব। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য মিনার্ভা থিয়েটারকে কেন্দ্র করে প্রথমে L. T. G.-র নিয়মিত অভিনয় ও পরে রঙ্গনাতে নান্দীকার সংস্থার দীর্ঘ দিন নিয়মিত নাটকাভিনয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে সায়ক গোষ্ঠীর বিজন থিয়েটার ও যোগেশ দত্তর একক প্রচেষ্টা কালীঘাট পার্কে যোগেশ মাইম একাডেমি। এই ধরনের প্রচেষ্টার প্রথম সার্থক রূপায়ন আরও আগে হয়েছিল শ্রীসমর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে সি. এল. টির গড়িয়াহাটে অবনমহল মঞ্চ। শ্রীঅমর ঘোষ নিজস্ব প্ল্যানে বানালেন সারকারিনা মঞ্চ যেটি অন্যসব প্রচলিত প্রোসেনিয়াম স্টেজের গড়নে নয়, Theatre in the round—মাঝখানে অভিনয় মঞ্চ আর সবদিক ঘিরে দর্শক আসন। এছাড়া থিয়েটার তৈরীর আর এক ক্ষুদ্রতম কিন্তু বড়ো নিদর্শন হল থিয়েটার সেণ্টারের ছোট হল। থিয়েটার সেণ্টার পঞ্চাশ ষাটের দশকে অনেক নাট্যোৎসব ও একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। এই ছোট্ট আকারের হল সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে চলে, এটা গর্বের ব্যাপার।

শিশির মঞ্চ, অহীন্দ্র মঞ্চ, গোর্কীসদন, ম্যাক্সমূলার ভবন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের নবরূপ ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। আর এখন নির্মীয়মান বাগবাজারে গিরিশ মঞ্চ ও গড়িয়াহাটে মধুসূদন মঞ্চ— এদুটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে, মনে হয় আর বছর খানেকের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পদাতিকের নিজস্ব মুক্ত মঞ্চের ব্যবস্থাও সুন্দর ও অভিনব।

সবার অগোচরে ও অলক্ষ্যে ইতিমধ্যে আরও একটি আধুনিক মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে উদ্‌ঘাটনও হয়ে গেল। সেটা হল জি. ডি. বিড়লা সভাগৃহ। গড়িয়াহাট রোডে বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের সামনে যে বিশাল মন্দিরটি গত কয়েক বছর ধরে আমাদের চোখের সামনে তৈরী হচ্ছে, তারই নীচের তলায় একটি ছ-সাতশ' আসনযুক্ত এয়ার কণ্ডিশন্ড ও আধুনিক আলো ও শব্দের সাজসরঞ্জামে সাজানো এই মঞ্চ ব্যবহারের প্রতীক্ষায়। আরও আছে প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটের ওইরকমের একটি আধুনিক থিয়েটার জ্ঞানমঞ্চ—সব ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু শ্রমিকমালিক বিরোধের জন্য দীর্ঘকাল ওর দরজা বন্ধ।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় আরও কিছু মঞ্চের প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা আছে এবং এর জন্য কলকাতায় বেশ কিছু জায়গা সরকারের হাতে এসে গেছে—শুধু এখন অভাব একটা জিনিসেরই, তা হল টাকা। জাতীয় নাট্যশালার জন্য কিছুদিন রাজ্যসরকারের উদ্যমের কথা শোনা গিয়েছিল, কিন্তু অনেক জল্পনা-কল্পনার পর নাকি ক্যামাক স্ট্রীটের প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেছে।

এর আগে অনেক আশা নিয়ে পরিকল্পনা করেছেন বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি, শৌভনিকও শুনেছি নিজস্ব মঞ্চের জন্য জমি পেয়ে গেছেন। কলকাতা কর্পোরেশনও তো ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে রবীন্দ্রভবন করতে যাচ্ছেন; মঞ্চে মঞ্চে কলকাতা তো কল্লোলিত হবে, কিন্তু থিয়েটারের বাড়িই সব নয়, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, জীবন্ত নাটক নিয়ে দিনের পর দিন নাট্যচর্চা হলে তবেই এই সব ইঁটপাথরেব ইমারতগুলো সার্থকতার পথে এগিয়ে চলবে, নয়ত আর একটি রবীন্দ্রসদন নামক হাফ অচলায়তন!

যে প্রসঙ্গে এইসব মঞ্চের কথা এসে গেল সেটা হল হালে জনপ্রিয় নাট্যকেন্দ্র অ্যাকাডেমীর অনেক শো'তেই একটা অপ্রিয় পরিস্থিতি ঘটে যেটা প্রায় ওপেন সিক্রেট অনেক নাট্যদলের কাছে। দোতলার ব্যালকনি আসনের দাম কমই, কিন্তু ওই আসনগুলো অনেক অভিনয়েই অবিক্রীত থেকে যায়। আর অনেক সময় চার্টে দোতলাটা বাদ দিয়েই তার নিরীখে টিকিট বিক্রীর ভালমন্দ বা কখন হাউসফুল ধরা হয়েছে। কিন্তু, নাটকের টিকিটের চাহিদা, দর্শকের প্রত্যাশা, বিজ্ঞাপন প্রচার ও নাট্যবিষয়, অভিনয়ের মান সবকিছু মিলে মিশে এই ফাঁকটা কেন থেকে যাবে বা যাচ্ছে এই কথাটা প্রায়ই মনে আসে। অনেকের সঙ্গেই কথা বলে দেখছি, ব্যাপারটা এখন খানিকটা মেনে নেওয়াও হয়েছে—যদিও আজ অ্যাকাডেমী সবচেয়ে চালু ও পপুলার নাট্যগৃহ, কিন্তু মঞ্চ হিসাবে অডিটোরিয়ামের সঙ্গে সাইটলাইন ও নানাবিধ অসুবিধা স্টেজের আছে, আলোরও আছে। তবু এখানেই মানুষ আসেন, সহজে সকলে অভিনয়ের ডেট পান না। অন্য অনেক হলের চেয়ে বেশী ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই হলটা কেমন করে আজ নাট্যপ্রিয় দর্শক সমাজের কাছে জমজমাট। এই হলের সঙ্গে অনেক সংস্থার কেমন একটা সহজ একাত্মতাও তৈরী হয়ে গেছে—এর শুরু কিন্তু উদয়শঙ্করের শঙ্করস্কোপের একটানা অনুষ্ঠানের পর বহুরূপীর পাগলা ঘোড়া নাট্যাভিনয়ের নিয়মিত আয়োজন দিয়ে। দেখতে দেখতে তাও কতবছর হয়ে গেল।

অ্যাকাডেমীর সমস্ত আসন দোতলা সমেত আজও অনেক অনুষ্ঠানে, অভিনয়ে পূর্ণ হয়ে থাকে, তবু সার্থকভাবে মঞ্চের যাবতীয় যান্ত্রিক ও অডিটোরিয়ামের যথাসম্ভব উন্নয়ন একদিন নিশ্চয়ই হবে আর তার সঙ্গে আমরা যারা এখানে নাটক করতে আসি, এমন

কিছু করার মত আশা রাখব যখন কেবল মাঝেমধ্যে ব্যালকনি থেকে দেখা মঞ্চ অনেক বছর আগে নিউ এম্পায়ারের ব্যালকনি থেকে দেখা মঞ্চের মত অত দূরের হবে না কারণ অ্যাকাডেমীর সমস্ত লেআউটের মধ্যেই একটা inherent নৈকট্য আছে একথা তো সকলেই স্বীকার করবেন।

একটা ধারণা আমাদের অনেকেরই হচ্ছে, বয়সের অবশ্যম্ভাবী মুদ্রাদোষে কিনা জানি না, এখনকার নাট্যচর্চায় কী আরও বেশী অনুশীলন, পরিশ্রম, ডেডিকেশন দরকার? যা চলছে চেষ্টা চরিত্র, নাটকলেখা, অভিনয়ের সর্ববিভাগে আরো কি কি করলে লোকের মন টানবে, দোতলা খুলবে, সোজা কথায় আরও বেশী দর্শক আসবে সেটাই ভাববার কথা।

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলার শিল্পভাবনা ও সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সতেজ সবেগ নতুন জোয়ার আনা যায় কিনা জানি না—তবে অনেক নবীন পরিচালক, সংস্থা, শিল্পী প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যতের আশা নিয়ে আসছেন—সেই আশাতেই রইলাম।

স্মৃতিতে চল্লিশের দশক থেকে

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোটামুটি একটা প্রচলিত ধরণ ধারণ ছিল। সেটা হল—পেশাদার রঙ্গালয়ের ছাপা—লিখিত নাটক—পুজোর সময়, ক্লাবে, ক'লকাতায় বা বাইরে করা। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা ভাবনা চিন্তা করে কোন মৌলিক চিন্তায় Progressive Artists' Association-এর উদ্যোগেই প্রথম নাটক করা শুরু হল। প্রথম বিজনদার কিছু ছোট নাটক—'জবানবন্দী', 'ল্যাবরেটরী' বোধহয় বিনয় ঘোষের 'আগুন'—আর ঐ রকম কিছু—তারপর 'নবান্ন'। 'নবান্ন' হতেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শুরু। ৪০-এর দশকের শেষ ও ৫০-এর দশকের শুরু থেকে ৬০-য়ের দশক—এই ২০ বছরে যে বেশ একটা জোরালো ব্যাপার হয়েছে—প্রধানতঃ নাট্যক্ষেত্রে বহুরূপী শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে আর উৎপল দত্তের এল. টি. জি এরা এসেছে আর এদের সঙ্গে সঙ্গে আরও একাধিক নাট্যদল এসেছে—তার কর্মকাণ্ড এতদূর ছিল যে 'নবান্ন' প্রভাব বিস্তার করেছিল পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। শিশির ভাদুড়ী, যিনি গিরিশ ঘোষের পর নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন—কি অভিনয় রীতিতে—কি প্রয়োগে—তিনিও একেবারে সমাজ সচেতন, বাস্তবভঙ্গীর নাটক তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' করেছিলেন, আর বহুরূপীতে শম্ভু মিত্র 'নবান্ন'-এর পর বিশেষ করে নাটকের কাজকর্ম, অভিনয় সবদিকে জোর দিয়ে—অনেকগুলো নাটক নিয়ে কাজ শুরু করলেন। নিজেরাও নিউ এম্পায়ারে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন কয়েকটি নাটক দিয়ে—'পথিক', 'ছেঁড়াতার' উলুখাগড়া'।

সেই থেকে নিউ এম্পায়ারে শুরু হ'ল রবিবার সকালের অভিনয়। এ ছাড়া এল. টি. জি. ইংরেজী থেকে বাংলা নাটকের দল হ'ল, তখন নিজেরা নানান জায়গায় শো করতো, কলশোও করতো। কখনও নিউ এম্পায়ারে রবিবার সকালে, কখনো সন্ধ্যায়। এই সময় 'থিয়েটার সেন্টার' তরুণ রায়ের নেতৃত্বে তৈরী হয়। একটা উৎসব করে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে, তাতে বহুরূপী, এল. টি. জিও ছিল। বিভিন্ন ভাষার নাটকের সাথে—ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাবের নাটকও হয়েছিল। এগুলো পঞ্চাশের শুরুতে।

এর সঙ্গে অনেক ছোটছোট দলও ছিল। নিউ এম্পায়ারে—শম্ভু মিত্রর প্রযোজনায় বহুরূপীর নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এর সঙ্গে এল. টি. জি-র শেক্সপীয়রের বাংলা নাটক হয়েছিল। আর কিছু কিছু অন্য নাটক—যেমন, গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথ' অনুসারে 'নীচের মহল' বা গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা'—রবীন্দ্রনাথের 'তপতী', 'অচলায়তন' অভিনয় হচ্ছিল ৫২-৫৩-য়। ৫৫-৫৬-এ বিশ্বরূপা, রঙমহলে এল টি জি মাঝে মাঝে ভাড়া নিয়ে নাটকও করেছে। উৎসবের আয়োজনও করেছে—সব দলই করেছে। কিন্তু 'ইম্পরটেন্ট' কথা হলো এই সময় নিউ এম্পায়ারে রবিবার বা ছুটির দিন সকালে অভিনয় করাটা গ্রুপগুলোর কাছে একটা আদর্শ হয়েছিল। আর এটা ছিল গণনাট্য সংঘের দ্বিতীয়

পর্যায়। নবান্নের পর Central Squad-এর "India Immortal" বা Spirit of India" ইত্যাদি এইসব নাচের বা গানের দলের পর এই মধ্যবর্তী পর্যায়ে কিছু কিছু কাজকর্ম আরম্ভ করেছিল। উৎপল দত্ত এল টি জি করার আগেই উৎপল, ঋত্বিক, মমতাজ আমেদ খাঁ, শোভা সেন এরা সবাই মিলে যাঁরা 'নবান্ন' করেছিলেন তাদের মধ্যে শম্ভুবাবু বহুরূপী করলেন। আরও কয়েকজন মিলে নতুন নাটক গোষ্ঠী করলেন 'নাট্যচক্র' আরও পরে বহুরূপী থেকে বেরিয়ে সবিতাব্রত, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী—এরা 'রূপকার' করেছিলেন। প্রথমে নাম ছিল 'আনন্দম'। তার আগে নাট্যচক্র তৈরী হয়, বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'নীলদর্পণ' দিয়ে। এতে শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখেরা ছিলেন। দু'জন বহুরূপী ও নাট্যচক্রে Common ছিলেন—গঙ্গাপদ বসু ও আরতি মৈত্র।

৫০-এর দশকে একেবারে শেষেরদিকে শ্রীরঙ্গম ছেড়েছেন শিশির ভাদুড়ী, মালিক বদল হয়—নাম হ'ল বিশ্বরূপা। শিশির ভাদুড়ী, বহুকাল পর আবার নানান জায়গায় অভিনয় করে বেড়াতে শুরু করেন সংস্কৃতি সম্মেলন, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদিতে। শ্রীরঙ্গমে নতুন নাটকের লোকেদের নিয়ে আসা শুরু হয়—বিশেষ করে বাইরে নতুন নাটকের প্রবাহের যে প্রাণচাঞ্চল্য সেখান থেকে। আগে অনেক আগে স্টারে অভিনয় করতো কালী ব্যানার্জী, রূপান্তরীর তরুণ কুমার আমিও বিশ্বরূপায় প্রথম যে 'আরোগ্য নিকেতন' ও পরে 'ক্ষুধা' নাটক হয়, প্রথম সেখানে যাই। কালী ব্যানার্জী, মমতাজ আমেদ, বসন্ত চৌধুরী, তরুণ কুমার 'আরোগ্য নিকেতনে', এর পর বসন্ত চৌধুরীর দ্বিতীয় নাটক 'ক্ষুধা'য় এরা আসেন। তৃপ্তি মিত্রও আসেন। 'রক্তকরবী' দেখে তৃপ্তি মিত্রকে বিশ্বরূপায় দক্ষিণেশ্বর বাবু আমন্ত্রণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে এই অন্য নাটকের লোকদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত শুরু হ'লো Profession ও Career এর জন্য। এর আগে আর একবার রঙমহলে যখন নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিলো—তখন বহুরূপীর প্রায় সবাইকেই 'দূরভাষিণী' নাটকে নেওয়ার কথা হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। এতে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ সবাই ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে ঐ নাটকে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন নি। পরে ঐ নাটক অন্যভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'রক্তকরবী' দেখে আমাকেও ঐ নাটকের পরিচালকবর্গ (হেমন্তবাবু, নলিনীবাবু) ডেকেছিলেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠলো না। এরপর বিশ্বরূপায় 'সেতু' নাটকে তৃপ্তি মিত্র এলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নাম করলেন। সেতু রেকর্ড করলো হাজারেরও বেশী অভিনয় করে, তাতে একটা ট্রেনের দৃশ্য ছিল। তৃপ্তি মিত্রর অভিনয় ছিল। মমতাজ আমেদ, তরুণ কুমার, সন্তোষ সিংহ—এঁরাও ছিলেন। নরেশ মিত্র পরিচালনা করেছিলেন। তিনি অভিনয়ও করতেন। অসিতবরণও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর সরকারের উৎসাহ-অবদান নিয়ে 'সেতু' নাটকের একটা দারুণ নামডাক হয়ে গেলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাটকের আকর্ষণটা একদম পড়ে গিয়েছিল। 'শ্যামলী' নাটকের পর কিছুটা, আর স্টার এয়ার কণ্ডিশন্ড হওয়ার পর বৃহস্পতি, শনি, রবি অভিনয় করার রেওয়াজটা বোধহয় চালু হয়ে গেল। আর ব্যবসাদারী থিয়েটারের, সিনেমার পাশাপাশি আকর্ষণটা আবার বাড়তে শুরু করে। 'শ্যামলী'র রেকর্ড ভাঙে রঙমহলে নীহাররঞ্জনের 'উল্কা'। আবার 'উল্কা'র রেকর্ড ভাঙে বিশ্বরূপার 'ক্ষুধা'। আবার 'ক্ষুধা'র রেকর্ড ভাঙলো 'সেতু', বিশ্বরূপারই পরের

নাটক। তারপরে অবশ্য লন্ডনে 'মাউসট্রাপ' এর থেকে অনেক কম হলেও এখন তপন থিয়েটারের 'নহবত' অনেক বেশী অভিনয় হয়েছে। সেই একটা নাটক অনেক দিন একটানা চলার রেওয়াজ শুরু হ'লো।

যদিও ওরকম চলার অনেক খারাপ দিক আছে। সে ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না। 'সেতু'র কিছু আগেপরেই মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনার জন্য নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। বহুরূপীতেও গিয়েছিলেন কিন্তু তারা তেমন উৎসাহ দেখান নি। কারণ বহুরূপী আলাদাভাবে মিনার্ভায় কিছু অভিনয় করেছিলেন। তখনকার আবহাওয়ার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ তাদের মনে হয় ভালো লাগেনি। তারপর এল টি. জি-র কাছে যেতে তারা উদ্যোগী হয়ে পরিচালনার দায়িত্ব নিলো। ৫৯-৬০এ 'নীচের মহল', 'ওথেলো', 'ছায়ানট' এইসব নাটক তারা অভিনয় করলেন। এইসব নাটকে বেশ আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। এর আগে থিয়েটার পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এরপরই সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে হঠাৎই নামানো হল 'অঙ্গার'। 'অঙ্গার' হ'লো একটা প্রথম প্রচেষ্টা-যেটা উৎপল দত্ত লিখলো-পরিচালনা করলো, রবিশংকর সংগীত করলো—নির্মল চৌধুরী অভিনয় করতো, গানও করতো দুটো একটা দৃশ্যে। রবি ঘোষ, নীলিমা দাশ এদের নিয়ে এল টি জি-র একটা শক্তিশালী দল ছিল। তারা অভিনয় করলো পেশাদারী থিয়েটারে, গ্রুপ থিয়েটারের সবাই অভিনয় করলো,—এটা একটা বড় পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ছিলো—সে সবরকম Contradiction-এব মধ্যে দিয়েই কিন্তু 'অঙ্গারে'র দারুণ জনপ্রিয়তা হল—'অঙ্গারে'র mounting 'অঙ্গারে'র অভিনয়, 'অঙ্গারে'র বিষয়বস্তু, Spectacularism—কয়লাখনির দৃশ্য—নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জা, বিশেষ করে রবিশংকরের সংগীত ইত্যাদি নিয়ে। 'সেতু'তে Tape recorder এর ব্যবহার প্রথম হয়েছিল। Back-ground incidental Music, Noise, ট্রেনের শব্দ ইত্যাদি টেপে ছিল। একটা নয়, দুটো টেপে বাজতো। তখন টেপ রেকর্ডারের কথা ভাবাই যেত না। এখনকার মতো জলভাত নয়। সে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা। 'সেতু'তে একরকমভাবে শুরু হ'লো তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হ'লো 'অঙ্গার'এ, রবিশংকর সংগীত করলেন—স্বেচ্ছায় সঙ্গীত রচনা করলেন, H. M. V. - তে দু'তিন দিন ধরে রেকর্ডিং হ'লো। তারপর সেটা 'অঙ্গার' এ বাজলো দারুণ perfect tune-এ। —একটি নতুন ছেলে উৎপল তৈরী করলো—যার মাইক স্পীকার বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। সে হল শ্রীপতি দাস। উৎপল তাকে এমন তৈরী করলো যে 'অঙ্গার'-এ সে তো Tape operate করতোই—তারপর যখন 'সেতু'র পর 'ফেরারী ফৌজ'—যেটায় রবিশংকর সংগীত করলো, এরপরে 'কল্লোল' ইত্যাদি মিনার্ভায় এল টি জি-র যে নাটকগুলোই হয়েছে তার সব কটাতেই শ্রীপতি Sound Operate করতো। আর এ কাজে সে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং এ ব্যাপারটাকে উৎপল দত্তের একটা অসাধারণ সৃষ্টি বলা যায়। যা হোক্ পেশাদারী ভিত্তিতে এল. টি. জি. অন্যান্য গ্রুপ-এর কাছে 'অঙ্গার' দিয়ে একটা সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। এর পরই 'ফেরারী ফৌজ'। রাজনৈতিক দিক থেকে—'অঙ্গার' শ্রমিক শোষণ, 'ফেরারী ফৌজ'—ত্রিশের দশকের ইংরেজ আমলের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। তার আগে অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' হয়ে গেছে। সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার হচ্ছে যে বিজন ভট্টাচার্যকে উৎপল দত্ত নিয়ে এলেন। তিনি রামকেশরের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। নির্মল চৌধুরী অনেক গান করেছিলেন। ঠিক মনে পড়ছে না—মিউজিক করেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস নয়তো নির্মল চৌধুরী। কিন্তু সেটাও একটা Sepctacular জমজমাট Production হয়েছিলো। হলের মাঝখান দিয়ে Platform বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই গ্রামের মেলার দৃশ্য-সজ্জা হতো। সেটা নিয়ে কলকাতা করপোরেশনের সঙ্গে অনেক ঝামেলা হয়েছিল। সেটা সমাধানের জন্য সত্যজিৎ রায় ও আরও অনেকে intervane করেছিলেন। এরপরে 'কল্লোল'। 'কল্লোল' একটা দিকদর্শন। কারণ সেই সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নানারকম প্রতিক্রিয়া চলছে। অনেক জিনিষ বলা যেত না, হ'তো না। 'কল্লোল' একটা নতুন চিন্তা ভাবনা ও চেতনার সৃষ্টি করেছিল। একদিকে যেমন নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর নাট্যানুষ্ঠান মানুষের মন জয় করেছিল—তার সঙ্গে 'কল্লোল' মিনার্ভায়। ৬৩-৬৪ তে শেক্সপীয়রের চারশো জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে Stratford-on-Avon-একমাত্র Indian Shakespeare Scholar হিসেবে উৎপল দত্ত আমন্ত্রিত হয়েছিল—এবং সেখানে শেক্সপীয়রের সমাজ চেতনা সম্পর্কে বক্তৃতাও দিয়েছিলো। মিনার্ভা থিয়েটারে শেক্সপীয়রের চারটে নাটক হয়েছিল। একটা বোধহয় ইংরেজীতে,—'ওথেলো', Mid Summer nights dream এর উৎপলের করা অনুবাদ বাংলায় "চৈতালী রাতের স্বপ্ন"—আর খুব সম্ভব 'Julius Caesar in Modern Costume', মোট চারটে নাটক—এক নাগাড়ে দশ দিন—পনেরো দিনের মধ্যে। খুব আর্থিক কষ্টের মধ্যেই 'Mid Summer Nights dream, এর মতো নাটক হয়েছে। পুরানো দিনের জিনিষপত্তরগুলো, সেট-টেট উল্টে পাল্টে—তারমধ্যেই পরিবেশনা করা হোতো। কিন্তু একটা জিনিষ—তারুণ্যে, প্রাণচাঞ্চল্যে সব টগবগ করে ফুটতো; নতুন উদ্দীপনায়। আর সেটাই ভাববার মতন ব্যাপার বলে আমার কাছে মনে হয়। আরো অনেকের কাছেই তা মনে হয়।

এরই পর 'কল্লোল' মঞ্চস্থ হয়েছে। বাংলায় যাঁরা তখন নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন—তাঁদের কাছে 'কল্লোল'—তার Mounting, Stage Craft, অভিনয় সব নিয়ে এবং বিষয়বস্তুতে নৌবিদ্রোহের ব্যাপারে এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিরোধী বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট ছিল বলে একটা বড় ছাপ ফেলেছিলো। শুধু চিন্তাশীলদের নয় সাধারণ মানুষ—বিশেষ করে যুব সমাজকে নাটকটা খুব আকর্ষন করলো। 'কল্লোল' দিনের পর দিন হাউস ফুল হতে লাগলো এই সময় কংগ্রেস সরকার থেকে হঠাৎ একদিন উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করলো। তার পরের দিনই 'কল্লোলে'র অভিনয় ছিল। উৎপল একটা বড় রোল-এ অভিনয় করতো, আর ও ছিল ঐ দলের প্রধান। গ্রেপ্তার করার পেছনে ঐ রকম একটা উদ্দেশ্য ছিলো। ও যে ধরণের নাটক করতো, লিখতো—তাতে ওর ভাবনাচিন্তা সমস্ত জনসাধারণের মনে এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, 'কল্লোল' দেখতে দূর-দূরান্তর থেকে বাসে, টেম্পোতে, লরীতে করে লোকে আসতো—এমন কি Matinee দেখে আবার Evening দেখতো—এসবের মূলে উৎপল দত্ত। তাই তাকে গ্রেপ্তার করলো। তা সত্বেও 'কল্লোল' একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নি। আর কি হলো, জিতেন বাবু আর তার স্ত্রী সুলেখা ভট্টাচার্য দলে ছিলেন। জিতেনবাবুই ঐ অভিনয়টাই করে

দিলেন। উৎপলের মতো হ'লো না, কিন্তু অসাধারণ করে গেলেন। ঠিক মতো ঢোকা, কিউ নেয়া, ওঠা-বসা—সংলাপ—সব ঠিকঠাক করে গেলেন। প্রায় একদিনেরও নোটিশে নয়, এরপরেও নাটকটা চলল। কোনো খামতি বোঝা গেলো না। তার Stage Craft, Mounting, team work সব নিয়েই 'কল্লোল' স্বমহিমায় চলতে লাগলো। উৎপলকে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও এল. টি. জি-এর 'কল্লোল'কে থামানো গেলো না।

'কল্লোল'-এর আগে 'অঙ্গার' নাটক থেকে একটা নতুন ব্যাপারের সূত্রপাত হয়েছিল। সেটা বাংলা ও ইংরাজী খবরের কাগজে 'অঙ্গার' নাটকের বিজ্ঞাপনের ধারার একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলাম। এ ব্যাপারে বহুরূপীর কিছু নাটকের বিজ্ঞাপনের স্বাতন্ত্র্য চোখ ও মনকে টানতো। তাই সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল—এমনকি 'পথের পাঁচালী' সিনেমার বিজ্ঞাপনের ভাবভাষা সবকিছুও তাই। সে কারণে নাটকের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আমাকে যখন বলা হ'ল তখন ওপর নীচে জায়গা ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখেছিলাম "ভারতীয় নাট্যমঞ্চের বিস্ময়—'অঙ্গার"। তাই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। এর পর খালেদ চৌধুরী পোষ্টারের ডিজাইন করে দিয়েছে—তাতেও খুব হৈ চৈ হয়েছে। এ সব নিয়ে তখনকার যে যুবসমাজ, এ নাটককে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে 'কল্লোল' নাটকও ভীষণ ভাবে চলেছিল—তারপর উৎপল গ্রেপ্তার হ'ল। উৎপল এবং দলের আরো অনেকের মধ্যে কিছু উগ্র মতবাদ ছিল—যা আমার ছিল না। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন জনের মধ্যে অনেক মত-পার্থক্য ছিল তবুও সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গড়ে ওঠে। আজকের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ)দলের অনেকে সেদিন তার সাথে যুক্ত ছিল। সি, পি, আই, দলে আলাদা ব্যবস্থা ছিল—বিভিন্ন গ্রুপেও আলাদা আলাদা ব্যবস্থা, কিন্তু সব কিছু মিলে একটা Polarisation হয়েছিল। যেমন, ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্রকে একসাথে কাজ করতে দেবার জন্য অনেক তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তাছাড়া কংগ্রেস সরকারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলেব বিরুদ্ধে, 'কল্লোলে'র সময়ে বিভিন্ন নাট্যদলের শিল্পীরা সম্মিলিত ভাবে এক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তারপর ষ্টার থিয়েটারে বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক' নাটকে গান্ধীটুপী ব্যবহার করায় তরুণকান্তি ঘোষ প্রমুখেরা যে ভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধেও জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঠিক এর পরই Broad Based আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে বহু নাট্যদলও যুক্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। মন্মথ রায় ও গণনাট্য সংঘের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সক্রিয় ভাবে এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

এছাড়া উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হবার পর যে বিস্তৃত আন্দোলন হয়েছিল। এ ঘটনার পর Statesman ছাড়া আনন্দবাজার ও অন্যান্য সব পত্রিকা 'কল্লোল'-এর বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করে দেয়। সাথে সাথে পোষ্টারের মাধ্যমে এটা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দেওয়া হোলো "বিনা বিজ্ঞাপনে 'কল্লোল' চলছে চলবে"। এ পরিস্থিতিতে কল্লোল আরও জনপ্রিয় হয়ে গেল। একই সাথে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা (Peoples Artist Federation. P. A. F)-র কর্মী হিসেবে জোছন দস্তিদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। উৎপল 'অজেয় ভিয়েতনাম' করে ছিল 'কল্লোল'-এর পর। আর জোছন ভ্যানত্রয়কে নিয়ে করেছিল 'অমর ভিয়েতনাম'। এটাও খুব ভাল নাটক হয়েছিল। তখন ওদের দলের

নাম ছিল 'রূপান্তরী'। এ নাটকে পুলিশ, অনুমতির ব্যাপারে খুব হেনস্তা করেছিল। তখন আর একটি সংস্থার জন্ম হয়, 'নাট্য সম্মেলন'। সুশীল সিংহ তার সম্পাদক ছিলেন এবং তার সাথে আমি ও সবিতাব্রত দত্ত ছিলাম। 'রবীন্দ্র সদন'-এর, আগে নাম ছিল 'রবীন্দ্র স্মরণী'। তাকে কেন্দ্র করে আমাদের আন্দোলন শুরু করে ছিলাম। তখন ১৯৬৫। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন—এর সাথে অনেক আলোচনা হয়—সকালে জমায়েত হয়ে আমরা রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান করি তাতে সত্যজিৎ রায়, অমলাশঙ্কর এমনকি দেবকী বসুও সমর্থন করেছিলেন। মন্মথ রায়ও এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র স্মরণী, উৎপল, জোছনের গ্রেপ্তার, 'কল্লোলে'র বিজ্ঞাপন বন্ধ—এই পটভূমিতে ১৯৬৭ সালে খাদ্য আন্দোলনে কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত হোলো অনেকে। এ অবস্থাতে নাটক ও চলচ্চিত্র শিল্পীরা একত্রিত হলেন। গ্রুপ থিয়েটার, পেশাদার থিয়েটার, সিনেমা শিল্পীরা ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত এক বিরাট মৌন মিছিলে সামিল হ'ল। আনন্দবাজার পত্রিকা, যারা এতদিন সর্বতোভাবে আমাদের বিরোধিতা করে এসেছে এই প্রথম স্বীকৃতি জানাল, একই সাথে অন্যান্য পত্রিকাগুলোও প্রথম পাতায় হেড-লাইনে খবর ছাপাল। তখন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপ কুমার, রুমা গুহ ঠাকুরতা, অজিত লাহিড়ী, সুব্রত সেন প্রমুখেরা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অমৃতবাজার, যুগান্তর, বসুমতী আবার 'কল্লোল' এর বিজ্ঞাপন ছাপতে শুরু করে। এরপর মনুমেন্টের তলায় 'কল্লোল' এর বিজয় উৎসব হয়। সেখানে সদ্যমুক্ত রাজবন্দীরা মূলতঃ কমিউনিষ্ট পার্টি পলিটব্যুরোর সব নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে 'কল্লোল' নাটকের বিরাট জাহাজ বানিয়ে তার কিছু কিছু অংশ অভিনয় হয়। সত্যি বলতে কি, সেদিনের 'কল্লোল বিজয় উৎসব' পুরোপুরি এক রাজনৈতিক চেহারা নেয়। এর সাথে সেদিনের বিজয় মিছিল আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের সামনে দিয়ে এগিয়ে যায়।।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে একটা ঘটনা ঘটেছে, তা হ'লো মূল নাট্য প্রবাহ নিউ এম্পায়ার থেকে মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা, মূলতঃ কলকাতাকেন্দ্রিক। তাই কলকাতা ও তার আশে পাশের ব্যাপারেই বলছি। অবশ্য তখন গণনাট্য সংঘ তাদের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বহু কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তাঙ্গনের পর কলকাতায় অনেকগুলি মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। প্রধানতঃ অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ তৈরী হওয়ার পর উদয়শঙ্কর প্রথম ওখানে 'শঙ্করস্কোপ' অভিনয় করেন একটানা। তার ঠিক পরে শম্ভু মিত্র নিয়মিত অভিনয়ের জন্য মঞ্চটি নেন এবং প্রত্যেক রবিবার তাঁরা বাদল সরকারের "পাগলা ঘোড়া" নাটক অভিনয় দিয়ে শুরু করেন। সেদিন আমি, খালেদ চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, লেডী রাণু মুখার্জীর সাথে অ্যাকাডেমী মঞ্চ পরীক্ষা করতে গেলাম, অনেক দোষ ত্রুটি বের হ'ল এবং আজও তা আছে। যাই হোক্, তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী সেদিন 'গণ্ডার', 'সুতরাং' 'কিংবদন্তী' ও আরো বিভিন্ন নাটক সেখানে অভিনয় করে গেছেন। তারপর নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, নান্দীমুখ এরাও অভিনয় করে যাচ্ছেন। এক কথায় বলা চলে, পুরো ব্যাপারটা আজ অ্যাকাডেমীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। নিউ এম্পায়ার থেকে মুক্তাঙ্গন থেকে

অ্যাকাডেমী তার পরে কলামন্দির, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, অহীন্দ্র মঞ্চ, শিশির মঞ্চ এর পরে আরও মঞ্চ হবে সেসব যায়গায় নিয়মিত নাটক হয়ে চলবে।

সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল' ছাড়াও উৎপল দত্তের নাট্য প্রয়োগের স্বাক্ষর অনেক প্রযোজনাই ছিল তারমধ্যে আমার মতে ওর শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 'মানুষের অধিকারে'। তারপরে 'তীর', 'লেনিনের ডাক' করেছে। পি. এল টিতে এসে 'টিনের তলোয়ার', 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' যাত্রা ও সিনেমাতেও অনেক কাজ করেছে। এই যে পঞ্চাশ ও ষাট দশকে মোট কুড়ি বছরে উৎপলের মঞ্চভাবনা ও প্রয়োগ যা সে কিনা একান্ত নিষ্ঠা ও তেজের সাথে করে গেছে, সর্ব্বোপরি সবকিছু ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে আধুনিক প্রযোজকের কাজ, ভাল-মন্দ মিলিয়ে তা অভিনব। শম্ভু বাবুর অভিনয়ের ভাবধারা, তাঁর Passion, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর চরিত্রচিত্রণ ভাবনা-চিন্তা সবকিছু মিলিয়ে তিনি বহুরূপীর একটা স্টান্ডার্ড তৈরী করে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি বহুরূপী ছাড়লেন। পরে বিচ্ছিন্নভাবে 'কলকাতা নাট্যকেন্দ্র' (C. R. T.) তে 'গ্যালিলেওর জীবন' করলেন। কখনও চাঁদ বণিকের পালা' পাঠ করেন। এখন পঞ্চম বৈদিক' এর Producer, সেখানে শাঁওলী, 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটক করছে। পরবর্তী যুগে সম্ভাবনাময় যাঁরা আছেন তার মধ্যে রমাপ্রসাদ বণিক খুব ভাল কাজ করছেন। আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়ে তৃপ্তি মিত্র 'রক্তকরবী' বা অন্যান্য রবীন্দ্রনাট্য অন্য পর্যায়ে করছেন। নীলকণ্ঠ দ্বিজেন এরা থিয়েটার কমিউন ও সংস্তব সংস্থায় কাজ করে চলেছেন। এরকম একাধিক দল গড়ে উঠেছে ও কাজ করছে। বাইরে থেকে বালুর ঘাটের 'ত্রিতীর্থ' বহরমপুরের কিছু নাট্য গোষ্ঠী, সোনারপুর 'কৃষ্টি সংসদ' সব ভাল কাজ করে চলেছে। শম্ভু বাবু, উৎপল এরা তাঁদের নিজেদের বয়স, ব্যক্তিগত অসুবিধে, অন্য ব্যস্ততা সব কিছু মিলিয়ে তাঁদের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা দিয়েছেন—তাঁদের সাথে সাথে আমি কিংবা আমার মতো অন্যরাও অনেক কিছু করেছি। আজকে যে অবস্থাটা খানিকটা ম্রিয়মান, তার সাথে অনেক দল গড়ে উঠেছে বটে, অনেক লোক অনেক কাজ করছে পশ্চিমবাংলায়—তারা খুব সক্রিয়—তারা জানতে চায়—শিখতে চায়—করতে চায়, কিন্তু সেরকম তারুণ্যের প্রাণচঞ্চলদের নিয়ে আজ যেন আর হচ্ছেনা। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে আমাদের সে সময়টায় তা ছিল। এখন কুমাব যায় বহুরূপীতে নাট্য প্রযোজক হিসেবে কাজ করছে ভাল নাটকও করে। তাছাড়া 'চেনামুখে'র নাটকও সত্যি খুব ভাল—তাদের 'রাণী কাহিনী' 'আগশুদ্ধি' ইত্যাদি। উষা গাঙ্গুলী নাটকে ভাল কাজ করছে। আগে তৃপ্তি মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় সেকাজ করেছে, এখন নিজেই আরম্ভ করেছে। এই কাজগুলো চারদিকে যে নৈরাশ্য—তার মধ্যে আশার আলো জাগায়। কিন্তু এক কথায় আমার একটা কথা মনে হয় তা হ'ল, সরকার—কি দিল্লী, কি পশ্চিমবাংলার তাদের কিছু advisory কমিটি করেছে বেশ কিছু Hall ও হয়েছে ও হচ্ছে—সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে সমস্ত সুযোগ সুবিধার উপাদান হয়ত আছে কিন্তু সেটাই যে সব নয় তাই মনে হয়—এটি আমার অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত Point of view থেকে দেখে মনে হয়েছে তাই বললাম। উৎপল তার প্রখর ও স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে একটা নাটক করেছিল 'তীর'—যেখানে আমি খুব একমত হইনি। নকশালবাড়ীর রাজনীতির একটা বক্তব্যকে খুব সজোরে তুলে

ধরেছিল এবং সে একটা অসাধারণ প্রযোজনা হয়েছিল এবং তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যে সব ক্রিয়াকর্মকাণ্ড সাধারণতঃ বাংলা থিয়েটারে—ভারতীয় থিয়েটারে কেন এমন কি পৃথিবীর থিয়েটারে খুব কম ঘটেছিল বলে আমার ধারণা অর্থাৎ আমি যতটুকু জানি। যদিও সে নাটক খুব বেশী দিন চলেনি। তার পরবর্তীকালে উৎপলের দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হওয়া—তারপর L T G ও তার অর্থনৈতিক অবস্থা, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে যে যায়গায় চলে গিয়েছিল সেখানে কিন্তু ভাববার বিষয় হয়েছিল যে, রাজনীতির সঙ্গে কতটুকু আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম বা পড়ব? রাজনৈতিক দলের দিক থেকে রাজনৈতিক যে নেতৃত্ব নাটক, সংগীতশিল্পী ও অন্যান্য শিল্পের সাথে যারা আছেন সেই লোকেদের সাথে—সাংগঠনিক দিক থেকে যে সম্পর্ক তা কতটুকু দরকার—তাদেরকে কতটুকু কি কাজে লাগান দরকার সে কংগ্রেসই হোক আর কমিউনিস্ট আর সোসালিষ্টই হোক, সেই ভাবনা চিন্তা গুলোই নেই ঠিক মতো। আর সেটা কালের দিনের প্রয়োজনে একরকমভাবে হবে—বলেই কিছু লোক এতে খুব sceptic হয়ে যান—অনেক লোক খুব ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো করে চলাফেরা করেন। তাতে ব্যক্তিগত নাম ধাম খ্যাতি প্রতিপত্তি টাকা পয়সা স্বীকৃতি, সেটা হয় কিন্তু যে ব্যাপারগুলো সে সময় যে রকম অবস্থায় ছিল ঠিক আজকে সে অবস্থায় সেটা হচ্ছে না। এখন অনেক বুদ্ধিমান নিষ্ঠাবান ছেলেরা আছে কিন্তু যারা নাটক অভিনয় করে তাদের total activity দেখে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের সময় যখন LTG, বহুরূপী বা নাট্যচক্র বা উত্তর সারথীতে নাট্যচর্চা হয়েছে বা অন্যান্য সব কিছু হয়েছে তখন যেভাবে করেছি—এখন নানা রকম প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে বলে হয়ত ততখানি মন দিতে পারছে না—যতখানি নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত তা পারছে না—নাটকের অভাবও আছে—সবকিছু মিলিয়ে—দৃশ্যপট এটাই বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গত, তখন বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে একটা ছিল রবীন্দ্রসদনকে কেন্দ্র করে জাতীয় নাট্যশালা গড়ার পরিকল্পনা তারপর বামফ্রন্ট সবকার বেশ কয়েকবার মিটিং টিটিং করেছেন, জাতীয় নাট্যশালা কি হওয়া উচিত না উচিৎ। তখন সরকার নিজেরা একটা কমিটি করলেন কমল বসু তার চেয়ারম্যান ছিলেন—সেটা ভেঙ্গে গেল। জাতীয় নাট্যশালা নিয়ে এ সরকার ভাবছেন ও ভেবেই যাচ্ছেন—তবে কিছু হচ্ছে না। তবে কয়েকটা মঞ্চ তৈরী করেছেন যেমন অহীন্দ্রমঞ্চ, শিশির মঞ্চ, ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট সংস্কার করেছেন। এখন বাগবাজারে গিরিশ মঞ্চ শেষ হবে আর Gariahat C. I. T. Complex-এ মধুসূদন মঞ্চ ওটা শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। সে গুলোকে National Theatre বলা যাবে না—কিন্তু National Theatre বললে কি বোঝায়, তা কি রকম হবে—সে নিয়ে অনেক রকম সমস্যা আসবে—তা শুধু তৈরী করলেই তো হ'লো না। National Theatre প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে, তার লেখা 'প্রসঙ্গ-নাট্য' কিংবা 'অভিনয় নাটক মঞ্চ'তে। শম্ভু বাবুর সাথে আমার অনেক ব্যাপারে মতে মেলে না বা একসাথে অনেকদিন কাজ করিনা কিন্তু ঐ লেখাটার অনেক কিছু ভাববার এবং ভেবে চিন্তে চলার জন্য সাহায্য করে।

আর নাটকের দলগুলি একসাথে হবার জন্য অনেক আয়োজন হয় যেমন সরকারী

কমিটি একটা আছে—তেমনি গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান একটা আছে—ঐ নাম কা ওয়াস্তে। সকলে কিছু কিছু সময় মিলিত হয়—সবাই আমরা একসাথে কাজ করবো—কিন্তু সেগুলো যে খুব কিছু করতে পেরেছে বা পারছে তা আমার মনে হয়না। তারপর পশ্চিমবঙ্গে একটা অ্যাকাডেমী হয়েছে—কেন্দ্রে একটা সংগীত নাটক অ্যাকাডেমী হয়েছে—তারা নাটকের লোকদের সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করে—কখনও পুরস্কার দেয়—কখনও কিছু টাকা পয়সা অনুদান দেয়—এগুলো করে। বামফ্রন্ট সরকার এখানে তারাও করে—তাতে নাটকের লোকেরা কতটা কার্যকরী উপকৃত হচ্ছেন—টাকা পয়সা পেয়ে, পুরস্কার-অনুদান পেয়ে—জানি না। উৎসাহিত হচ্ছেন নিশ্চয়ই—যেমন নাটকের স্বীকৃতিটা নিশ্চয়ই একটা উৎসাহের সঞ্চার করবে কিংবা 'মহাভোজ' যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে প্রথম পুরস্কার পেলো—এটা উষা গাঙ্গুলীর একটা ভাল প্রযোজনার স্বীকৃতি—এগুলোর মূল্য আছে। আগে কোনরকম পুরস্কার তেমন কিছু ছিলনা—দর্শকের বা জনসাধারণের মতামতই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছিল কিন্তু এগুলো আজ হচ্ছে—হওয়া ভাল। কিন্তু সমস্যাগুলো সমাধান যে সবসময় সম্ভব তা নয়। কিন্তু এগুলো আছে—তাছাড়া থিয়েটার hall যেগুলো সরকার তৈরী করেছে কিংবা যেগুলোর সাথে design এর পরিকল্পনার পর্যায়ে আমি যুক্ত ছিলাম সেগুলোর কোনটাতেই ভাল management হচ্ছে না—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট এর অবস্থা খুব খারাপ—অহীন্দ্র মঞ্চ, শিশির মঞ্চ সরকারী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আছে তৎসত্ত্বেও তাতে অনেক রকম অব্যবস্থা—রবীন্দ্রসদন নিয়েও শুরু থেকে কত চিঠি যে লিখেছি, আমার file ভর্তি হয়ে গেছে—শুরু থেকে অনেক আশ্বাস আছে কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না—এসব সমস্যা আছে। আর, কলকাতার ছয়টি দল মিলে 'কলকাতা নাট্যকেন্দ্র' গড়ে তুলেছিল—তাদের ভাল ভাবনা চিন্তা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো আর কিছুই করা গেলো না। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার ছিলেন 'গ্যালিলেওর জীবন' করলেন— তা যথেষ্ট জন-সমাদৃত হয়েছিল—ফ্রিৎস বেনেভিতস্ পরিচালনায় ছিলেন—টিকিট বিক্রি ভাল হয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একসাথে থাকতে পারলেন না—জোছনের বাড়ীতে পোষাকের বাক্স পড়ে আছে—দিল্লীতে টাকা ফেরত গেছে। আর বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি হয়েছিল। শম্ভু বাবু বিভিন্ন স্থান থেকে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন—সরকার জমি দিলেন না—টাকা ফেরত দেওয়া হোলো—বেশ কিছু টাকা Cancer hospital এ দান করা হোলো—বিনে পয়সায় নাট্যশিল্পী কর্ম্মীদের Cancer এর চিকিৎসা করার ভাবনায়—এখন সরকার জমি দিতে পারছেন—কিন্তু টাকা নেই। সরকারের একটা Theatre advisory কমিটি আছে, তাতে ভাল ভাল কথা বলি ভাবি কিন্তু কিছু হয় না—আবার আফশোষ করি - আবার বসি ভাবি - এবার ঠিকমতো হবে হয়ত - হয়না, হয়ত কিছু কিছু তার মধ্যে হয়।

অন্ধকারে আলোয়

এখন অনেকরকমভাবে থিয়েটার হচ্ছে 'ওয়ান ওয়াল', 'থার্ড থিয়েটার', 'মুক্ত মঞ্চ' কত কি। কিন্তু প্রথমত এবং প্রধানত থিয়েটার বললে আমরা 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'ই বুঝি। এই প্রসেনিয়াম থিয়েটারও অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলো এবং মঞ্চ-সজ্জারও অনেক বিবর্তন হয়েছে। থিয়েটারের ইতিহাসের মত তারও একটা ইতিহাস আছে—যদিও সেই ইতিহাসের কোন বিশদ বিবরণ জানা যায় না।

গিরিশ ঘোষের পর শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরীদের সময় পেরিয়ে আমরা যখন নানাভাবে কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করলাম, তখন যা কিছু ভাল-মন্দ সবই সাধারণ মঞ্চের আলোক-সজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, ঘূর্ণায়মান মঞ্চের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এই শতকের আদিপর্বে গ্যাসলাইট থেকে ডায়নামো এবং ইলেকট্রিক লাইট এল। বলতে গেলে তখন থেকেই, থিয়েটার ভাবনা-চিন্তা করে মঞ্চ-সজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, আলোর বিন্যাসকে (আলোক-সম্পাত কথাটি আমার পছন্দ নয়) সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার ভাবনাও সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হল। অর্থাৎ তিরিশের দশকে সতু সেন ও শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ পরিকল্পনায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তনায় এবং সতু সেন যে বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন রকমের স্পটলাইট দিয়ে আলোর তারতম্য ঘটিয়ে মঞ্চের ছবিকে নাটকের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার মধ্যেই আলোর বিন্যাস, মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জা আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী চলার ভাবনাটা রূপ পায়। ঐ সময়ে বিশেষ ভাবে মনে রাখার মত নাটক হল শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে'। একটি মাত্র দৃশ্যে বিভিন্নভাবে আলোকপাতের ফলে সতু সেন তাঁর আধুনিক মনের পরিচয় রেখেছিলেন। সেই ঝড়ের রাতের পর অনেক রাত কেটে গেছে। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্রের মত ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বরা তো বটেই, তারও পরে এসেছেন সেদিনকার গতানুগতিকতায় ক্ষুব্ধ উত্তেজিত নবীন, তরুণ এক নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটক অভিনয় পরিচালনা করেছেন।

কিন্তু বাংলা নাটকের আলোর কথা বলতে গেলে, স্বভাবতই মনে আসে মিনার্ভায় 'আত্মদর্শন' স্টারে 'কমলেকামিনী', 'কর্ণার্জ্জুন' রঙমহলে ও নাট্যভারতীতে 'পি ডব্লু ডি' 'বিশ বছর আগে', 'মাটির ঘর' এই রকম কতশত নাটকের আলোক-বিন্যাসের অভিনব সমারোহের কথা। থিয়েটারের আদিযুগে আলোক প্রয়োগের সঙ্গে মঞ্চ-মায়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল, যা সেই যুগের ভ্রাম্যমান পার্শী থিয়েটারের শিল্প-নির্দেশক দিনসা ইরানী, নানুবাবু, পটলবাবুর মত স্মরণীয় কৃতী শিল্পীদের হাতে সম্ভব ছিল। তাঁরা কোনটা কেমনভাবে সেকালে করেছিলেন, তার কিছুই আমরা জানি না। কোনদিন জানতেও পারব না। কখনও

কখনও পুরনো থিয়েটারের 'সীন' ঘাঁটতে ঘাঁটতে কিছু কিছু জিনিসপত্রের দেখা পাই কিন্তু তা কিভাবে ব্যবহার করা হত তা জানা যায় না। মিনার্ভা থিয়েটারে 'অঙ্গার' নাটকে জলের দৃশ্য তৈরির সময় অস্থিরভাবে সমস্ত মঞ্চ তোলপাড় করে বেড়াবার সময় নীচের তলায় বড় বড় কাঠের রোলারে জরির মত কিছু জিনিস জড়ানো দেখেছি। শুনেছি ওগুলো 'ট্রিক্ সীনে' লাগাত। কিন্তু কিভাবে লাগাত, তা কেউ বলতে পারিনি। এমনকি, কোন্ নাটক, কোন্ দৃশ্য তাও জানতে পারিনি। অতি প্রাচীন থিয়েটারের ইলেকট্রিশিয়ানরাও কোনরকম তথ্য দিতে পারেননি। অনুমান করি, এইসব দৃশ্য রচনার পিছনে কত ভাবনা ছিল, কত বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রম ছিল এবং ছিল না কোন আধুনিক আলো ও শব্দের যন্ত্রপাতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। মন জয় করেছেন। আমার বা আমার মত অনেকেরই সেইসব বিচিত্র নাট্যসম্ভারের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই। তার পিছনের কলকব্জা বা কারসাজির কোন ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবরণ নেই। নেই বলে যে দুঃখ সেদিন ছিল তা আজও আছে। এ কলকাতা-কেন্দ্রিক থিয়েটারের জীবনে আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে, আনন্দে, বিষাদে তা প্রায় চার দশক কাটল—সেই 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'সেতু' 'অঙ্গার', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'কল্লোল', 'মল্লিকা', 'নাম জীবন' থেকে আজ এই আশির দশকের মাঝখানে এসেও সেই ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবের কথা কি এখনও মনে পরে না?

চল্লিশের দশকের মাঝখানে একজন নবাগত কৌতুহলীর চোখ দিয়ে যখন আমি কলকাতার থিয়েটারের আশে পাশে, তখন সতু সেন, শচীন সেনগুপ্ত, শিশির ভাদুড়ীরা তাঁদের নাট্যকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু একাধিক কারণেই কি শিল্পের দিকে, কি ভাবনার দিকে, এমনকি ব্যবসার দিকেও থিয়েটারের দৈন্যদশা প্রকট হচ্ছিল। চল্লিশের দশকের শেষে এই সাধারণ থিয়েটারের বাইরের নাট্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় নতুন নাটকের দেখা মিলল। গণনাট্য সংঘের পরিচালনায় নতুন চিন্তাভাবনার সূচনা হল। এই সময় 'নবান্ন' তার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে আনল নতুন প্রাণের জোয়ার। এর পরই, ব্যবসাদারী থিয়েটারের বাইরে খানিকটা অন্য ধরণের চেতনা, নতুন স্বপ্ন আর ভাবনা নিয়ে থিয়েটারের বাইরের থিয়েটারের যাত্রা শুরু। সেই সময়ে ওই থিয়েটারের আলো, মঞ্চ সাধারণ রঙ্গালয়কেও প্রভাবিত করল। সত্যিকথা বলতে গেলে, সেই সময়েও আমরা বহির্বিশ্বের অন্যত্র আলো ও মঞ্চের ব্যবহার বিষয়ে অবহিত ছিলাম না। সজাগও না।

স্বাধীনতার পর, সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ দেখা গেল। সমস্ত নাট্যশিল্পীরা গোটা দেশময় একটা একাত্মতা অনুভব করলেন তার কারণ সেই পঞ্চাশ দশকে একাধিক নাট্যোৎসব হয়েছে। দিল্লিতে চুয়ান্ন সালে সর্বভারতীয় নাট্যোৎসবে 'রক্তকরবী' আধুনিক মঞ্চ প্রযোজনা ও অভিনয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'নবান্ন' যেমন একটা দিকচিহ্ন—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী' এক নতুন করে চাঞ্চল্য আনতে পেরেছিল। প্রচণ্ড এক আত্মবিশ্বাস থিয়েটারে নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করেছিল। সহজভাবে সহজ কথা বলার যে আধুনিক রীতি তাও তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। দেশ-বিদেশের নাট্য চর্চা এমনকি আলোক-বিজ্ঞান বিষয়েও যে কতরকম চিন্তা হয়েছে বা হচ্ছে তাও আমরা তখন থেকে জানতে শুরু করলাম। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে

একটা মেলামেশা আদান-প্রদান শুরু হল, যা থেকে একটা নিশানা পাওয়া গিয়েছিল। তারপরেই বাংলা মঞ্চে আলোক-বিন্যাসের ক্ষেত্রে আর একটা ঘটনা ঘটল। পেশাদারী বা অ-পেশাদারী যে কোন থিয়েটারেই, সমস্ত দিকের সঙ্গে আলোক সম্ভাবনা বিষয়ে আলোক শিল্পীর সঙ্গে আগাম কথা বলা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এই সঙ্গে কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ তাঁদের সেকেলে ব্যবস্থাপনা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক হতে শুরু করল। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই কাজ, অর্থাৎ আলোর ব্যাপারে পথ-প্রদর্শক হল থিয়েটার সেন্টার ও বিশ্বরূপা। তারপর অন্য সকলেই অল্প-বিস্তর করেন। ষাট-সত্তর-আশির দশকে কলকাতায় একাধিক এয়ার-কন্ডিশনড আলো ও শব্দের আধুনিক যন্ত্র সমন্বিত মঞ্চ হয়েছে।

আলো সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ভাবনা শুরু হয়েছে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। আজকে পিছন ফিরে ভাবা যায়, তাও প্রায় পঁচিশ বছর আগে, আমার কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। বলা হয়েছিল, 'আলোর উৎপাত বাংলা থিয়েটারের বুকের ওপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে দিয়েছে আর বাংলা নাটককে প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছে।' কথাগুলি উঠেছিল 'সেতু' আর 'অঙ্গার' নাটকের দুটি দৃশ্যকে কেন্দ্র করে। 'সেতু'তে একটি ট্রেনের দৃশ্য ছিল। সেই দৃশ্যে আমি আমার মত করে আলোর ব্যবহার করেছিলাম।

শব্দ আলো, এবং তৃপ্তি মিত্র ও অসিতবরণের অসাধারণ অভিনয় মিলিয়ে নাটকের মাঝখানে এক মিনিটেরও কম সময়ের জন্য এমন এক ক্লাইম্যাক্সের মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, যার কথা লোকে আজও বলেন। এরপর 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্যে কয়লা খনির খাদে বারো শ ফুট মাটির নীচে অন্ধকার জল-প্লাবনের দৃশ্য। সেই দৃশ্যে রবিশঙ্করের সঙ্গীতের সঙ্গে জলের সাউন্ড এফেক্ট আর আলো-ছায়ার একটা অন্যরকম ব্যবহার প্লাবনের রূপ দিয়েছিল। কতকগুলি ভাঙাচোরা বিস্কুটের আর বার্লির টিনে পেরেক দিয়ে ফুটো করে এই 'অন্যরকম' ব্যবহার করা হয়েছিল। আর তাই বলা হয়েছিল যে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নাটকের বুকের উপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে দিচ্ছে আর অভিনয়কে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তৎকালীন নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। এতদিন পরে সেই ঘটনার কেন্দ্র থেকে সরে এসে মনে হয় উৎপাতটা আলোর বা আঙ্গিকের নয়। উপযুক্ত মননশীলতার। যে কারণে মঞ্চ থেকে সঙ্গীত শিল্পী, যন্ত্রীদের বিদায় করে টেপরেকর্ডারেই সবকিছু করা হয়। এর একটা ভালো দিক আছে। টাকা সাশ্রয়ের দিক। কিন্তু জীবন্ত আওয়াজের অন্য এক সার্থকতার দিক আছে। যন্ত্র বা উপকরণ থাকলে তার ব্যবহার করাই উচিত, কিন্তু তাতে পরিমিতি জ্ঞানটা অবশ্য থাকা দরকার। কতটুকু করব না করব তার ওপরই সার্থকতা নির্ভর করছে। ঠিক নাটকীয় মুহূর্তে যথাযথভাবে কতগুলি বিশেষ আলোক পরিকল্পনা করা উচিত। তাছাড়া বিশেষ পরিচালকের তাঁর নাট্যভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোর প্রয়োগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আজকাল প্রয়োজনমত আলো মোটামুটি পাওয়া যায় কিন্তু সেই আলো নিয়ে অনুশীলন হয় না। বহুরূপীর 'রক্তকরবী' যখন হয়েছিল মনে আছে একটাই রিহার্সাল হয়েছিল। শুধু রক্তকরবী নয়, বহুরূপীর অনেক নাটকই আলোসহ একবার রিহার্সাল হয়েছে। কিন্তু

নিজস্ব মঞ্চ ছিল বলে 'কল্লোল', 'অঙ্গার', 'সেতু', 'নামজীবন'-এ অনেকবার করে রিহার্সালের সুযোগ পাওয়া গেছে।

একজন আলোক-শিল্পীকে তাঁর চোখ কান মন খোলা রেখে চারপাশে যা কিছু ঘটেছে সেটা সম্পর্কে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে এবার বিচার করতে হবে। আর তাহলেই তার কাজ একজন ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ না হয়ে শিল্পীর কাজ হবে এবং তা নাটকটিকে উজ্জ্বল করবে।

এল টি জি এবং বহুরূপী এই দুটি দলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দু'রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। দুটোই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নাটকে আলোর প্রয়োগ নিয়ে শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের ভাবনা ছিল দু'রকমের। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার শুরুর দিকে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে কাজ কবে অনেক জানা এবং ভাবার সুযোগ হয়েছে। ওঁর ভাবনাটা নাটকের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিকতা নিয়ে। অনেক বেশি বিশ্লেষণ মূলক। তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় আনুষঙ্গিক আব সব কিছুকে। উৎপলের কাজের ধারা, বীতি-নীতি অন্যরকম। সে সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করেছে। তাব নাটকে সে মানুষের চরিত্রের ওঠা-বসা-চলা তার বিপুল কর্মকাণ্ডকে অর্কেস্ট্রার মত একসুরে বাঁধতে চেয়েছে। 'অঙ্গার' 'তিতাস একটি নদীর নাম' 'কল্লোল'—এই নাটকগুলি থেকে উৎপলের সঙ্গে কাজ করার শিক্ষা, ভাবনা আমাকে আনন্দিত করেছে। উৎপলের সেই সময়কার নাটকগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, একসঙ্গে বহু মানুষ নিয়ে বিরাট একটা ক্ষেত্রে কি অনায়াসে সে নানা বিচিত্র স্টেজ-কম্পোজিশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এবং উৎপলের সঙ্গে আমার কাজের ধরনটা ছিল খুবই মনে রাখার মত। যখন যা করতে চেয়েছি, বা করেছি সে কখনও দ্বিমত কবেনি। ধৈর্য ধরে শুনেছে—অপেক্ষা করেছে। কখনও কখনও নতুন করে নাটকের দৃশ্যরচনাও করেছে। কিন্তু শম্ভু মিত্রের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তবে আরেক দিক থেকে খুবই মূল্যবান। উনি নিজে চোখে দেখে বুঝে নিতে পারতেন। বিশ্লেষণ করার এবং আলোর ভাষা বোঝাবার ক্ষমতাও ওঁর আছে। তাই তাঁকে সেইমত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে আনন্দ হত। ওঁর মনের মত জায়গায় পৌঁছতে পারলে সেই সার্থকতাতে দু'জনেই খুশি হতাম। যেমন 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের শম্ভু মিত্রের নাট্যরূপ। বহুরূপীর এবং আমার প্রথম দিক্‌কার নাটক। সেই নাটকে অনেকরকম আলোর কসরত ছিল না। তারই একটি দৃশ্যে এলার ঘরে অন্ত-এলার সংলাপের সময়, বিশ্রম্ভালাপের সময় অতীত দিনের পুরনো স্মৃতি আলোচনার সময় গভীর আবেগের মুহূর্ত ক্রমে ঘনিয়ে আসে। নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থের তাগিদে ক্রমে ঘরের মধ্যে বিলীয়মান আলোয় তাদের ছায়া ছায়া করে (সিল্যুয়েট) দেখাতে চেয়েছিলেন পরিচালক। একরকমভাবে তা দেখনোও সম্ভব হল। তারপর কোন একসময়ে সেই পরিবেশ বা আবেশ ছিন্ন হয়। অন্ত সুইচ জ্বালায়। কড়া আলোয় রোমান্টিকতা ভেঙে ঘরটি তার আসবাপত্র সহ দৃশ্যমান হয়। আবার শেষ দৃশ্যে, এলার ঘরের ছাদের পিছনে নীচু পাঁচিল—দূরে কয়েকটি আলো জ্বলছিল কিন্তু পরে মাত্র দুটি জ্বলতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে আর কিছু নেই—একটা ক্যাকটাস ছাড়া। তার গায়ে আলোটা প্রায় পিছনে এসে পড়ে। ক্যাকটাস্-আলো-ছায়া-অন্ধকার-এর বাইরে কোন রঙ নেই। নাটকটা পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় হয়েছিল। আজও মনে পড়ে। নাড়া দেয়।

উৎপল দত্তের 'অঙ্গারে'র একটি দৃশ্যও এভাবে মনে পড়ে। উদ্ধার-কার্য (রেসকিউ অপারেশন) চলছে। তখন পেছনে একসারি আলোর মালা—তারা পর পর একটির পর একটি জ্বলছে-নিবছে। মানুষের দমবন্ধ অবস্থাটা এভাবে বোঝান হয়েছে। এখানে এসে নাটক আলোর ভাষায় কথা বলল।

কয়েক বছর আগে মূলত শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্রের উদ্যোগে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির জন্য অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন। বেশ কিছু টাকা উঠেছিল, আরো উঠত কিন্তু হতোদ্যম হয়ে তাঁরা টাকাটা অনেক দাতাদের ফিরিয়ে দিলেন এবং বাকীটা ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে ও অন্যত্র দান করে দিলেন যদি কোন নাট্যশিল্পী ঐ রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে সেখানে বেড পাবেন। আরও একটি শুভ প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশিত। প্রধানত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ছটি অগ্রণী নাট্যদল শম্ভু মিত্রেকে নিয়ে ফ্রিৎস বেনেভিৎসের পরিচালনায় 'গ্যালিলেওর জীবন' সফলভাবে মঞ্চস্থ করলেন, যদিও অগ্রণীদের মধ্যে অজিতেশের ঠাঁই হয়নি। তাঁদের নাটকের প্রভূত জন-সমাদর হওয়া সত্ত্বেও অবিলম্বে তাঁরা ছত্রখান এবং মূল টাকাটা নাকি দিল্লিতে ফেরৎ চলে গেছে। সমস্ত নাট্যসংস্থার স্বার্থ দেখাবার জন্য 'গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান' নামে যে সংস্থার জন্ম হয়েছিল, আজ তাও নাট্যমঞ্চ ও নাট্যকেন্দ্রের মত একই পথের পথিক বলে আশঙ্কা হয়। সরকারের একটা 'থিয়েটার অ্যাডভাইসরি' কমিটি আছে। তাতে ভাল ভাল কথা বলি, ভাবিও—কিন্তু কিছুই প্রায় হয় না। আফসোস হয়—আর আশাও জাগে, এবার ঠিকমতো হবে। অনেকটাই হয় না, হয়ত অবার কিছু কিছু তার মধ্যেও হয়।

আটাত্তর সালের গোড়ায় তৎকালীন সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জাতীয় নাট্যশালার প্রস্তাব নিয়ে মতামত আহ্বান করেন। পরে নাট্যকর্মীদের নিয়ে বেশ কিছু সভা, আলোচনাও হল। ব্যাস্—ঐ পর্যন্তই। তারপর সব কেমন যেন ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। পরে আবার শুনলাম ক্যামাক স্ট্রীটে জাতীয় নাট্যশালা তৈরির উদ্দেশ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু সহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক বিশেষ কমিটি হয়েছে। আজকের মাননীয় মেয়র শ্রীকমল বসু বোধহয় সে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সে পরিকল্পনাও বোধহয় এখন ফাইলচাপা। বুদ্ধদেব প্রস্তাবিত ন্যাশনাল থিয়েটার সত্যি একটি জটিল বিষয়। শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্রের 'প্রসঙ্গ : নাট্য' বইটিতে ন্যাশানাল থিয়েটার বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা পড়েছি।

আসলে আজ আমরা যারা রোজ থিয়েটার করি বা নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উঁচু গলায় বলে বেড়াই, তাদের সত্যিকারের দরকার অল্প আসনের (তিন চারশো'র মধ্যে) মঞ্চের আলো ও আনুষঙ্গিক স্পেস্ সহ সবরকম সুবিধে। ব্যয়বহুল লাক্সারী থিয়েটার গদীআঁটা দামী চেয়ার, এয়ার কণ্ডিশন এসব কিছুর দরকার নেই। হালে তৈরির গড়িয়াহাটের জি ডি বিড়লা সভাঘর প্রেক্ষাগৃহকে হয়ত টেক্কা দেবে সদ্যনির্মিত বাগবাজারের গিরিশ মঞ্চ। যদিও সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের নাটক উপদেষ্টা পর্ষদের মঞ্চ নিমার্ণ বিষয় সুপারিশ ছিল সহজ অনাড়ম্বর কার্যকরী অর্থাৎ ফাংশনাল থিয়েটার তৈরি করার। বড়ো চোখ ঝলসানো প্রাসাদ না হয় একটা হল কিন্তু সমস্ত কলকাতায় উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম বিভিন্ন এলাকার আজ প্রয়োজন ছোট ছোট অনেক মঞ্চ। ভাবতে কষ্ট হয়, সরকারের হাতে বেশ কিছু জমি আছে কিন্তু টাকা নেই। আর নাটকের মানুষরা নিজেদের উদ্যোগে যে টাকা তুলতে

শুরু করেছিলেন, (বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠান-এর পর কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের প্রথম ও শেষ সার্থক প্রযোজনা 'গালিলেওর জীবন' মঞ্চস্থ করে) তাও তেমন কার্যকরী হল না। আজ সিরিয়াসলি যাঁরা নাটক করতে চেষ্টা করেন, সকলেরই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় চাতক পাখির মত অ্যাকাডেমীর সারা বছর নির্দিষ্ট ভাগ্যবান প্রতিষ্ঠিত দলের নিয়মিত তারিখের বাইরের একটি দুটি দিনের জন্য। রবীন্দ্রসদনের ক্যান্সেল-ডেটের জন্য আর শিশির মঞ্চের বিনা রিহার্সালের শর্তে হল নিতে। অহীন্দ্র মঞ্চ নানা অসুবিধার মধ্যে আজও ঠিকমত চালু করা গেল না। নতুনভাবে সংস্কার করা আধুনিক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ তো আলো ইত্যাদি নেবার ব্যাপারে অনেক অন্যায় নিয়ম হয়েছে। যাঁরা মেনে হল নিতে রাজী না হবেন, তাঁরা সোজা পথ দেখতে পারেন। এসবই সরকারি ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম অত্যাচার চলছে। আর আমাদের নাট্যকর্মীদের কি অসহায় ভূমিকা।

এখন আলোক সচেতনতা বাড়ছে। কিন্তু নাট্যকেন্দ্রকে সমসাময়িকভাবে কিছুটা অন্ধকার গ্রাস করেছে বলে মনে হয়। এই অন্ধকারেও ব্যতিক্রম আছে। যেমন রমাপ্রসাদ বণিক, শাঁওলী মিত্র, উষা গাঙ্গুলী, তৃপ্তি মিত্রের আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়, সোনারপুরের কৃষ্টি সংসদ, বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ। এছাড়া আরো অনেক সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে।

আলোর মনস্তত্ত্ব, আলোর প্রাণ

এই যে বিশেষ ধরনের কাজ যা আমার মত লোকেরা করে তার আলোচনায় এটা প্রায়ই বলা হয় যে কত ত্যাগ, সংগ্রাম, পরীক্ষানিরীক্ষার পথ পেরিয়ে আমরা এই জায়গায় এসেছি। কিন্তু সত্যিই ভাল করে যদি ভাবি তাহলে মনে হয় বহুবছর আগে যখন এই কাজ শুরু করেছিলাম এইরকম করে, নাটকের জগতে যখন আকৃষ্ট হয়েছিলাম তখন কিন্তু এত কিছু ভেবে এসবের মধ্যে আমরা আসি নি-অন্তত আমি তো নয়ই। থিয়েটারে সব দেশেই সব লোকে সখের জন্য এসে জোটে। আমার বেলাও অন্যথা হয় নি। কিন্তু শখের থিয়েটার করতে করতে বুঝলাম এর একটা যান্ত্রিক দিকও আছে। সীনসিনারি দরকার, সেগুলোকে টাঙান দরকার। আলোর সাজসরঞ্জাম এবং ইলেকট্রিক কানেকশন করবার জন্য উপযুক্ত মিস্ত্রি বা ইলেকট্রিশিয়ান দরকার। সেই একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় কাজ করবার সময়ে ক্রমশ এসব নিয়ে আরও কে কী করে আর কিবকমভাবে করে সে সম্পর্কে নানাবকম কথাই কানে আসত। দিল্লিতে আমার শৈশব কেটেছে সেখানে পাঁচ-ছ'বছর বয়স থেকেই নাটক দেখেছি।

দিল্লীর প্রবাসী বাঙালীদের দূর্গাপুজোয় অ্যামেচার নাটক চন্দ্রগুপ্ত বরুণা কর্ণার্জুন এই সব।

একটু বড় হয়ে যখন ক্লাস এইট বা নাইনে পড়ি তখন সতু সেনের নাম শুনেছি যিনি কলকাতায় আলো করেন এবং রিভলভিং স্টেজও বানিয়েছেন। তখন আমি রেডিও নিয়ে নাড়াচাড়া করি ইলেকট্রিসিটি নিয়েও মাথায় নানান বুদ্ধি খেলে তাই তো তা নিয়েও কিছু কিছু কারসাজি আরম্ভ করেছি আমাদের স্কুলের সরস্বতী পুজোর থিয়েটারে; ওই ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ই সরস্বতী পুজোর স্কুল নাটক হবে রাজপথ। সমস্যা হল রাজপথ কি করে দেখান হবে। আমি তো অভিনয় করতাম না তা নাটকের কোনও কাজেও ছিলাম না কিন্তু বললাম যে একটা ল্যাম্পপোস্ট করা হোক।

সেই ল্যাম্পপোস্টটা একটা প্রতীক হয়ে আছে আমার জীবনে বলা যায়। স্কুলের পিছন দিকে খেলার মাঠ দিল্লির 'রিজ' বা পাহাড়ী জমির ওপর: সেখান থেকে ভলিবল খেলার পোস্ট একটা উপড়ে আনলাম রাত্রিবেলায় এবং তাতে হোল্ডার, বাল্বটাল্ব লাগিয়ে ল্যাম্পপোস্ট বানান হল যাতে আলো জ্বললে একটা রাজপথের সাজেশন হয়ে যাবে। এই যে সরস্বতী পুজোর নাটকে স্টেজে আলোকসম্পাত না করলেও আলো জ্বালানর একটা প্রতিকী ঘটনা আমার জীবনে ঘটল, যখন আমি সেই আলোর কানেকশনটা নিজের হাতে রাখলাম এবং সেই দায়িত্বের দৌলতে স্টেজের ভেতরেও থাকতে পেলাম অভিনয়ের সন্ধ্যায়; আমার এইখানেই একটা নেপথ্যকর্মীর ভূমিকা প্রথম তৈরি হল।

এগুলো একরকম করে সূত্রপাত। আমার আগ্রহটা ক্রমেই মঞ্চে ছবি আঁকা বা ছবি

তৈরি করার দিকে চলল। আর ইস্কুলের গন্ডি পেরনর মুখে মুখেই আমাদের ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখা এবং মঞ্চে থ্রী ডাইমেনশনাল ছবি সম্পর্কেও আগ্রহটা তৈরি হল। আমাদের আরও নানা ব্যাপারেই উৎসাহ ছিল খেলাধুলা এমনকি রাজনীতি—আমরা কয়েকজন খুব হইহই করে ছাত্রসঙ্ঘ করতাম। দুজন মাস্টারশাই ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন উদ্‌যোগে সমানভাবে আমাদের সঙ্গে লাগতেন। একজন হলেন শ্রী প্রতাপ সেন—ক্লাস এইট থেকে টেনের ড্রয়িং টীচার এখনও দিল্লিতে থাকেন চিত্তরঞ্জন পার্কে। আরেকজন মাস্টারমশাই হলেন শ্রী সুশীল রায়চৌধুরী এখন সল্টলেকে আছেন সাপ্তাহিক 'বিধাননগর' পত্রিকার সম্পাদক।

ইস্কুলে থাকতেই কিছুটা, তারপর সেখান থেকে বেরনর পরেই সবিক্রমে আমাদের নাট্যচর্চা শুরু হয়। অন্য অনেকেই করত, তবে আমাদের ইচ্ছে ছিল আমরা একটু স্বতন্ত্র ধরনের নাটক করব। পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট', 'কচি সংসদ' ইত্যাদি হয়েছে পরে তবে প্রথম নাটক হয়েছিল 'রক্তের ঋণ', আর প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল'। রক্তের ঋণ নাটকটা ছিল ব্লু-বার্ডের ছায়াবলম্বনে লেখা। তখন আমি নিউদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কমিটির চাকরিতে ঢোকার মুখে; এই দুটো নাটকের আলোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হল কিছু এফেক্ট-টেফেক্টও মাথায় এসেছিল।

রক্তের ঋণ আর মৌচাকে ঢিল এ দুটি নাটক হয়েছিল তালকাটোরা রঙ্গমঞ্চে। আজকের দিল্লিতে সেটা ছোট অখ্যাত অবজ্ঞাত কিন্তু আমাদের কাছে ছিল বিরাট ব্যাপার। আমরা পোস্টার ছাপালাম। অভিনয় হয়েছিল যাদবপুর টিবি হাসপাতালের সাহায্যার্থে এবং তাঁরা পোস্টার ছাপার খরচ দিয়েছিলেন। এই স্বীকৃতিটাই আমাদের মনে হল বিরাট একটা প্রাপ্তি এবং এটাই আমাদের অ্যাডাল্ট হুডে পৌঁছে দিল। সেবার আমিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করতে পেরেছিলাম। এরপর রক্তকরবী আর বিদ্যাসাগর। মঞ্চ পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কলাকৌশলের যাবতীয় ব্যবস্থা প্রতাপদা এবং আমার চিন্তাভাবনায় হয়েছিল। আমি লাইটের কাজগুলো জলের কলসী, বড় বড় ফ্লাড লাইট এই সব এনে করেছি।

দুটো আর্কল্যাম্প যোগাড় করেছিলাম সে দুটো বহুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। আর ছিল ফ্ল্যাড লাইট বড় বড় প্রতাপদারা বলতেন 'হান্ডা', কলসীর কথা আগে বলেছি। সে সব কলসীর মধ্যে জল ভরে ইলেকট্রিক কানেকশন-এর ধাতুর পাত ডুবিয়ে সেটাকে ওঠা নামা করিয়ে আলো বাড়ান কমান হত যা সর্বদেশে 'ওয়াটার ডিমার' নামে পরিচিত। এ ব্যাপারটা প্রথম তালকাটোরা রঙ্গমঞ্চে চেষ্টা করলাম।

তালকাটোরার স্টেজের পিছন দিকে একটা গর্ত বা ট্র্যাপ মত ছিল সেই ফাঁক দিয়ে বাইরের থেকে আমরা লুকিয়ে দেখতাম পর্দায় সিনেমা দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছি একটা মুদির দোকান ছিল মা জিনিসপত্র আনতে দিতেন, আমরাও চানাচুর-টানাচুর কিনে খেতাম—ঐ দোকানে যাবার পথে উঁকি মারতাম। গর্তটা দিয়ে একজন দুজন মানুষ গলে যেতে পারত। একবার তালকাটোরায় 'পি ডব্লু ডি' নাটক করছি। রাত্তিরে লুকিয়ে চুরিয়ে এক সরকারী বাংলোর কাঠের গেট ভেঙে এনেছিলাম, সেইটা ওই ট্র্যাপের ওপরকার কাঠের পাটাতন কটা সরিয়ে বসিয়ে দিলাম। প্রতাপদা করছিলেন মিঃ সেন—না কি যেন নাম—সেই চরিত্রটা। তার একটা কথা ছিল: "একটা খুনে যে ফাঁসি, দুটো খুনেও সেই ফাঁসি। হাঃ হাঃ হাঃ!" প্রতাপদাকে বললাম এই সময় আপনি দুপা ফাঁক করে ঐ গেটটার

ওপর এসে দাঁড়াবেন। এদিকে সেটটার নিচে গর্তের মধ্যে একটা পাওয়ারফুল ৫০০ না ১০০০ ওয়াটের হান্ডা বসিয়ে রেখেছিলাম লাল সেলোফেন-টেলোফেন দিয়ে-সংলাপটার সময়ে অন্য সব আলো নিবে ওটা জ্বলে উঠল আর দেখা গেল বিরাট ছায়া ফেলে রাক্ষুসে মুখ নিয়ে মিঃ সেন দাঁড়িয়ে — আর অট্টহাসি। আরেকটা সিচুয়েশনের জন্য ঐ পি ডব্লু ডি নাটকেই একটা লাইট তৈরি করেছিলাম: বোম্বা সাইজের একটা ফ্লাডের মুখে ছোট গোল ছ্যাঁদা করা প্লাইউড আটকান, তাতে একটা মোটরের হর্ন স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছিলাম যাতে আলোটা কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা শার্প শ্যাডো সৃষ্টি করে। কি করে ছায়াটায়া করতে হয় তখন বিশেষ জানতাম না, ঐ বড় বড় আলোর সামনে এটা ওটা ধরে কেটে ছিঁড়ে দেখতে দেখতে ব্যাপারটা বেরিয়ে এসেছিল। প্রতাপদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি লাগিয়েছিলেন, টুপি-টুপি পরা ছিল — ওঁকে বললাম ঐ ফানেল লাগান আলোটার সামনে দিয়ে মাথাটাথা নেড়ে ঢুকতে—magnified, খুব বড় ছায়া দেয়ালে পড়ল আর চশমা, দাড়ি, ফেল্ট-টুপি সেই সবটাই দেখা যাচ্ছে। ফানেলটার দরুন আলো ছেত্‌রে না দিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে দেয়ালে পড়ত সে সঙ্গে ছায়াটাও। একটা মুহূর্ত সৃষ্টি হল, তারপরে লোকটি ঢুকল। যাই হোক, সেদিনের সেই দৃশ্যে লোকে খুব খুশি — আমারও কেমন যেন একটা কনফিডেন্স হল। আরে, আলো দিয়ে তো অনেক কান্ড করা যায়।

বনফুলের 'বিদ্যাসাগর' নাটকেও বিদ্যাসাগবের জলে ভিজে এসে দাঁড়ানর এবং জ্যোৎস্নার মধ্যে দেশলাই জ্বেলে দিনমণি দেবী তাঁর মুখ দেখছেন - আলোর এই সব কাজ ছিল। সুশীলদা করেছিলেন বিদ্যাসাগর আর প্রতাপদা বাচস্পতি। ডিরেক্টরও প্রতাপদাই ছিলেন। এসবের পর আমার উৎসাহ একটু করে বাড়তে লাগল। তখন আস্তে আস্তে বিভিন্ন ক্লাবে আমার ডাক পড়তে লাগল — ওই লাইটওয়ালা বাঙালীবাবুকে বুলাও! আমাদের বাড়ীর বাইরে ঘরে খাটের তলায় জিনিসপত্র থাকত টাঙায় করে নিয়ে যেতাম আমি আর আমার দুয়েকজন সাকরেদ - পবে জুটে গিয়েছিল। সেই সময় একবার বেঙ্গলী ক্লাব 'প্রতাপাদিত্য' নাটক করল। নাটকের গোড়ায় বোধহয় একটা কিছু বর্ণনা ছিল: "আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হবে না" এই জাতীয় সংলাপ — কালীবাড়িতে একটা সাদা পর্দা টাঙিয়ে, বাঁশের বল্লীর স্টেজ করেছিল তাতে গাছপালা জুড়ে অনেকরকম কায়দা করে একটা দৃশ্য তৈরি করলাম; মূল নাটক শুরু হবার আগে ওয়াটার-ডিমারের সাহায্যে আবছা নীল আলোতে যেন দূরদূরান্তরের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। দুটো কি তিনটে ফ্লাড লাইটের সাহায্যে, আর বল্লীর সঙ্গে পাতাটাতা বেঁধে, সেলোফেন কাগজ, কার্ডবোর্ডের ফালি ইত্যাদি দিয়ে ছবিটা তৈরী হয়েছিল। প্রস্তাবনার সঙ্গে ছবিটা খুলল, এবং মিউজিকও ছিল বোধহয় - কালীবাড়ির বিশাল প্যান্ডেলে মাটিতে বসা দর্শকেরা হাততালিতে ফেটে পড়ল। নাটকের কুশীলবেরাও অভিভূত হয়ে পড়লেন। বেঙ্গলী ক্লাব ছিল দিল্লির খুব সম্মানিত বাঙ্গালী ক্লাব। সবচেয়ে পুরানো এবং অভিজাত, বয়োজ্যেষ্ঠরা অনেকে যুক্ত ছিলেন, আমার বাবাও গোড়ার দিকে ছিলেন। ক্লাবটা বোধহয় শুরুই হয়েছিল ১৯২৫ নাগাদ—অনেকগুলো ক্লাব মিলে ওটা তৈরি হয়েছিল। সেই প্রতাপাদিত্য প্রযোজনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা অনেকে পরে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় আমি তখন আমার নিজের মত করে 'রামের সুমতির' লাইটিং স্কীম করি এবং ততদিনে

আমার ধারণা হয়ে গেছে যে head level -এর ওপর থেকে ফ্লাড লাইট দিতে হয়। স্পট-লাইট কী জানিই না, সামনে কাঠের ফ্রেম তৈরি করে করে তাতে ফ্লাড বাঁধতাম এবং বলতাম এটাই হচ্ছে একেবারে মর্ডান লাইটিং, ফুটলাইট-টুটলাইট উঠে গেছে,' ওসব করবেন না।

সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে ওই সামনের ফ্রেমে ফ্লাড বেঁধে আর ব্যালকনিতে কনট্রোল বসিয়ে 'বামের সুমতি' নাটক করলাম। এই নাটককে আরেকজন অভিজ্ঞ লোক এসে advisor বা direction -এর কাজ করলেন, তিনি হলেন বিখ্যাত অভিনেতা ইন্দু মুখার্জি। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এর আগে প্রতাপাদিত্য হবার পরে সকালবেলা মণি ভট্টাচার্য বলে এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। খুব ভাল হিন্দি এবং উর্দু বলতে পারতেন, আগে বেনারসে ছিলেন তার পরে দিল্লিতে D G P T -র একজন বড় অফিসার। পরে আমাকে উনি বহু জায়গায় বহু অভিনয়ে আলো করতে নিয়ে গেছেন। তাঁর ছেলে পবে ভোজপুরী বই-টইতে খুব নামও করেছে। তা উনি প্রতাপাদিত্য দেখে বাড়িতে এসে আমার প্রবল প্রশংসা করে গেলেন। আমি ভাবলাম কি করলুম রে বাবা, একেবারে নাম-টাম হয়ে গেল।

প্রতাপাদিত্যের পরে বন্ধুবান্ধবরা মিলে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক করলাম। ততদিনে নাটকের শখটা আরও বেড়েছে। আমি ক্যান্টনমেন্টে C. P. W. D. চাকরি করি তখন — ইলেকট্রিকাল ওভারসীয়ার বা ইলেকট্রিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, দিল্লির পালাম এয়ারফিল্ডে। কিছু বিদ্যুৎ-মিস্ত্রিও আমার অধীনে কাজ করে। সে অনেক জিনিসপত্রও আমি পেয়েছিলাম, দুর্গাপুজো বা কালীপুজোতে আমায় লোকজনও আমায় অনেক সাহায্য করত।

সিরাজদ্দৌলার আগে বিদ্যাসাগরের মত নাটক করলাম, তারপর একবার করলাম রক্তকরবী—বরাবরই আমরা বৈচিত্র্য চেয়েছি এবং সেই ভাবনা থেকেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাটকও ধরা হত—কচি সংসদ, চিকিৎসা সঙ্কট এসবও করেছি—প্রতাপদা সবেতেই ছিলেন। চিকিৎসা সঙ্কটে স্টেথস্কোপ ইত্যাদির ছায়া ফেলাতম। প্রতাপদার নানারকম ভাবনাচিন্তা সবসবময়েই কাজে লেগেছে তাঁর ভাবনায় সর্বদাই আমি ভাবিত হয়েছি। সিরাজদ্দৌলাটা বহুদিন ধরেই করবার ইচ্ছা ছিল, ছোটবেলা থেকেই রেকর্ডে এ পালা শুনেছি। Costume drama হিসাবেও ওটার একটা আকর্ষণ আছে। উদ্যোগটা আমরা তিনজনে নিলাম — আমি, প্রিয়রঞ্জন এবং কমলাকান্ত, পরে কল্লোলের সময়ে অ্যাডভাইসার হয়েছিলেন। পুরনো দিল্লির কাজী হাউস এলাকার আলাউদ্দিন নামে এক টাঙ্গাওয়ালা ছিল, ভীষণ জল্লাদের মতো চেহারা তার কাছে পোশাকপত্র সেটসেটিং সব ভাড়া পাওয়া গেল আর আমি যথারীতি আলোর দায়িত্ব নিলাম। সে সময়ে আমার একটা সাইকেল কেনার কথা ছিল — পুরো টাকায় না কিনে একটা wartime র‍্যালে কিনলাম আর বাকি টাকার সঙ্গে আরও বেশ কিছু ধারদেনা করে নামান হল সিরাজদ্দৌলা প্রোডাকসন। নাটক হয়ে গেল ভালয় মন্দয়; কিন্তু তারপর থেকেই ১৫দিন একমাস অন্তর অন্তর টাঙ্গা নিয়ে আলাউদ্দিন এসে হামলা করত বাড়িতে আর আমি তাড়াতাড়ি তাকে দূরে নিয়ে যেতাম। বাবা-মার সন্দেহময় জিজ্ঞাসা—"ও চায় কী এইখানে?" লুঙ্গিপরা যমদূত সদৃশ চেহারা। নাটক হয়ে গেছে কবে তবু আলাউদ্দিন পাওনাদার নিয়মিত দোর ধরতে আসে—মোটা

টাকা পাবে তো!

এই সিরাজদ্দৌলা করার সময়েই সাংগঠনিক মোড়লীপনা, লাইট করা টীমওয়ার্ক, টেকনিক্যাল দায়দায়িত্ব — সবটা মিলিয়ে-মিশিয়ে আমার ভাবনাচিন্তাগুলো আরও একটু নির্দিষ্ট রূপ নিল। খুব সফল হচ্ছি তা মোটেই নয়, কিন্তু শিল্পভাবনাটা একরকম করে আসছে। এবারে, দিল্লির নাট্যজগতে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের মধ্যে একজন আমায় নিয়ে গেলেন দিল্লিতে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে। এটা একটা পরবর্তী অধ্যায়ে এসে যাচ্ছি যাতে বড় একটা মোড় ঘুরতে পেরেছিলাম। তখন সর্বভারতীয় স্তরে একটা স্কোয়াড বেরিয়েছিল বাংলার দুর্ভিক্ষের পর বিনয় রায়ের নেতৃত্বে। তাঁরা নাচগানের স্কোয়াড নিয়ে টাকা তুলতে বেরিয়েছিলেন। সেই স্কোয়াড দিল্লি এসে দারুণ কয়েকটা শো করল। সে গুলো আমরা দেখেছিলাম এবং তব প্রায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দিল্লীর তরুণ সঙ্ঘের নাট্য সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখার্জি, ইন্দু ঘোষ, সরলা গুপ্তা, ইন্দর বাজদান প্রভৃতি। ইন্দর এখনও কাজ করে, দিল্লিতে গেলে দেখা হয়। ইন্দু ঘোষ পরবর্তীকালে ন্যাশানাল স্কুল অব ড্রামার রূপসজ্জার অধ্যাপক ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। আর ছিলেন নিরঞ্জন সেন — তখন হয়ত IPTA -ব সর্বভারতীয় সেক্রেটারি হয়েছিলেন। এঁদের শ্যাডো-প্লে হল, এবং একটা নাচ ছিল "বাঁধ ভেঙে দাও" গানের সঙ্গে, তার সঙ্গে তালে তালে ফ্লাড লাইটগুলো — আর ত আলো-টালো কিছুই ছিল না — জ্বালাতাম নেবাতাম জ্বালাতাম সেটা লোকের ভাল লেগে গেল। তারপর কায়ূর বন্দীদের ফাঁসির ওপর একটা গান — "ফিরাইয়া দে দেরে মোদের কায়ূর বন্ধুরে"—লাল ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে একটা ছায়াদৃশ্য করেছিলাম, চারটে লোক ফাঁসিতে ঝুলছে।

দিল্লিতে ঐ সময় সাধনা বসু আসেন তাঁর সম্প্রদায়সহ নাচতে। বোধহয় সেটা ১৯৪২-৪৩ সাল। দিল্লির রিগ্যাল থিয়েটার ছিল সবচেয়ে অভিজাত মঞ্চ। খুব ছোটবেলায় ঝাপসা মনে আছে সেখানে উদয়শঙ্করের বিখ্যাত 'লেবার অ্যান্ড মেশিনারী' নাচ দেখেছি। সাধনা বোসের প্রোগ্রামও ওই রিগ্যালেই পড়ল। আমার হঠাৎ কি মাথায় ঢুকল। কোন সাহসে ঢুকলো কেনই বা — আজকে ভাল করে ভেবে পাই না, আমি খোঁজখবর করে জানলাম উনি ইয়র্ক হোটেলে উঠেছেন এবং সেখানে দেখা করে বললাম যে আমি আপনার নাচে লাইটের ব্যবস্থা করব। উনিও কেন জানিনা কিছু না জেনে বুঝেই আমায় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তবে বোধহয় রিগ্যালের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন এবং আমায় বা আমার কাজকে চিনতেন তাঁরা এই যোগাযোগে সাহায্য করেছিলেন। যাই হোক কাজ পেলাম টাকাপয়সার কথাও একটা হল। তখন সাধনা বোসের ম্যানেজার ছিলেন অবণী মিত্র। পরে স্টার থিয়েটারে অবণীবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। আমি সাধনা বোসের আলো করছি জেনে সবাই খুব অবাক হল, খুব ভাল একটা টাকা অ্যাডভান্স পেলাম, যে টাকাটা তখন আমার বাড়িরই কি একটা জরুরী প্রয়োজনে লেগে গিয়েছিল। নাচ হল আলো ধরলাম এবং ওঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

আমি দিল্লি ছেড়েছি ১৯৪৬-এ, ২য় মহাযুদ্ধের মাঝখানেই। এ সময়েই আলো সম্পর্কে তার নিয়ন্ত্রণ এবং তাত্ত্বিক তথ্য প্রয়োগগত ভাবনাচিন্তা একটু একটু করে সমৃদ্ধ হচ্ছিল। দিল্লিতে ২য় বা ৩য় নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ছায়াতে কর্ণ-কুন্তী সংবাদ করলাম।

আরেকবার করেছিলাম 'ক্ষুধিত পাষাণ' তাতেও দিল্লির অনেক লোকজন যুক্ত ছিলেন। আর নৃত্য উৎসবের আগে পরে আরেকটা ব্যাপার হয়েছিল সেটা হচ্ছে দিল্লি ইউনিভার্সিটির সব মহিলারা এবং ছেলেরাও ছিল — একটা নৃত্যনাটিকা তৈরি করেছিলেন 'শিল্পী ও পাষাণী', এক শিল্পী পাথরের মূর্তি তৈরি করছে এবং করতে করতে সেটা প্রাণ পেল তাতে প্রাণের স্পন্দন এলো। কেমন করে কি করেছিলেন মনে নেই তবে সেটা আমার কাছে দারুণ একটা কল্পনা এবং রোমান্টিক কাজ বলে মনে হয়েছিল। শোভনা সেন, প্রতিমা সেন নেচেছিলেন এই নৃত্যনাটিকায়। বহুদিন বাদে একবার শোভনা প্রতিমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ট্রেনে। আলাপ করতে করতে তিনি একসময় আমার জীবিকার কথা শুনে বললেন আমি একজনকে জানি যে খুব ভাল লাইট করত। দিল্লিতে একটা নাচে সে এই লাইট করেছিল......জিজ্ঞাসা করলাম সে প্রযোজনার নাম কি? তিনি বললেন, "নাম বোধহয় শিল্পী ও পাষাণী।" যাই হোক 'শিল্পী ও পাষানীর' পর ছায়া নিয়ে কাজ করার ভাবনাটা মাথায় নাড়াচাড়া করত। আমি তখন দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে চাকরি করি। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিরা মোহন সিং, ধিলোন, শাহনওয়াজ খান সবাই তখন সেখানে বন্দী। সেই অনুপ্রেরণায় লালকেল্লায় কাটআউট করে 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যা' গানের সঙ্গে ছায়া ফেলেছি, ছায়া নাটক করেছি।

৪৫-এর কোনও সময়ে পরশুরামের 'ভূষন্ডীর মাঠে' গল্পটাকে ছায়ানাটক করার কথা মনে হয়। প্রতাপদা স্ক্রিপ্ট লিখলেন। প্রতাপদা আর সিধু ভট্টাচার্য বলে আমার আরেক বন্ধু আর প্রবীর দত্ত শব্দ তৈরি করেছিলেন। ভৌতিক শব্দানুষঙ্গ সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়েছিল একটা টয় পিয়ানো একটা একতারা বা দোতারা এইরকম সব সহজ জিনিস। দুটো আর্কল্যাম্প ভাঙাচোরা কাঁচ ইত্যাদির সাহায্যে আমি বসন্তে প্রজাপতি উড়ছে, হোটেল বা অর্থডক্সের মেনু এইসব দেখিয়েছি। প্রতাপদা পরিচালক ছিলেন। আর প্রোডাকশনটা আমার নামে ছিল। পরে সাউথ ইন্ডিয়া ক্লাবেও হয়েছে। এবং এই একটা আমার প্রথম কাজ যা স্বীকৃতি পেল সংবাদপত্রে - পৃথ্বীশ চক্রবর্তী বলে আমার এক বন্ধু ভ্যানগার্ড কাগজে সবিস্তারে লিখলেন 'ভূষন্ডীর মাঠে' নিয়ে। ভূষন্ডীর মাঠের মত একটা সাবজেক্টকে ছায়ানাটকে রূপান্তরিত করা, তাকে প্রয়োগ করা - এই আইডিয়াটা এবং তার ভৌতিক পরিবেশ, কিন্তু ভয়ের নয়, মজার। এই আলোছায়ার জগতে আকৃষ্ট হয়ে হাতের কাছে যে সব মামুলি উপকরণ পেয়েছিলাম তাই দিয়ে কাজ করতে করতে মনে হয়েছিল এর ভবিষ্যৎ আছে, সম্ভাবনা আছে।

দিল্লিতে ভূষন্ডীর মাঠে করার আগে পরশুরামের অনুমতি নিয়েছিলাম। পরে ১৯৪৭ নাগাদ কলকাতায় আমি নিউ এম্পায়ারে আবার 'ভূষন্ডীর মাঠে' মঞ্চস্থ করি। নিউ এম্পায়ারে করার আগেও ওঁর সঙ্গে কয়েকটি শো'র জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম। নিজে আসতে পারেননি, তবে ওঁর বাড়ির লোকজন সবাই এসেছিলেন এবং তাঁদের বোধহয় ভালই লেগেছিল। তবে কলকাতার মানুষের বোধহয় ভাল লাগেনি। বলতেই হবে সে সময়ে সেই প্রযোজনা সুযোগ করে দিয়েছিলেন শ্রী সুবল দাশগুপ্ত এবং আমার আত্মীয় শ্রী ফনী দাশগুপ্ত। ফনী দাশগুপ্ত অনেকখানি আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তো কলকাতায় ভূতুড়ে কান্ড কারখানা নিয়ে আমার যাত্রা বা অযাত্রা শুরু হল। ইতিমধ্যেই দিল্লির

C.P.W.D-র চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। কিছুদিন বম্বেতে ছিলাম চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্তের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। তার পরেই কলকাতা আসা। এখানে এসেই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হই। গণনাট্যের সঙ্গে যোগাযোগ আগেই ছিল - এখানে এসে প্রথমে কালচার ক্লাব, তারপরে তাদের সঙ্গে যুক্ত সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া বা S.U.C.I-র সদস্য হই। শিবদাস ঘোষ, নীহাব মুখার্জি, সুবোধ ব্যানার্জি এঁদের সঙ্গে তখনি যোগাযোগ হয়। নিউ থিয়েটার্সের সৌরেন সেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাঁর সঙ্গে শৈলেন দে, নির্মল মিত্র, তারা দত্ত আর আমি। সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ শুরু করলাম। তারা ফটোগ্রাফার আর আর্টিস্ট। সৌরেন সেন 'রূপকথা' ছবির জন্য আমাদের নেন। সে আমাদের বড় সুখের অভিজ্ঞতা ছিল না - মাসের পর মাস কাজ করেছি, টাকাপয়সার বিশেষ সুবিধা হয়নি; কিন্তু ওই সময়ে আমার অনেকের সঙ্গে পবিচয় হয় তার মধ্যে একজন হলেন - নিউ থিয়েটার্সে এডিটিং-এর ওখানে একটা ছোকরা ছিল তার সঙ্গে ভাবসাব হয়ে গেল - তার নাম হৃষিকেশ মুখার্জি। আজকের চলচ্চিত্রে পবিচিত নাম বর্তমানে N.F.D.C-র চেয়ারম্যান। আর তার মারফত আলাপ হল মৃণাল সেন-ঋত্বিক ঘটক-বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। পরবর্তীকালে বৃহত্তরভাবে কলকাতার গণনাট্য শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত এবং যুক্ত হয়েছিলাম।

কালচার ক্লাবের অনুষ্ঠানে ঋত্বিক 'জ্বালা'-নামে একটা নাটক লেখে। যারা আত্মহত্যা করেছে সেইসব লোকদের এবং তাদের মধ্যে এসে পড়া জ্যান্ত পাগলকে নিয়ে নাটকটা। জ্বালা কালচার ক্লাবেই প্রথম হয়, এবং আমার সব ভাঙা লাইটপত্র, যা তখন পর্যন্ত জনক রোডে আমার মেসোমশাইয়ের বাড়িতে থাকত - তারা আবার আত্মপ্রকাশ করল। এই নাটকে একটা আস্ত গাছের ডাল ভেঙে এনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম স্টেজের পেছনে, আব সাদা একটা পর্দা তারও পেছনে বাঁকাভাবে টাঙিয়েছিলাম (ওই পর্দাকে যে সাইক্লোরামা বলে তা কিন্তু তখন জানতাম না) এমন করে যে ডালটা পর্দাটাকে একটু ছুঁয়ে থাকে। ছায়া ফেলে আঁকাবাঁকা আসল ডাল আর তার থেকে ছড়ান ছায়ার বিসর্পিত রেখা - সব মিলে একটা অদ্ভুত ছবি, প্রায় সালভাদোর ডালির কাজের মত। এইটে জ্বালার একটা বিচিত্র পটভূমি তৈরী করেছিল। জ্বালাতে ঋত্বিক অভিনয়ও কবেছিল, আর গীতা সোম মানে আজকের গীতা সেন, মৃণাল সেনের স্ত্রী।

এই নাট্যপ্রচেষ্টার পর অল্পদিনের মধ্যেই ঋত্বিক-মৃণালের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। আপাতদৃষ্টিতে একটা রাজনৈতিক পার্থক্য থাকলেও আমরা কাছে এসে গেলাম, এবং তখন একটা ফিল্ম সবাই মিলে করার কথা হচ্ছে। আমি তখন নিউ থিয়েটার্সে - খুব কঠিন দিন, খাওয়া জোটে না, দরজায় দরজায় আশ্রয় চেয়ে ঘুরে বেড়াই, চাল নেই, চুলো নেই এমনি সময়ে ঋত্বিক একটা চাকরি দিল নির্মল দে'র সহকারী হিসেবে, ও তখন নির্মলবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের 'বেদেনী' ছবি করছে। তবে কাজ আমায় বিশেষ ধরতে হয় নি, কারণ ছবিটা হল না। হলে সাঙ্ঘাতিক হত। বিজনদার গান ছিল, আর বোধহয় হরিপ্রসন্ন দাস মিউজিক ডিরেক্টর, অদ্ভুত গান ছিল। প্রভাদেবী, কেতকী দত্ত, শোভা সেন এঁরা অভিনয় করছিলেন।

এই সময় একটা প্রস্তাব এল - তখন বহুরূপী সবে তৈরী হচ্ছে - নীলদর্পণ নাটক

হবে। আমাকে নিয়ে গেল। তখন ঋত্বিক বলল মৃণালকে সাবধান! ও কিন্তু SUC-র লোক। তবে আমায় দেখেশুনে নীলদর্পণের উদ্যোক্তারা বোধহয় সন্তুষ্টই হলেন। আমরা সবাই গেলাম, আবিষ্কৃত হল যে আমি আলো টালো নিয়ে একটু চিন্তা করি। আমাদের আড্ডা ছিল তখন 'প্যারাডাইস কাফে' বলে হাজরা মোড়ে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে। ওখানে মৃণাল, ঋত্বিক, সলিল চৌধুরী আমি তখন বসতাম, উৎপলও আসত মাঝে মাঝে। নীলদর্পণ পরিচালনা করবেন বিজন ভট্টাচার্য, পরিবেশনায় নাট্যচক্র। এই নাট্যচক্রের অন্যতম সংগঠক ছিলেন জ্ঞান মজুমদার, সুধী প্রধানও যুক্ত ছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ নাট্য সম্পাদনার কাজে সাহায্যে করেছিলেন। নব্যেন্দু ঘোষ ও দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়ও করেছিলেন, রায়তের চরিত্রে। আরও অনেকেই ছিলেন, বিশেষত বহুরূপীর গঙ্গাপদ বসু এবং আরতি মৈত্র। 'বহুরূপী' নামকরণ তখন সবে হয়েছে। গঙ্গাপদ বসু-দেওয়ান, আরতি মৈত্র-ময়রানী, বিজনদা-তোরাপ, শোভা সেন-সাবিত্রী।

নীলদর্পণের কাজ শুরু হল। আমি মৃণাল-ঋত্বিক নিয়মিত যাই। আমাদের তখন পকেটে পয়সাকড়ি বিশেষ থাকত না, গাড়ি ভাড়াও জোটে না - জ্ঞানদা আমাদের চারআনা পয়সা দেন, চাও খাওয়ান দোকানে বা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে। গীতা সোম তখন তার উত্তরপাড়ার বাড়ি থেকে আসে, তারও অত্যন্ত কঠিন দারিদ্র্য, অসুস্থ জ্ঞানদার বাড়িতে থাকে খায়। ভাবা যায় না সকলেরই কি ভয়ঙ্কর সময় গেছে। মৃণালের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয় আমার খাওয়া দাওয়ার নানারকম সমস্যা ছিল বলে ওর কাছে দুটাকা ধার করতে চেয়েছিলাম, তা মৃণাল আমাকে পার্ক সার্কাসের এক দোকানে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিল। নীলদর্পণের শুরুতে একটা ছায়ানাটকের ব্যাপার ছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দেখানোয় "নীল বাঁদরের অত্যাচারে" গানের সঙ্গে, সেটা মৃণালের পরিকল্পনা অনুযায়ী হত, শিয়ালদার এখন যেটা নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট, তার তখন নাম ছিল EBR ম্যানসন। নাটকের শেষের দিকে যখন সাবিত্রী পাগল হয়ে "খোকা আমার খোকা" চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে যান তখন একটা ব্যাপার ধরেছিলাম। স্টেজের পিছনে দরজা খুলে বেরিয়েই দুটো স্ট্রীট লাইট ছিল সে দুটো দলের বারীণ আর অমলকে দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে ফেললাম। দরজার উপর দুটো ফ্লাড লাইট বসান হল। শোভাদিকে অভিনয়ের দিন চুলে খুব করে সাবান দিয়ে আসতে বলেছিলাম। সেই দৃশ্যে ওঁর চুল আলুথালু করে দিলাম, উনি চিৎকার করতে করতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে দরজার পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আলো থেকে ক্রমশঃ গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। এমন কিছু ভাল লাইট তো হাতে তখন ছিলও না যা কিছু ছিল তাই দিয়ে মুহূর্ত কটা তৈরী হল। এর সঙ্গে অল্পসল্প অন্য কিছু আলোর কারসাজিও ছিল।

এর আগে কংগ্রেসের সাহিত্য সঙ্ঘের সূত্রে আলাপ হয় তরুণ রায়ের সঙ্গে। যোগাযোগটা কিন্তু আমার থেকেই গিয়েছিল। ওঁর এলগিন রোডের সেই জাহাজ প্যাটার্নের বিরাট মামাবাড়ি - 'অজানা' - সে বাড়িতে জাতীয় নাট্য পরিষদ বলে একটা সংস্থা ছিল। ওঁরা দুয়েকটা নাটক করলেন, 'রূপকথা', 'Light that shone in darkness': জওহরলাল নেহরু নিউ এম্পায়ারে দেখেছিলেন। ওঁদের সহ-সভাপতি ছিলেন কালিদাস নাগ। সেটা আবার একদম অন্য মহল অন্য জগৎ। কিন্তু আমার সেই লাইটের প্যাকিং

বাক্সটা তারপর থেকে ১০।১ এলগিন রোডে 'অজানায়' রয়েই গেল, ওখান থেকেই ওটা আমি নিয়ে যেতাম আর রেখে আসতাম। যখন নাট্যচক্রে কাজ শুরু হত তখন থেকে আমি ভবঘুরে বৃত্তি ছেড়ে হাজরা রোডে একটা মেসে কোনরকমে জায়গা পেয়েছি। তার আগে বহু জায়গায় ভেসে বেড়িয়েছিলাম : টালিগঞ্জের বস্তি, পার্ক সার্কাসের কবরখানার পাশে SUC-র কমিউন। স্মার্টা গ্রাউন্ডে শান্তি সম্মেলনের সময়ে SUC-র সঙ্গে আমার কতগুলো ব্যাপারে মতপার্থক্য হয়েছিল, তখন থেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়।

স্মার্টা গ্রাউন্ডে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ইংরাজী নাটক করল ক্লিফোর্ড অডেট্‌স্-এর "Till the day of die". আর বহুরূপীর ছেঁড়া তারের শেষ দৃশ্যটা অভিনীত হল। সে একটা অপূর্ব অভিনয়, রহিমুদ্দিন আর ফুলজানের তালাকের দৃশ্যটা লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখল। আরও অনেক কিছু হয়েছিল। শান্তি সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল ভবানীপুরে রমেশ মিত্র রোডের সংযোগস্থলে একটা ফাঁকা জমিতে - এখন সেখানে মাল্টিস্টোরেড বাড়ি উঠেছে। ঐ সময় থেকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম আমি বা আমরা। আমরা মানে ততদিনে উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জী এঁরাও এসে গেছেন, সলিল চৌধুরী, ভূপতি নন্দী, পানু পাল। এই ২য় পর্যায় তখন শুরু হয়েছে ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটকে কেন্দ্র করে। ওটাই তখন আমাদের ঘরবাড়ি - সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি পড়ে থাকি। ওটাই সেন্ট্রাল স্কোয়াড। এবং তখন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রধান কাজ হচ্ছে যুব উৎসব, শান্তি সম্মেলন, পরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীও করা হয়েছে - কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

বহুরূপীর পথিক করেছি বালিগঞ্জের ব্রতী সংঘে - তুলসী লাহিড়ীর লেখা নাটক ও আসানসোলের কয়লাখনি মজুরদের নিয়ে লেখা জি টি রোডের ধারে। বহুরূপীর একটা উল্লেখযোগ্য নতুন ধরনের প্রচেষ্টা হল নিউ এম্পায়ারে সেই পথিক আর ছেঁড়া তার। আর উলুখাগড়া ছদ্মনামে শম্ভুবাবু লিখেছিলেন।

অনেক জায়গায় সে সময়ে কাজ করতাম। উত্তরপাড়ায় একটা নাটকের দল ছিল - নাট্যচক্র না কী - ওখানকার ছেলেদের, তার সঙ্গে মৃণাল তো যুক্ত ছিলই তার ভাবী স্ত্রী গীতা আর আজকের যশস্বী অভিনেতা অনুপকুমার, (গীতার ভাই) ওরাও ছিল। এই দলটা নানা জায়গায় নানারকম সব নাটক করত। আমাদের সে দিন দারুণ বেকার ভবঘুরে জীবনে, এই করব সেই করব বহু স্বপ্ন, ভাবনা - স্পষ্ট কিছু না; আর এটাও ভাবছি না কোনও সময়ে, যে আমরা স্ট্রাগল করছি, না খেয়ে দেয়ে একটা জলন্ত মশাল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি - না! এটা এখন লোকেরা romanticize করে, বা আমরাই করি। কিন্তু তখন অতটা আত্মসচেতনতা ছিল না।

একজায়গায় গিয়ে দেখি shadow-play হবার কথা, ছায়া-টায়া দিয়ে মৃণাল কী সব ভেবেছে, সেটা হবে। জায়গাটার নাম বিষ্ণুপুর, এবং সেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। কি করে কি হবে খুব দুশ্চিন্তা-আমি বললাম আপনাদের কাছে সাইকেলের ডায়নামো আছে, যাতে সাইকেল প্যাডল করলে আলো জ্বলে? তারা বলল, হ্যাঁ, আছে বৈকি। সেটা নিয়ে সাদা পর্দার পিছনে বসিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলাম। দেখা গেল

সে আলো যে আলো আমাদের আসলে থাকার কথা তার থেকেও ভাল হল। আস্তে ঘোরালে আলো আলো আস্তে ফুটল, ভীষণ জোরে প্যাড্‌ল করলে তেড়ে জ্বলছে...নানান গতিতে প্যাড্‌ল করে আলোকে বিভিন্ন ছন্দে নাড়ান-চালান হল এবং তাতে ছায়াভিনয়টা যা দাঁড়াল তা ওরাও ভাবতে পারে নি আমরাও পারি নি।

এই অতর্কিত আবিষ্কার বা প্রাপ্তি অতীতে তো হয়েইছে, ভবিষ্যতেও হয়েছে। কল্লোল নাটকের রিহার্সাল চলছে। একটা ম্যাপের দৃশ্য ছিল, পেছনে জাহাজ। সেই ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকার ম্যাপটা ছিল বিরাট করে কাট আউট করা, তখনও তার পেছনে কাপড় বা প্লাইউড লাগান হয়নি। রিহার্সাল চলতে চলতে একসময় উৎপল দত্ত, সুরেশ দত্ত আর আমি তিনজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম - ম্যাপের পিছনে একটা আবছা আলোয় জাহাজটা দেখা যাচ্ছে! ম্যাপের দৃশ্য থেকে পরের জাহাজের দৃশ্যে যাব, ম্যাপ উঠে যাবে এবং জাহাজ দেখা যাবে - আগে এটাই স্কীম ছিল। কিন্তু এখন ঠিক করা হল ম্যাপটা থাকতে থাকতেই জাহাজের ওপর অমনি আবছা আলো ফুটুক। সুরেশ বলল আলোটা পুরো ফুটলে আস্তে আস্তে দর্শকের চোখের ওপর দিয়ে ম্যাপটা তুলে নেবে, তার ফলে পুরো দৃশ্যটা দেখতে আর কোনও অসুবিধে হবে না। তখন উৎপল আবার বলল ম্যাপটাও উঠতে থাকুক, জাহাজ সংক্রান্ত কোনও শব্দ বা সঙ্গীতেও পরিবেশটা বদল হক। তিনজনের এই আকস্মিক আইডিয়া দিয়ে যে নতুন একটা অর্থ তৈরি হল সেটা কিন্তু আমাদের আগের ভাবনায় ছিল না।

বিষ্ণুপুরে সাইকেল দিয়ে লাইটিং করে আমি আর মৃণাল অনেক কায়দা করে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়েছিলাম টিকিট ছিল না কিনা। নীলদর্পণের পরে একটু একটু করে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বা নাচের ব্যাপারে আলোর যে অবস্থান সেটা ক্রমশ আমার মনোযোগ দাবি করতে লাগল। আলো কোনদিক থেকে আসবে, কতটা intensity- তে আসবে বিভিন্ন দিক থেকে আসা আলোয় আলাদা আলাদা রঙ ব্যবহার করে ছবি তৈরি করার চেষ্টা, তার সঙ্গে রির্হাসালের মাধ্যমে সঙ্গীত পোশাক সবকিছু মিশিয়ে যে একটা জায়গায় পৌঁছানো যায় তার একটা চূড়ান্ত প্রমাণ পেলাম অনাদিপ্রসাদের 'ওমর খৈয়াম' নৃত্যনাট্যে। এই ওমর খৈয়ামের শিল্পনির্দেশক ছিলেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর আলোক-পরিকল্পক আমি। আলোর বিন্যাস এবং তার equipment. আলোর concentration : কোনও জায়গায় ছোট্ট একটু আলো এবং বাকি সমস্ত স্টেজ অন্ধকার থাকলে কি হয় এসব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা গিয়েছিল। এই concentration -এর জন্য বিশেষ ধরনের যে আলো দরকার সে আলোটা আমার কাছে অনেকদিন ছিল না, এবং যতদিন না ছিল ততদিন ঐ কেন্দ্রীভূত আলোর ভাবনাও মাথায় আসে নি। কিন্তু ওমর খৈয়ামের আগে একটা আমেরিকান লাইট আমার হাতে এল - 'সেঞ্চুরি', যেটা দিয়ে একেবারে এক-দেড় ইঞ্চি ব্যাসের আলোকবৃত্ত তৈরি করা যায়। ওমর খৈয়ামের শেষ দৃশ্যে কবরের ওপর রূপোর পানপাত্রে ঐরকম আলোকবিন্দু এসে পড়ত খুব সুন্দর একটা মিউজিকের সঙ্গে, অন্য সমস্ত আলো তখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত এবং একটা ট্র্যাজিক মুহূর্ত গড়ে উঠত। পরে খুব ছোট্ট জায়গায় আলো করার জন্য ছোটখাট সরঞ্জাম তৈরি করেছি: ছোট ছোট টিনের কৌটোর মধ্যে সাধারণ ২৫।৪০ ওয়াট বাল্ব ঢুকিয়ে, তার উদাহরণ 'অঙ্গার', 'পাগলা

ঘোড়া' অনেক নাটকে আছে। ওমর খৈয়ামের একটা বেগারস ডান্স বা ভিখারীদের নাচের দৃশ্য ছিল তাতে সারা স্টেজময় ছেঁড়া কম্বলের ফালি ঝুলত, আর সেই দৃশ্য পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে কাটা কাটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলো একদিক থেকে ফেলা হত। দৃশ্যটা একটা উডকাট ব লিনো কাট্-এর মত দেখাতো অন্য দৃশ্যের যে রোম্যান্টিক চেহারা তার contrast হিসেবে।

এইসব ভাবনা যে খুব স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে ছিল তা নয়, ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল এবং পরে সেগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি আর শিখেছি আমার মতে ব্যাপারটা এই। দেশ-বিদেশে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে সেটাও কাজ করতে করতেই জানবার চেষ্টা করেছি।

আজ অনেক নতুন নতুন থিয়েটার তৈরি হয়েছে। এদেশে আধুনিক থিয়েটার সূচনা হিসেবে দিল্লির AIFACS হলের নাম অবশ্যই বলতে হয়। ওটা তৈরি শুরু হয় ১৯৫৪-তে, উদ্বোধন হয়েছে ১৯৫৬-এ। তারপর অগুনতি থিয়েটার হয়েছে ভারতবর্ষে, কলকাতায় - আধুনিক আলোকসম্পাতের ব্যবস্থাও তাতে রয়েছে। কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা কাজ করতে করতে বইপত্র থেকে জেনেছি আলো কি জিনিস, আলোর মনস্তত্ত্ব কি জিনিস, আলোর প্রাণ কি জিনিস, আলো কি অন্ধকার কি, রঙ কি - এবং সেটা জানার জন্য দীর্ঘ বিচিত্র পথ পরিক্রমা করতে হচ্ছে এবং হবেও। বর্তমান প্রজন্মকেও যে সেই ৩০/৪০ বছর কাটাতে হবে শিখতে গেলে তা নয়। কিন্তু আমরা দীর্ঘ যাত্রায় যা পেয়েছি তাকে বলা চলে, rewarding and self satisfying। অনেক কিছু হয় নি তা হাস্যকর হয়েছে। তার মধ্যেই আবার বিমান আক্রমণ দৃশ্যটা কাঠের চাকা, লোহার তার আর কালো পোস্টার পেপার দিয়ে ধরে ফেলা গেছে। অঙ্গারের জলপ্লাবনের দৃশ্যটার এস্টিমেট হয়ে দেখা গেল যা বিলিতি আলো দরকার তার জন্য ১৪।১৫ হাজার টাকা খরচ পড়বেই, এবং সে সব আনানোর সময়ও নেই টাকাও নেই। ৫০ টাকায় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়েছিল। ঘাবড়ে না গিয়ে বুক ঠুকে দাঁড়ালে অনেক পর্বতই মাথা নামিয়ে নেয়, দেখা গেছে অনেকবার। ব্যর্থতা অস্বীকার করেই experiment করেছি, সেতুর ট্রেনও চালাতে পেরেছি। সবকিছুই যে ডাস্টবিন ঘেঁটে বার করতে হবে তা নয়, তবে তুচ্ছ বাতিল জিনিস দিয়ে অনেক চমকপ্রদ সলিউশন পাওয়া যায় অবশ্যই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সহজ সরল পথটা চোখে পড়ে না, এটা আমি অনেকবারই আমার শিল্পে দেখেছি। ঢাল তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার হয়েও অকিঞ্চিৎকর যা কুড়িয়ে পেয়েছি তা দিয়েই মাথা খাটিয়ে করেছি, পেয়েছি কাজের আনন্দ।

জাহাজের উপর একটি কাল

কল্লোল নাটকের দৃশ্যসজ্জা করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল আমাদের। কে করবে এই মঞ্চ? সমুদ্রের বুকে জাহাজ, বন্দরে জাহাজ, ডক শ্রমিকদের বস্তি - এসব নিয়েই এর মঞ্চ। 'কল্লোল' নাটকের আগে মিনার্ভায় চলছিল লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'অঙ্গার'। মঞ্চ পরিকল্পনা, আলো, সঙ্গীত, সর্বোপরি অভিনয়ে - এটাও ছিল উৎপল দত্তের এক বিস্ময়কর প্রযোজনা। এতে ছিল রবিশঙ্করের সঙ্গীত, নির্মলেন্দু চৌধুরীর গান, আমার আলো, এবং নির্মল গুহরায়ের মঞ্চ প্রয়োগ। 'কল্লোল' নিয়ে কথাবার্তা চলছে তখন নির্মল গুহরায় ভারত সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে গেছেন প্যারিস। অতএব সমস্যা দেখা দিল মঞ্চ নিয়ে। আমার হঠাৎ সুরেশ দত্তের কথা মাথায় এল। উৎপলকে বলি, এটা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এর আগে সুরেশের কিছু কাজ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। চিলড্রেনস লিটল থিয়েটারে নানারকম মডেল, টাটা বিল্ডিঙে দেয়াল-চিত্র, কিপলিংয়ের একটি নাটকে মুখোশ এবং পোশাক। পুতুল নিয়ে তখন সবেমাত্র নাড়াচাড়া শুরু করেছে। তো, আমি উৎপলকে সুরেশের নাম বলতেই ও বলল, সুরেশ দত্ত! সে তো খুব ভাল পুতুল-টুতুল তৈরী করে। সেট তৈরী করতে পারবে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওকেই ডাকা হল। আমি, সুরেশ এবং আমাদের বন্ধু মিহির মুখার্জি - তিনজনে গেলাম আউট্রাম ঘাটে জাহাজ দেখতে। মিহির তখন 'চার্বাক' গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। ওর সঙ্গে শিপিংয়ের জগতের কীরকম যোগাযোগ ছিল যেন, সেজন্যই ওকে আমরা সঙ্গে নিলাম। জাহাজ দেখলাম। স্কেচ তৈরী করলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে দৃশ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে দু-জনে মিলে একটা আইডিয়া খাড়া করে উৎপলকে জানালাম, উৎপলের পছন্দ হল আমাদের আইডিয়া। সুরেশ কিছু গ্রাফ পেপার কিনে এনে বৈজ্ঞানিকভাবে মিনার্ভা হলের নকশা তৈরী করল। হলের সেন্টার, থাম, স্টেজ, - তার সঙ্গতি-অসঙ্গতি সব নিয়ে। এরপর কার্ডবোর্ডে মিনার্ভা হলের নকশা তৈরী হল। আমার কিছু বই ছিল। রাশিয়ান যুদ্ধ জাহাজের কিছু ছবি ছিল তাতে। ঐ ছবিগুলো দেখে একটা আইডিয়া পাওয়া গেল। এরপর কার্ডবোর্ড জাহাজের মডেল তৈরী হল। জাহাজটি দু-ভাবে বসাবার ব্যাপার ছিল। মুখোমুখি। অর্থাৎ জাহাজের নাক দর্শকের দিকে। আরেকটা আড়াআড়ি ভাবে। এরপর হলের নকশায় জাহাজের মডেল ফেলে নিরীক্ষা চলতে লাগল। সুরেশের কাজ একেবারে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মত। এসব কান্ডকারখানা চলেছে পূর্ণদাস রোডের আমার বাড়িতে। তখন আমি ঐ খানেই থাকতাম।

জাহাজের মডেল শেষ। এরপর শুরু হল উৎপল দত্তর সঙ্গে রিহার্সাল। 'টেবিল-টপ' রিহার্সাল। দাবার ছকের মত করে চরিত্রগুলিকে ফেলেন। তাদের আসা-যাওয়া, চলাফেরা, লাইট, শ্যাডো- সবই নিয়ন্ত্রিত হয় ছকের মধ্যে ঘুটি ফেলে। চরিত্ররা বই নিয়ে বসেন।

সংলাপ বলেন। সেই সঙ্গে দাবার ছকে চরিত্রদের চলাফেরা শুরু হয়। সংলাপ মুখস্থ হলে উৎপল দত্ত ফ্লোরে রিহার্সাল শুরু করেন। আজকের প্রম্পটার-বিহীন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক কিন্তু মূলত উৎপল দত্তেরই অবদান। যাই হোক, জাহাজের মডেলেও দাবার ছকে ফেলে রিহার্সাল চলল। এসব তো হল। এরপর রঙ্গলাল মিস্ত্রিকে দিয়ে জাহাজ তৈরী করা হল। রঙ্গলাল মিস্ত্রি এখনও সেটের কাজ করেন। আমরা মার্কেন্টাইল জাহাজ দেখেছি। তার থেকে আইডিয়া নিয়েছি। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে রয়েছে বাস্তবের বিরোধ। আবার বাস্তবের মধ্যেই আছে শিল্পের সম্ভাবনা। যা দেখেছি তার থেকে আভাস ইঙ্গিত প্রেরণা নিয়ে নূতনতর কিছু করা - এটাই শিল্প। এসব কথা বলছি এই কারণে যে জাহাজের পাটাতনের কিছু অংশ আমরা দেখিয়েছি, ডেকের যতটা উচ্চতা ততটা উচ্চতা নিয়ে। যা দেখিয়েছি তাতে একসারি নাবিক কেন - পাঁচ ছ-জনও দাঁড়াতে পারে না। অথচ আলো অন্ধকারে সব মিলিয়ে এমন একটা ইলিউশন তৈরী হল - যেন বিরাট জাহাজের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে, বাকিটা মিলিয়ে আছে অন্ধকারে। কখনও জাহাজ এগোচ্ছে, কখনও ঘুরছে। দর্শক অবাক। ঐটুকু জায়গায় জাহাজ ঘুরল কি করে? ঐ ঘোরানোর ব্যাপারটিও বাড়িতে কার্ডবোর্ডের নকশায় আমরা দেখে নিয়েছিলাম।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, লোকে জাহাজ মনে রেখেছে। অঙ্গারে যেমন লোকে মনে রেখেছে প্লাবনের দৃশ্য। কিন্তু তার থেকেও চমকপ্রদ বা ইন্টারেস্টিং ছিল রেসকিউ অপারেশনের দৃশ্য। যে দৃশ্য বিশ্ব নাট্য ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু দর্শক মনে রাখেনি। দর্শককে আমি সে জন্য দোষ দিই না। 'কল্লোল' নাটকের শুরুতে বয়লারের দৃশ্যটিও তেমনি চমকপ্রদ। কিন্তু লোকে তার কথা খুব বেশি বলে না। লোকের মনে নেই। কিন্তু টেকনিক্যালি এবং থিয়েট্রিক্যালি বয়লারের দৃশ্যের কম্পোজিশন অনেক উচুঁমানের। শম্ভু ভট্টাচার্য - সূত্রধর, নাবিকের পোশাকে নৌবিদ্রোহের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে দিতে দর্শকের মধ্য দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'বাজে ক্ষুব্ধ ঈশান কোণে বজ্র বিষাণ'- ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গে গুরগুর করে উঠত বুক আর সেই সঙ্গে শুরু হত বয়লারের দৃশ্য। বয়লার রুম। নাবিকদের সংলাপ। খিস্তি খেউর। বয়লার রুমের আলোর ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যাই হোক, আমরা কিছু শিকল ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। জাহাজ ছুটছে, হঠাৎ ঝাঁকুনি। বিস্ফোরণ, জাহাজ দুলে উঠল, প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। আরও জোরে। শিকলের ছায়া এসে পড়েছে বয়লারের ওপরে, জাহাজ ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেনগুলো দুলে দুলে ওঠে। এক অদ্ভুত ইলিউশন। মনে হয় যেন চলমান জাহাজ দুলছে। জাহাজের গহ্বরে বয়লার রুম দুলছে। শব্দ, আলো, অভিনয়,- সব মিলিয়ে এ ধরনের মাউন্টিং বিশ্ব নাট্য ইতিহাসে খুব কম নাটকই আছে। এরপর আসে জাহাজের দৃশ্য।

গভীর রাত। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। শুধু নীল ঢেউ ফসফরাসের আভায় আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। মৃদু ফসফরাসের আলোয় চকচক করছে কালো খোল। ওপারে মনে হচ্ছে অনেক দূরে থেকে শার্দূল সিং সাঁতরে খাবার নিয়ে আসছে। দুই নাবিকের দেখা জাহাজের ডেকে। খোলা আকাশের নীচে। একজন লক্ষ্মী বাঈয়ের প্রেমিক। একজন ওর স্বামী। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ উঁচু পাটাতনের ওপর। দেশলাইয়ের আলোয় অন্ধকারে আবছা

দেখা যায় ওদের মুখ। এই ছিল দৃশ্য। এর পরের দৃশ্য প্রেমের সঙ্ঘাত আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

দৃশ্যপট মাউন্টিংয়ের আরেকটি জায়গা: নাবিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সালভো। দর্শকের চোখের সামনে কামানের নল। আগুন ধোঁয়া। বিস্ফোরণ সব দেখা যাচ্ছে। এতেও দারুণ উত্তেজনা হত।

রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহে কমিউনিস্ট পার্টির কী ভূমিকা ছিল এবং কংগ্রেসের বল্লভভাই প্যাটেল কী ভাবে তার পেছনে ছুরি মেরেছিলেন, উৎপল দত্ত 'কল্লোল' নাটকে তা তথ্য ও যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছে। বল্লভভাই-এর চরিত্রটির নাম ছিল মগনলাল। গান্ধী টুপি পরা। খদ্দরের পোশাক ও পাট করা খদ্দরের চাদর, চরিত্রটিতে রূপদান করেছিল ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত। কংগ্রেসের এই ভূমিকা তখন জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। প্রচুর ধিক্কার কুড়িয়েছিল কংগ্রেস, যাই হোক, সেই মগনলালের সঙ্গে র‍্যাটরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর ঠিক ইন্টারভ্যালের আগে দেখা যেত অন্ধকার রাতে জাহাজের মাস্তুলের পতাকা উড়ছে। প্রথমে ত্রিবর্ণ লাঞ্ছিত। কংগ্রেসের, পরে মুসলিম লীগের। সবুজের ওপর চাঁদ তারা। সব শেষে রেড ফ্ল্যাগ। কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত। মিনার্ভা থিয়েটারের সমস্ত আলো কমতে কমতে মাস্তুলে গিয়ে স্থির হত। ছোট্ট স্পট-এর তীব্র আলোয় দেখা যেত পত পত করে পতাকা উড়ছে। আমরা অনেক ওপরে একটি ফ্যান ফিট করে রেখেছিলাম। তাতেই পতাকা উড়ত। মিউজিক, অর্কেস্ট্রেশন, সব কিছুর সঙ্গে পর্দা নেমে আসত। ভেতরে বসে শুনতাম দর্শকের উচ্ছ্বসিত করতালি।

এরপর আসছি ওয়াটার ফ্রন্টের বস্তির কথায়। স্টেজে ঐ জগদ্দল জাহাজ সব জায়গা জুড়ে বসেছে। তার সাইড ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ এসব দেখাতেই হিমশিম। ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি কী করে দেখাব? আমরা জাহাজের সামনে তিন ফুট চওড়া চার ফুট উঁচু বেদি তৈরী করলাম। তার ওপরে ইট বার করা একটা দেওয়াল দেখানো হল। তার মধ্যে, দু-ফুট থিকনেস-এর খিলান, একটা জেলখানা ভাব আসত। একটা দৃশ্য আছে, সাঁজোয়া গাড়ি এসে বস্তি ধ্বংস করে দেবে। বস্তির অধিবাসীরা দাঁড়িয়ে আছেন, শোভা সেন - শার্দুল সিং এর মা, গীতা সেন লক্ষ্মী বাঈ এবং আর একজন। সাঁজোয়া গাড়ি আসছে। তিনজন তাকিয়ে আছে। স্ট্রং সার্চলাইট পড়ছে। আলো আর কালো কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। বস্তির তিনজন দর্শকের দিকে পেছন ফিরে ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। লম্বা লম্বা কালো সাদা ছায়া বাড়ছে, গাড়ির আওয়াজও বাড়ছে, এর মধ্যে মন্টু ঘোষের গলায় গান শোনা গেল - 'জাগা হ্যায় ইনসান জমানা বদল রহা', গান চলছে। তার তালে তালে তীব্র আলো কেটে কেটে যাচ্ছে দর্শকের চোখের সামনে। আলো যত বাড়ছে শব্দও তত বাড়ছে, আস্তে আস্তে পর্দা পড়ল। আমরা রিয়্যালিস্টিক সাঁজোয়া গাড়ি দেখাইনি। ইগনোর করেছি। কিন্তু এটা যে সাঁজোয়া গাড়ির আলো তা কথায় বার্তায় এসট্যাবলিশড। তিনটি লোক যে সাঁজোয়া গাড়ির তলায় গুঁড়িয়ে যাবে সেটাও এসট্যাবলিশড। ওরা যে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সঙ্গীতের মাধ্যমে সেটাও প্রতিষ্ঠিত হল। মিউজিক, লাইট, ভিস্যুয়াল সব মিলিয়ে আর্টিস্টিক বিল্ড আপ।

জগদ্দল ঐ জাহাজ, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি ছাড়াও দেখানো হয়েছে র‍্যাটরে-র অফিস।

কখনও মগনলাল বক্তৃতা দিচ্ছে। মগনলালের বক্তৃতা হত দর্শকের আসনেরই প্রায় সামনে। তার হাতে সুইচ থাকত। নিজেই আলো জ্বালিয়ে বক্তৃতা দিত। শেষ হয়ে গেলে নিজেই নিভিয়ে দিত। র‍্যাটরে-র অফিস দেখানো হত অনেক পেছনে। তার ঘরে মিটিং-আলোচনা এসব।

নাটকের একেবারে শেষে মুলুন্দের বন্দীশিবির। তিনফুট উঁচু যে বস্তির বেদি সেখানেই কাঁটাতার দিয়ে বেড়া তৈরি হত। বন্দুকধারী গোরা সৈনিককে দেখা যেত পাহারা দিচ্ছে। কাঁটাতারের পেছনে পাথরের দেয়াল। সেখানে আলো পড়ছে। লক্ষ্মী বাঈকে ধরে আনা হয়েছে সেখানে। সে জানে না শার্দূল মারা গেছে। ঐ কাঁটাতারের ওপার থেকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হয় শার্দূলের মৃতদেহ। লক্ষ্মীবাঈ অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করে স্বামীর মৃতদেহ তার সামনে।

নৌবিদ্রোহ শেষ হয় চূড়ান্ত ফ্রাস্টেশনের মধ্যে। নাবিকরা পরাস্ত হয়। উৎপল সুন্দর ভাবে তা দেখিয়েছিল। ক্ষতবিক্ষত দেহ। ছিন্ন ভিন্ন পোশাক তাদের। কেউ সমুদ্রের জল তুলে খাচ্ছে। ব্রিজলাল সামনে পড়ে থাকত চিৎ হয়ে। মাথায় ব্যান্ডেজ। এরপর নাবিকরা ঐ বিক্ষত শরীরে দর্শকদের মধ্য দিয়ে বলতে যেত নো সারেন্ডার। ধীর পদক্ষেপ। যেন আগামী যুদ্ধের শপথ নিয়ে তারা চলেছে।

এক অসম লড়াইয়ে নাবিকরা হেরে গেল। গোলা নেই। রসদ নেই। ওদের ওপর শুরু হয়েছে বিমান আক্রমণও। উৎপল বলল বিমান আক্রমণ দেখাতে হবে। কেমন করে দেখাব? এটা তো চলচ্চিত্র নয়। উৎপল বলল - করতে হবে। মহা ফাঁপরেই পড়েছি। হলের পুরনো বক্স-এর সামনে রোলার লাগালাম। তাতে বিমানের মডেল, ছায়া পড়ছে জাহাজের উপর। কিন্তু উল্টোদিক থেকেও আসছে। হঠাৎ দেখলাম, আড়াআড়ি ভাবে মডেলকে রাখলে একদিকের ছায়া পড়ছেনা। একেবারে হঠাৎই, আচমকা আবিষ্কার। জাহাজ দর্শকের মুখোমুখি। যুদ্ধ বাড়ছে কামানের আওয়াজ বাড়ছে। বিমান আক্রমণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোলা বারুদের ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছে নাবিকরা। বিমান নয়, বিমানের ছায়া। তাতেই দর্শক উচ্ছ্বসিত, যাকে বলে—বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ বাংলা দেশের থিয়েটারে যান্ত্রিক কলাকৌশলে সার্থক কিছু নিরীক্ষা চালিয়েছে। 'কল্লোল'-এর অবদান অবিস্মরণীয়। কোনও একটি নাটককে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক দিক থেকেও—অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, তিতাস একটি নদীর নাম নাটকের পরে 'কল্লোল'-এর অবদান অবিস্মরণীয়। কোনও একটি নাটককে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠা, নাটকের নামে বিজয়োৎসব হওয়া, সেখানে মানুষের সমাগম হওয়া বিশ্ব নাট্য ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। সাহিত্যে যেমন একটা সময় 'কল্লোল' যুগ বলে চিহ্নিত, নাটকেও তেমনি 'কল্লোল' অপর একটি যুগ বলে চিহ্নিত। সে যুগের কেন্দ্রে ছিলেন উৎপল দত্ত। তাকে ঘিরে আরও কয়েকজন। নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এবং সঙ্গে সম্ভবত গোটা একটা দেশ।

বেলা অবেলা-র আলোয় অন্ধকারে

'বেলা অবেলার গল্প'-র প্রথম রিহার্সাল দেখেছিলাম মনে আছে ছিয়াশি সালের মে মাসে। প্রচণ্ড গরম ছিল। রিহার্সাল হয়েছিল বেলগাছিয়ার সৃজনী মঞ্চে। হল-টাও প্রচণ্ড গরম। বসে থাকা যায় না। কিন্তু রিহার্সাল দেখতে দেখতে এ সব কথা ভুলে যাই। নানা কারণে নাটকটা আমাকে খুব ইম্‌প্রেস্‌ করে। তার কিছু কারণ যেমন নিতান্তই আর্টিষ্টিক বা ইসথেটিক, তেমনি অনেকগুলো ব্যক্তিগত কারণও ছিল। আমরা চলে যাই ১৯৫৩ সালে। ট্রাম-ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে তখন কলকাতা উত্তাল। সেই সময়কার একটি কম্যুনিস্ট ফ্যামিলি ও তার বন্ধুবান্ধবদের উত্তেজনা, আন্দোলনে সামিল হওয়া, তাই নিয়ে কথাবার্তা, এ সব আমার নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত সেইসব দিনে আমি, মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী আমরা সব কী রকম টগবগ করতাম, রাস্তায় শুধু হাঁটতেই কী রকম ভাল লাগত, মনে পড়তে থাকে। নাটকের কম্যুনিস্ট কর্মীরা যখন লাঠিও খায় আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেই গানও গায়, এখন মনে পড়ে, আমাদের কাছেও তখন সমাজ পাল্টানোর আন্দোলন আর শিল্পের আন্দোলন কেমন একাকার হয়ে গিয়েছিল। অশোকের দাদা রমেন ব্যানার্জি, নৃপেন ব্যানার্জি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। রমেনবাবুর স্ত্রী প্রীতি ব্যানার্জি তখন বিখ্যাত গায়িকা আই. পি. টি. এ-র। কৈশোরে অশোক তাই কম্যুনিস্ট ফ্যামিলির একটা আবহাওয়া পেয়েছিল। এটা আমি জানতাম। নিশ্চয়ই সেটা ওর নাটক লিখতে বা স্টেজে মাউন্ট করতে সাহায্য করেছে।

দ্বিতীয় অংশে কম্যুনিস্ট পার্টির ভাঙনের কথা এসে পড়ে। তখন আবার আরও অনেক মন খারাপ করা স্মৃতি ভিড় করতে থাকে। পার্টি ভাঙার সময় আমরা অনেকে এটা মানতে পারি নি। আমার মনে পড়ছে, বোধ হয়'৬৭-র ইলেকশনের আগে, বামপন্থী শিবির ইউ. এল. এফ এবং পি. ইউ. এল. এফ. ভাগ হয়ে আছে, ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী মোর্চা হচ্ছে না। তখন বৌবাজারের একটা মিটিংয়ে আমি যাকে বলে স্টর্মড দি মিটিং যে কেন লেফট ইউনিটি হবে না। যাই হোক, মিড-সিক্সটিজে পার্টি ভেঙে গেল। প্রথমে দুই পরে তিন টুকরো হল। সেই কষ্ট এ নাটকে আবার ফিরে আসে। তৃতীয় অঙ্কে মা ও ছেলের কনফ্রনটেশনে আবার আরও একটা নতুন জেনারেশনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—তাদের রাগ, অবিশ্বাস, সন্দেহ, হতাশার ছবি ফোটে ছেলের মধ্যে। তবু সব মিলিয়ে মায়ের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রায় কুড়ি বছরের এই বিরাট টাইম-স্প্যান নাটকে আসে একটা পরিবারের গল্পের মধ্যে দিয়ে। রাজনীতির গল্প আর জীবনের গল্প চমৎকার মিশে যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, আমার স্ত্রী গীতার কথা। নিজের কিছু ভাল লাগলে সেটা তখন কাছের লোককেও

দেখাতে ইচ্ছে করে। ও যেদিন একাডেমিতে দেখতে এল, ফার্স্ট অ্যাক্টের পর আমায় বলল, কই, এত দেখছি সেই রাজনীতির ব্যাপার। আমি বললুম, আরেকটু দেখো। সেকেণ্ড অ্যাক্ট থেকে সত্যি বাইরের গল্প ভেতরের গল্প মিশে যায়। তখন গীতাও বলল, হ্যাঁ, সত্যি নতুন স্বাদ লাগছে। মানবিক সম্পর্কগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকেও দেখতে পাই নির্দেশকের নজর রয়েছে। খুব মুভিং কিছু মোমেন্টস তাই তৈরি হয় যেগুলো বেশ দাগ কাটে। অভিনয়েও দেখতে পাই মায়ার প্রচণ্ড অভিনয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোটা দলটার কাজ থেকেই কমপিটেন্ট অভিনয় আদায় করে দেয় অশোক। রাম তো একটা সারপ্রাইজ। বৃদ্ধের ভূমিকায়।

এই নাটকের আলোর ছক করতে তাই ইনস্পায়ার্ড বোধ করি। আমার মনে হতে থাকে, সময় এ নাটকে খুব দরকারী একটা মাত্রা। শুধু দিন ও রাতের সময় নয়। তার সঙ্গে মিশে আছে মানুষের মন পাল্টানো, তার মুড ও মেজাজের রং। এ ছাড়া বাইরের সময় পাল্টালে তার ছাপ এসে ঘরে পড়ছে। তাই গোটা প্রথম অঙ্ক জুড়ে আলো বেশি যাবে। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্ব জটিল হয়। আলোর সঙ্গে ছায়া এসে পড়ে। আলো-আঁধারির অনেক ছবি তৈরি হয়। বাবার স্ট্রোক হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ একটা আলোর রেখা মায়ের ভয়ার্ত মুখে থেকে যায়। যেমন বাবা-ছেলের কান্না ভেজা মুখের ওপর আলো থাকে। যতক্ষণ না পর্দা পড়ে যায়। তৃতীয় অঙ্কে বাবা-মা একলা হয়ে গেছে। বাবা প্রায়-স্থবির। মা-ও বুড়ো হয়েছে। ওদের ফাঁকা বাড়িতে অন্ধকার যেন চেপে বসেছে। এই অঙ্কে তাই অন্ধকারের প্রচুর ব্যবহার আছে। ছেলে বাড়ি ফেরে অন্ধকারে ভূতের মত। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে সত্যিই ত এমন কত তাজা ছেলে ভেঙে চুরে গিয়েছিল। প্রথমে তাই একটা কালো ছায়ার মত তাকে ঘরে ঢুকতে দেখি। তারপর গভীর রাতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় তার। সন্তর্পণে আলো-অন্ধকার মিক্স করে করে সেই মুহূর্তগুলো ফোটাতে হয়। শেষ মুহূর্তে একটা চেয়ারের বাঁকা ছায়ার মধ্যে বাপ-ছেলে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। রান্নাঘরে তখন মায়ের ঘর উনুনের আলো। সেটের পরিকল্পনা ইন্টেলিজেন্ট হয়েছিল। একটা রান্নামঞ্চে থাকে। তার উনুন, স্টোভ মিলে নিজস্ব উষ্ণ আলোর একটা পরিমণ্ডল আছে। তার সঙ্গে ঘরের আলোর কন্ট্রাস্ট এবং হারমণিতে অনেক প্যাটার্ন তৈরি করতে সাহায্য হয়।

নাটকটা হবার পর অনেকদিন পরে আমায় একজন জিজ্ঞেস করল একদিন, শুনেছি 'বেলা অবেলার গল্প' খুব ভাল হয়েছে। আপনি দেখেছেন ? আমি বললাম, আমি দেখিয়েছি। ভদ্রলোক প্রথমে ভাল বুঝলেন না। পরে বুঝলেন। 'আমি দেখিয়েছি' মানে আলোয়ই দেখায়। মঞ্চে কী দর্শক দেখবে, কতটা দেখবে, কতক্ষণ দেখবে, কী দেখবে না, এর নির্বাচন যে নির্দেশক আলোক নির্দেশক বা দুজনে মিলে করে, সেইটাই ত দর্শকের দেখাকে নিয়ন্ত্রিত করে, গাইড করে। অশোকের সঙ্গে এই প্রথম বড় কাজ করলাম। অভিনেতা হিসেবে ওর অনেক ভাল কাজ দেখেছি। নির্দেশকের কঠিন ভূমিকাতেও দেখলাম সহজভাবেই করে গেল। একটা নতুন এবং শক্ত নাটক করার চাপ ছাড়াও ওর ওপর তখন দল-ভাঙা জনিত চাপও কাজ করছিল। তবু ওর পয়েজ নষ্ট হয় নি। দেবাশিসের কাজও খুব ভাল হয়েছে। বিশেষ করে দুটি গানের ব্যবহার খুব ভাল হয়েছে। বামপন্থী

নাটক, সুতরাং আই. পি. টি. এ.-র গান দেওয়া হবে, এই ভাবনার বদলে 'পৃথিবী আমারে চায়' এবং 'সাত ভাই চম্পা' গান দুটো খুবই সুপ্রযুক্ত হয়েছে। সময়কে তৎক্ষণাৎ মনে করিয়ে দেয়। এক লহমায় তিরিশ বছর পিছনে চলে যায় মন। শক্তি সেন,যথারীতি তার সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। অনেকদিন পরে একটা ভাল টিমও ওয়ার্কের ফসল, একটা টোটাল থিয়েটার এক্‌স্‌পিরিয়েন্স।

অশোককে বলেছিলাম, 'বেলা অবেলার গল্প' নামটা ছেঁটে 'বেলা অবেলা' করে দাও। কদিন আগে দেখা হতে অশোক সেই কথার সূত্র ধরে বলল, তাপসদা, আপনার কথাই ঠিক হয়েছে। সবাই এখন নাটকটার কথা বলতে 'বেলা অবেলা' বলেই রেফার করে, পুরো নাম আর বলে না। আসলে বাংলা নাটকের অবেলায় এই নাটক ভরসা জুগিয়েছিল। আন্তরিক ভাবে একটা সিরিয়াস কাজ করলে এখনও তা অভিনন্দিত হয়, এইটুকুই আশার কথা।

আমারই চেতনার রঙে

আমরা কত কিছুই দেখি, কত কিছুই শুনি। এই দেখাশোনা ছাড়াও কয়েকটি অনুভূতি আমাদের আছে। যেমন, ঘ্রাণ-স্পর্শ-স্বাদ। আমাদের দেখাশোনাটা নিয়ে সচরাচর আমরা খুশিই থাকি, যদিও খুশি থাকা বোধহয় উচিত নয়। এই যে এখন লিখছি—ঘরের ভেতর ঘরের বাইরে কত শব্দ কত আওয়াজ, অথচ সেসব ঠিক শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। কেননা, অনেকগুলো ত্রুটি নিয়ে তৈরি আমাদের এই সচেতনতা। আমরা ভুলে যাই ; যদি না-যেতাম কত গাদা-গাদা স্মৃতি ধাক্কাধাক্কি করত মনের মধ্যে। আমার বাবা আমার মা তাঁদের মা-বাবা—এদের সকলের মৃত্যু, যত রকম দুঃখ-শোক সব মিলে মনটার মধ্যে কী দুঃসহ একটা চাপ সৃষ্টি করে রাখত। এটা ত্রুটিই তো। আবার, এক অর্থে গুণও বটে। ত্রুটি বা গুণ যাই হোক না কেন, এটা আছে। আছে বলেই যতটা দরকার মনে রাখতে পারি, বাকিটা ভুলে যাই। কিন্তু, সত্যিই কি সব ভুলি? কখনো-কখনো যে যা ভুলে গেছি বলে মনে হয় তাও স্মৃতির অতল থেকে ভেসে উঠে আসে দেখি। কান দিয়ে যা ঢোকে মন দিয়ে তার কিছুটা শুনি। তেমনি চোখে যা পড়ে তার কিছু-কিছু দেখি মনের আয়নায়। বলি, চলচ্চিত্র। কিন্তু, যা দেখি তা চলন্ত চিত্র নয়, স্থিরচিত্র। একটা ছবি—তারপর কিছুক্ষণ অন্ধকার। তারপর আসে পরের ছবিটা। ছবিতে দেখি একজন তার হাতটা তুলছে। হাতটা একটু তুলল, তারপর কিছুক্ষণ অন্ধকার, তারপর হাতটা আরেকটু তুলল। সব স্থিরচিত্র—একের পর এক। এই স্থিরচিত্রগুলো যখন পরপর দেখি তখন মাঝখানের ওই অন্ধকার ওই বিভাজনগুলো দেখতে পাই না—টের পাই না। এটা একটা ত্রুটি। পারসিস্‌টেন্‌স্‌ অব্‌ ভিসন্‌—দৃশ্যকে আঁকড়ে থাকা। ওই যে, হাতটা যখন নিচে আছে, ওই অবস্থানটার সঙ্গে পরের ফ্রেমে অরেকটু ওপরে উঠে-যাওয়া হাতের অবস্থানটা মনের মধ্যে যোগ করি। এইভাবে ফ্রেমের পরে ফ্রেম—এক সেকেণ্ডের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ সময়ে একটা করে ফ্রেম—দেখি আর মনেমনে গেঁথে যাই। আর, হাতটা নিচ থেকে ওপরে উঠে আসে 'নিমেষে'। একটা পাখি উড়ে গেল। কী দেখব? পাখিটা দাঁড়ে বসে আছে, তারপর একটু দূরে, তারপর আরেকটু। তিনটে চারটে পঞ্চাশটা অবস্থান, মাঝে অনেকগুলো ফাঁক—অন্ধকারের ফাঁক। আমাদের মন এই ফাঁকিটা তৈরি করে, ধরতে দেয় না ফাঁকগুলো। টেলিভিশনের পরদায় অনেকগুলো ডট্‌ দিয়ে ছবি তৈরি হয়ে ওঠে—অনেক ডট্‌স্‌। আমাদের ওই আঁকড়ে-থাকার প্রবণতার দরুন ছবি নড়াচড়াটা চলতে থাকে।

শোনার ব্যাপারেও তেমনি। আমরা যা শুনতে চাই তাই শুনি। এই যে এই মুহূর্তে ঘরের বাইরে এত পাখি ডাকছে সেটা ঠিকঠিক কানে আসছে না। আসলে আমাদের দেখাশোনাটা চলে বাছাই করে। চোখ বাছে, কান বাছে। রাতে দূরের ট্রেনের আওয়াজ

পাওয়া যায়, দিনের বেলায় অন্য আরও নানা শব্দের সঙ্গে তা মিশে থাকে। রাতের নিস্তব্ধতায় ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। সাইলেন্সটা যে কী তা বুঝতে পারি। একটা পিচে শব্দের কম্পন আমাদের কানে কাজ করে, অন্যগুলোকে বাতিল করে দিই। এখন যদি খুব জোরে ডেকে ওঠে একটা কাক তা শুনতে পাব, কিন্তু আমি লিখছি আর সারাক্ষণ যে কাক ডেকে চলেছে সেটা খেয়াল করছি না। টেপ করে যদি বাজানো হয় মনে হবে চিড়িয়াখানায় পাখির খাঁচার মধ্যে যেন বসে আছি কিংবা যেন হিচককের "বার্ড্স" ছবিটার কোনো সিচুয়েশন। আর, একথাটা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে গেল আমাদেব চোদ্দপুরুষের গল্প—মানুষের অ্যান্‌সেস্‌ট্রাল স্টোরি। প্রাণের সূত্রপাতটা সমুদ্রের তলায়। সেই সেল্‌ থেকে ধাপে-ধাপে জলজ প্রোটোজোয়া হল, তাবপব হল অ্যামিবা। তাবপর প্লান্ট্‌ লাইফ এল—শ্যাওলা। তারপর জলচর হল। জল থেকে ডাঙায় গেল, আবার ডাঙা থেকে জলে এল—হল উভচর। উড়তে চেষ্টা কবল। এমনি করে অনেক বির্বতনের পর "মানুষ" নামে একটা জন্তু হল, যাবা দুপায়ে দাঁড়াতে পারে। হাত দুটো—অর্থাৎ, সামনে যে দুটো পা ছিল তার চরিত্র বহু লক্ষ-লক্ষ বছর ধবে বদলাতে-বদলাতে হাত হল। কোনো একটা সময়ে হল। কিন্তু 'সামনেব পা' মানে কী। মুণ্ডুটা সবচেয়ে জরুরি—সবচেয়ে জটিল। ওটাই হেড-কোয়ার্টার। চোখ দুটোও সেখানেই। তাই, সেই মাথার কাছাকাছি যেটা সেটা হল সামনে। সামনে আব পেছনেব ধাবণাটা এই থেকেই। যাই হোক, ওদুটো আব পা রইল না, হাত হয়ে গেল। তার প্রত্যন্তে যে প্রত্যঙ্গ তাকে বলি আঙুল। এই আঙুলে একটা বিচিত্র বদল ঘটল। সমস্ত জীবজন্তুর পায়ের আঙুল সমান্তরাল। আমাদের হাতেরও চারটে আঙুল সমান্তবাল, কিন্তু বুড়ো আঙুলটা অন্যরকম—সেটা অপোজেব্‌ল্‌। এই অপোজেব্‌ল্‌ থাম্ব্‌ দিয়ে যে কোনো একটা জিনিস ধরা যায়।—আঁকড়ানো যায়। আমাদের পিতৃপুরুষ সেইসব আর্‌বোরিয়াল প্রাইমেট্‌স্‌—তারা ডাল ধরে একগাছ থেকে অন্য গাছে বিচরণ করতে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য পাথর তুলে ছুঁড়ে মারতে পাবত এরই সাহায্যে। আর, দু পায়ে ভর রেখে দাঁড়াতে পারার ফলে তার দেখার ধরন—পয়েনট অব ভিউটা গেল বদলে। এই ব্যালানস করে দাঁড়ানোটা যে কী তজ্জব ব্যাপার আমরা তা ভেবে দেখি না। সাইকেল চালানো—সেটাও কী তাজ্জব! আমরা ভাবি না—অভ্যস্ত হয়ে যাই। একটা মড়াকে দাঁড় করিয়ে দিলে সেটা দাঁড়িয়ে থাকে না পড়ে যায়। কিন্তু মানুষ পারে। কত শক্ত কাজ। ব্রেইন্‌ থেকে কতগুলো নির্দেশ কতগুলো মাংসপেশীর কতরকম সঙ্কোচন-প্রসারের আব সমন্বয়ের পরিণামে সম্ভব হয় এই সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা। আর, তার ফলে আবার—অর্থাৎ এই দাঁড়াতে পারার ফলে বদলে যায় পয়েনট অব ভিউ। আমাদের সেই পূর্বপুরুষ পেরেছিল সামনের দিকে অনেকখানি মেলে দিতে তার দৃষ্টিকে, দেখেছিল আকাশে সূর্য-চন্দ্র-মেঘ। অবাক হয়েছিল। প্রশ্ন জেগেছিল মনে একের পর এক। ভাবতে শুরু করেছিল। আর, হয়ে উঠেছিল হোমো-স্যাপিয়েনস।

কিন্তু, আরেক রকম "দেখা" আছে। আমাদের সকলেরই। জীবনে কত কিছু ঘটে, কত কিছু দেখি-শুনি-ভাবি, হয়তো সচেতনভাবে ভাবি নি, হয়তো হয় নি—হবেও না কোনোদিন—এমনই কত কিছু নিয়ে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি আমরা। স্বপ্নগুলো কী?

ফ্রয়েড এবং অন্যরাও বলেছেন এগুলো আমাদের অবচেতনে কিলবিল করতে-থাকা কতকগুলো দমিত ভাবনা-চিন্তার একরকম 'প্রকাশ'। আবার অন্যেরা বলেন, এগুলো হল আমাদের নিউরোন-এর সেল থেকে সেল-এর ধাক্কাধাক্কি-খোঁচাখুঁচির মধ্য দিয়ে কতকগুলো 'বহিঃপ্রকাশ'। স্বপ্ন ভিসুয়াল, স্বপ্ন ট্যাক্‌টাইল। স্বপ্নে ছবি আসে, রঙ আসে, চেহারা দেখি, অনুভব করি স্পর্শ। কথা শুনতে পাই! নিজের ভাষায় স্বপ্ন দেখি বা শিখে-নেওয়া ভাষাতেও। স্বপ্ন যেন একটা অদ্ভুত জগৎ। আধুনিকতম চিত্রশিল্প বা কবিতা থেকেও রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়, ঝাপসা। কিন্তু, প্রায় প্রত্যেক রাতে সেটা আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। টের পাই কখন? তখন ওই একটা সন্ধিক্ষণ—অন্ধকার থেকে আলোতে বা আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়া-আসার সময়—অর্থাৎ, আমাদের ঘুমটা যখন পাতলা হয়ে আসে, তখন এই চিন্তাগুলো আমাদের ক্রমজাগ্রত চেতনার মধ্যে খানিকটা ঢুকে পড়ে। এই যে এখন জেগে আছি—লিখছি, এখনও ওই স্তরটায় কাজ চলছে। চেতনার এমন একটা স্তরে যেখানে আমারই ভাবনায় আমার অবাধ প্রবেশ নেই। 'ভাবছিই না' বলা যেতে পারে। যেমন, হাঁটবার বা সাইকেল চালানোর সময় আমার অজানতেই আমার শরীরের মধ্যে ঘটে চলে কত অসংখ্য প্রক্রিয়া। আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন প্রতিমুহূর্তে গুনে-গুনে নিতে বা ছাড়তে হয় না। যে টাইপ করে সে যেমন XYZABC কোথায় আছে ভেবে-ভেবে টাইপ করে না। তেমনি আমার সাইক্‌-এর মধ্যে ওই স্তরের কাজটা চলতে থাকে। কেবল যখন অন্যান্য চিন্তাটিন্তাগুলো চেতনার মধ্যে সুপ্ত হয়ে পড়ে তখনই ওই অন্যস্তরস্থ ভাবনাগুলো ভুস করে ভেসে ওঠে। "বালক" পত্রিকার জন্য একটা লেখা তৈরি করতে হবে রবীন্দ্রনাথকে, কিন্তু কোনো প্লট ভেবে পাচ্ছেন না। রেলগাড়িতে যাচ্ছিলেন, উজ্জ্বল-আলো কামরায়, ঘুম আসছিল না। প্লট ভাবতে-ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন, একটা মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আর তাই দেখে একটি বাচ্চা মেয়ে তার বাবাকে বলছে 'বাবা, এত রক্ত কেন?' ব্যস, পেয়ে গেলেন বীজ "রাজর্ষি"র। তেমনি, কেকুলে নামে একজন বিজ্ঞানী অনেকদিন ধরে খুঁজছিলেন বেনজিনের ফরমূলা, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। একদিন স্বপ্নে দেখলেন একটা সাপ নিজের লেজটা খাচ্ছে—বৃত্তাকার একটা ছবি, একটা সারক্‌ল্‌। ব্যস! ঘুম ভেঙে উঠে লিখলেন সাইক্‌ল্‌ অব বেনজিন; অটো লুই বলে আরেকজন বের করতে চেষ্টা করছিলেন আমাদের ব্রেইনে যে ট্রানসমিশন হয়—যে ওয়েভ তার চরিত্রটা কী। তা কি ইলেক্‌ট্রিকাল না কেমিকাল? স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু পারলেন না লিখতে। পরের রাতে আবার দেখলেন স্বপ্ন। লিখলেন, সেটা কেমিকাল। এগুলো কী করে হয় আমরা তা সঠিক জানি না। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে একজন একটা খুব সুন্দর তুলনা করেছেন। আকাশে তারা আছে, কিন্তু আমরা সবসময় তা দেখতে পাই না। রাতে দেখতে পাই। তারা, তারাপুঞ্জ, গ্যালাক্‌সি—নেবুলা মিলকিওয়ে কত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দেখতে পাই রাতে—অন্ধকার হলে। পৃথিবী পাক খেয়ে সূর্যের দিকে পেছন ফিরলে তবে। অন্ধকারের এই একটা গুণ। আমাদের বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলো সব বড্ডো ছড়িয়ে রাখে—ঝলসে দেয় চারিদিক। কিন্তু, দিনের বেলাতেই গভীর কোনো কুয়ো বা টানেলের মধ্য দিয়ে যদি আকাশের দিকে তাকানো যায় তবে, অনেক সময়, তারা—কিছু-কিছু তারা—দেখা

যায়। তখন বুঝতে পারি, দিনের আকাশেও তারা আছে—থাকে। স্বপ্নও তেমনি প্রতি মুহূর্তে আছে—থাকে। আমার এই জাগ্রত মুহূর্তেও আছে, কিন্তু আমি দেখতে পাই না। পাব টানেলের শেষ প্রান্তে গেলে। চেতনার টোয়াইলাইট জোনে স্বপ্নগুলো সঞ্চরণশীল। জে. ডবল্যু. ডুন বলেছিলেন, 'Dreams are perpendicular extension of time'। এই টাইম আর স্পেস নিয়ে উথালপাতাল চলছে এখন। এক সময় জানা ছিল আলো সরল রেখায় চলে। রাইমেন্‌স্‌ কার্ভেচারের কথা বলেছিলেন একজন অঙ্কবিদ। তার ওপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন জানালেন স্পেসের কার্ভেচার আর টাইম-স্পেসের পারস্পরিকতার কথা, জানালেন আলোও বাঁকে। বৃহস্পতির উপগ্রহকে লক্ষ করতে গিয়ে জানা গেল সূর্যের প্রচণ্ড ভরের টানে সংলগ্ন স্পেসটাই বেঁকে যায়। আলো কেন বেঁকে এল এই প্রশ্নটায় হোঁচট খেয়েই উদ্‌ঘাটিত হল নতুন সত্য। আমাদের এতাবৎ কালের জ্যামিতির ধারণা—বাস্তবের ধারণা সব এলোমেলো করে দিল এইসব নতুন জ্ঞান। সব যুগেই এমন করে হোঁচট-খাওয়া থেকে পাওয়া গেছে উত্তর। আর, বিস্তৃততর হয়েছে আমাদের চেতনার জগৎ।

আমাদের স্বপ্নগুলো তাহলে ওই দিনের আকাশের তারার মতন। এতে আরেকটা কথা এসে পড়েছে। প্রায় দেড় শ বছর আগে একজন মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন—রাতের আকাশ অন্ধকার হবে কেন! বলেছিলেন, আকাশ তো অন্ধকার হওয়া উচিত নয়। তাঁর নাম হাইনরিখ ওলবার। সবাই হেসেছিল তখন। এঁরই নাম ওলবার্‌স্‌ প্যারাডক্‌স্‌। এই সম্প্রতি জানা গেল ওলবার সাহেব মিথ্যে বলেন নি। আকাশ কোনো সময়েই অন্ধকার নয়। আকাশে আমাদের এই সূর্যের চাইতে হাজারগুণ লক্ষগুণ বেশি আলোকময় তারা আছে। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যায় কত তারা, কিন্তু এত দূবে যে টিমটিম করে। যে যত দূরে তার আলো তত কম বলে মনে হবে। আমরা জানি, আলোর গতি এক সেকেনডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই বিপুল গতিতে চলেও এত কাছের যে সূর্য তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় সাড়ে আট মিনিট পর। আমাদের সবচেয়ে কাছে অ্যানড্রোমিডা, আরো কত গ্রহনক্ষত্র আছে। সূর্য তো নগণ্যপুঁচকে—এই স্পাইরাল গ্যালাক্‌সিটার এক প্রান্তে—এক কোণায় পড়ে আছে। একটা মাঝারি দরের তারা মাত্র। এর থেকে লক্ষ গুণ বড়ো তারা আছে। সূর্যের চারদিকে পুঁচকে-পুঁচকে কয়েকটা গ্রহ ঘুরছে। প্লুটোর পরে এই সৌরজগতের সীমার মধ্যে আর কিছু নেই। কেবলমাত্র মহাজাগতিক "শীতল-নীরবতা"। তার পরে আরেকটা গ্যালাকসি, তারপর আরেকটা। আর, এই সমস্তটা সমস্ত দিক থেকে ছুটে চলেছে মহাবিক্রমে—বিপুল বেগে। আমাদের পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সেই সঙ্গে ঘুরছে নিজের অক্ষরেখায়। সূর্য আর তার কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে যে সৌর পরিবার সেটাও ঘুরছে। আমাদের এই স্পাইরাল গ্যালক্‌সিটাও ঘুরছে মস্ত এক 'ক্যাথারিন্‌ হুইল্‌'-এর মতো নিজের কেন্দ্রের চারপাশে। আর, নক্ষত্র-পুঞ্জগুলো একটা অন্যটার কাছ থেকে কেবলই ছুটে পালাচ্ছে। কতদূরে কী গতিতে পালাচ্ছে তা মাপা হয় রঙ দিয়ে। আলোর কম্পন—ওয়েভ লেংথ-এর একেকটার একেক রঙ। সবচেয়ে বেশি ঠেলে যেটা আমরা তাকে বলি লাল, বলি 'লাল মানে বেশ গরম, সাঙ্ঘাতিক'। আর, সবচেয়ে ঠাণ্ডাটা হল নীল। কিন্তু, আসলে নীল বা বেগুনে রঙের লেংথ সবচেয়ে

কম, কম্পনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। আর, লাল হল দীর্ঘ তরঙ্গ—কম্পনাঙ্ক অনেক কম। ওই দূরদূরান্তের আলোর চরিত্র হল এই যে তা টুকরো-টুকরো, ফলে আলোর ব্যাণ্ড তৈরী হয়, লালের দিকে যত যায় তাকে বলে 'রেড শিফট', আর নীলের দিকে হলে 'ব্লু শিফ্‌ট'। এই লাল-নীলের খেলাটা আমাদের মঞ্চের রঙের খেলা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে কথাটাই ক্রমশ বুঝছি আমি।

ওলবারের প্যারাডক্‌স্ তাহলে যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। বোঝা গেল লোকটা পাগল ছিল না। হুব্‌ল্ প্রতিপন্ন করলেন প্রসারমাণ মহাজগতের তত্ত্ব—দেখালেন সবাই সবার কাছ থেকে পালাচ্ছে। অবিশ্বাস্য আলোকবর্ষ দূরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। এটা আলোকবর্ষ দিয়ে আর মাপা সম্ভব নয়। ইনচি-গজ দিয়ে শার্ট-প্যান্টের মাপ নেওয়া হয়, কিন্তু এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর বা বম্বের দূরত্ব মাপা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অন্য মাপকাঠি। তেমনি। তখন, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এল আরেকটি একক—'প্যার্‌সেক্'। এক পার্‌সেক্ হল ৩.২৬ আলোকবর্ষ। দেখা গেল তাতেও কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন, মেগা-পার্‌সেক্ হল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কূল-কিনারা মিলল না তাতেও। নক্ষত্রপুঞ্জের এই দূরে সরে-যাওয়াটা বোঝানোর উদাহরণটা এই রকম। একটা না-ফুলানো ছোট্টো বেলুন, তার গায়ে পরস্পর সংলগ্ন অনেকগুলো ফুটকি। বেলুনটা ফোলালে দেখা যাবে, বেলুন যত বড়ো হচ্ছে ওই সংলগ্ন ফুটকিগুলো ততই পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যবর্তী স্পেসটা বাড়ছে। তেমনি, আমাদের ওই স্পেস—একসময় যাকে ভাবা হত 'কিচ্ছু না' বলে, বলা হত 'ইথার্'—সেই স্পেসটা ক্রমশ বাড়ছে। প্রসারমাণ মহাবিশ্বে আর প্রসারমাণ আয়তন বেড়েই চলেছে, যত দূরে যাচ্ছে ততই। এত লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে যে তাদের আলো এখনো এখানে এসে পৌঁছতেই পারে নি। তাই রাতের আকাশ অন্ধকার। ওইসব নক্ষত্রপুঞ্জের সবটা আলো একসঙ্গে মিললে তা হল জ্বলন্ত সাদা। তাহলে কি হত? সৌর ব্যবস্থাটা হত না। পৃথিবী হত না। প্রাণ হত না। আমরা থাকতাম না। দেখতে পেতাম না এত তারা আছে। সবটা মিলে একটা ঝলসানো অগ্নিকুণ্ড। ওই ওলবার্‌স্ প্যারাডক্‌স্ থেকেই সমাধান মিলল কেন অন্ধকার হয়, কেন অন্ধকার এত জরুরি আমাদের জন্য। আমাদের চেতনার আলোতে অন্ধকারকে চেনা গেল।

প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে এই গ্রহে। গবেষণা চলছে আর কোথাও হয়েছে কিনা তাই নিয়ে—সার্চ ফর্ একস্‌ট্রাটেরস্‌ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স SETI। কিন্তু, সে আছে কি নেই এখনো জানি না আমরা। 'পাঁচ ভাবনা' নিয়ে আছি আমরা: চোখের দেখা, কানের শোনা, জিভের স্বাদ, নাকের গন্ধ আর ত্বকের স্পর্শ। আমাদের চেনাজানা জগতের মধ্যে এই সচেতনতাই বা আবার কতরকম। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ব্যবস্থা মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট। আমরা চোখে কতরকম বৈচিত্র্য ধরতে পারি, অনেক জীবজন্তু আবার তা পারে না। পুরুষ ভাইপার সাপ লাল দেখে, আর স্ত্রী ভাইপার দেখে হলুদ—আর কোন রঙ দেখতে পায় না। ষাঁড় দেখতে পায় শুধু ধূসর রঙ। মাটাডরের লাল কম্বলের লালটা সে দেখতে পায় না মোটেই। সাপের কান নেই। সাপুড়ের বাঁশির সুর সে শুনতে পায় না, শুধু দেখে বাঁশিটা নড়ছে। আমাদের ভাবনা তো এই সেন্‌স দিয়েই। কড়কড় করে বাজ পড়ল একটা বা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ সবটাই

মাঠে মারা যায় যদি কেউ সেখানে না থাকে। শব্দ যদি কারোর কর্ণপটাহে কম্পন না তোলে ব্রেইনে কোনো তরঙ্গ উঠবে না। এইসব তরঙ্গের কতরকম অনুবাদ হয়। চোখে-দেখা আলোটা, কানে-শোনা শব্দটা, জিভের স্বাদটা, গরম-ঠাণ্ডার অনুভব—সবই হচ্ছে ব্রেইনের মধ্যে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রো-কেমিকাল ইম্‌পাল্‌স্‌-এর যোগবিয়োগ। কী করে দেখি? সোজা বার্‌ দেখি, ব্রেইনে কতকগুলি সেল্‌-এ তা পৌঁছয়। হুবেল্‌ আর ওয়াইজাল্‌ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই কয়েক বছর আগে। জ্যান্ত বেড়ালের মগজে মাইক্রো-ইলেক্‌ট্রোড ঢুকিয়ে দেখা গেছে যখন অনুলম্ব বার্‌ দেখানো হয় তখন ব্রেইনের একটা জায়গায় কতকগুলো কন্‌ফিগারেশন জ্বলে ওঠে। আবার যখন অনুভূমিক দেখানো হয় তখন অন্য জায়গায়, তির্যক দেখানো হলে আবার অন্য এক জায়গায় কন্‌ফিগারেশন হয়। লক্ষ লক্ষ নিউরোনএর মধ্যে ছক রয়েছে কীরকম করে দেখব। তারা ঝিলিক মারে, উলটে-পালটে একটা গড়ন হয় আর আমরা দেখি-শুনি-গন্ধ পাই-স্বাদ পাই স্পর্শ অনুভব করি! এই নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন কেউ-কেউ, বলেছেন—এ হলো গ্র্যান্‌ডমাদার্স সেল থিওরি। এই সন্দেহ, সংশয়, এইরকম প্রশ্ন থেকেই মানুষ পেয়েছে উত্তর খুঁজে বের করার তাগিদ। সত্যকে জেনেবুঝে নেবার প্রেরণা। সেই দু পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর দিন থেকে আজ পর্যন্ত সত্যের দিকে এগিয়ে চলাটা অব্যাহত রয়েছে এইভাবেই।

কূলকিনারাহীন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব তো কিছুই না। একেবারেই 'কিচ্ছু না' মাত্র। তবু, এই কথাগুলো আমরা ভাবতে পারছি। ভাবতে পারছি বলেই তারই চেতনার রঙে চুনি লাল হয়ে উঠেছে, পান্না হয়েছে সবুজ। আর তাই, পঞ্চাশ বছর ধরে মঞ্চের ওপর আলো-অন্ধকার-রঙ নিয়ে খেলা করতে-থাকা আমিও আজ এই মহাবিশ্বমঞ্চের রঙ-আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তার দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছি এক অবোধ শিশুর মুগ্ধ-বিস্ময় নিয়ে।

নাটক ও আলো

সভ্যতার সেই প্রথম লগ্নক্ষণ থেকে সূর্যকে নিয়ে বিস্ময়। সূর্য কি, কেন, আর উত্তপ্ত এই আলোক বিকীরণই বা হয় কি করে বা যখন রাত্রি নামে, তখন চাঁদের আলোক বিকীরণই বা উত্তপ্ত নয় কেন—এমনই নানান প্রশ্ন মানুষের মনে নিরন্তর নাড়া দিয়ে যেত। সেটা সভ্যতার উদয়কাল, তারপরে অনেক কিছুর সাথে জীবনের অনুষঙ্গ হিসাবে মানুষ সৃষ্টি করেছে শিল্প। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি। সাহিত্য শিল্পের একটি শাখা নাট্যশিল্প। যদিও অন্যান্য শিল্পের সুসমঞ্জস্য মিলনের ফলে তিলোত্তমারূপী এই শিল্পকে চরিত্রের দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা বর্তমানে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক নাট্যশিল্পের অন্যতম অঙ্গ—আলো, নাটকে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

নাট্যশিল্পের শুরুকাল থেকেই আলো নাট্য প্রযোজনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। চোখ যেমন মানুষকে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন অবলোকন করায়। তেমনি আলোও নাটকের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন দর্শককে অবলোকন করায়। আজকের মত সেদিন নাট্যশিল্প শিল্পসজ্জার তুঙ্গে আসীন হয়নি, সেইকালে—যখন আমাদের দেশে সঙ্, পালা, পাঁচালীর কথকতা, যাত্রা বা বিদেশে ঐ অনুসারী প্রথার প্রচলন ছিল—সেইকালেও নাট্যজাত ঐসব আনুষঙ্গিকও অল্পবিস্তর আলোর উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি প্রাচীন গ্রীস বা মধ্যযুগের ইংলণ্ডে অনেক নাট্য প্রযোজনা অনুষ্ঠিত হত দিনের বেলা, সূর্যের কিরণে। সরাসরি সূর্যের আলো গ্রহণ করে তাতেই হত নাট্যানুষ্ঠান। ফ্রান্সিস ফার্গুসনের নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, সেক্সপীয়রের থিয়েটারেও এই প্রথার অল্পবিস্তর প্রবর্তন ছিল। শুধু তাই নয়, নাট্যবস্তু বিশ্লেষণে কিংবা ঘটনার সূত্র নির্ধারণেও এই আলো কে নানা কৌশলে তখন ব্যবহার করা হত। আমাদের দেশেও সঙ্, পালা, পাঁচালীর কথকতা বা যাত্রার আলোর কৌশল বিশেষ না থাকলে আলো ছিল অন্যতম আনুষঙ্গিক। আলো বাদ দিয়ে এসব অনুষ্ঠান হত না জমতোও না।

তারপর যুগ পরিবর্তনে প্রয়োজনার অন্যান্য আনুষঙ্গিকের মত, আলোরও উন্নয়ন হয়েছে। দিনের আলোকধারা ত্যাগ করে রাতের আসরে স্থান নিয়েছে অনুষ্ঠান। আগে যেখানে ডেলাইট, হ্যাজাক, লণ্ঠন ছিল আলোক কৌশলের উপকরণ এখন সে স্থান নিয়েছে বিদ্যুৎ। আর্ক, ডিমার, স্পট, ফ্লাড, প্রোজেক্টার ইত্যাদি।

এখন কথা হচ্ছে—নাটকে আলোর প্রয়োজনটা কেন? কিংবা ঘুরিয়ে বলা চলে আলোর দ্বারা নাট্য প্রযোজনা কতটা সফল হয়?

মনে রাখা প্রয়োজন যে আলো এমন একটা জিনিস যার একটা নিজস্ব প্রচণ্ড শক্তি আছে, গতি আছে, রূপ আছে। এই শক্তির বলে আলো নাট্য বস্তুতে আনুষঙ্গিক হয়েও অন্যান্য বস্তু বা উপকরণকে একতাবদ্ধ করে। আলোর অন্যতম ধর্ম হল যা অন্ধকার

তাকে পরিস্ফুট করা আবার এই দুই রূপকে প্রয়োজন মাফিক প্রয়োগ করতে পারে এক মাত্র আলো। বাস্তবধর্মী নাটকের সাথে ঐতিহাসিক বা ঐ ধরণের নাটকের আলোর প্রয়োগ অবশ্যই ভিন্নতা থাকে। ঐতিহাসিক নাটক যুগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশী; কিন্তু বাস্তবধর্মী নাটকে যুগ-কাল ছাড়াও স্থান পরিবেশ-সময় ও নাট্যবস্তুর উপর সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। নাটকের চরিত্র ও তার অবস্থান, তার অর্থনৈতিক অবস্থা, সুখ-দুখঃ-ব্যথা বেদনা-আশা সবকিছুর উপরই আলোক ব্যবহার বিভিন্নতা নির্ভরশীল। মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তার উন্মেষ ঘটছে, তার পরিবেশ ও সমাজের প্রভাবে তার মনে প্রতি ক্ষণে নানা রকম দ্বন্দ্ব চলছে, সংঘাত ঘটছে, পরিবর্তন আসছে—এই দ্বান্দ্বিক ও সংঘাতময় রূপগুলো সুচারুভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে আলো। সময়-কাল-পরিবেশ ও চরিত্রের অবস্থানুযায়ী আলোর বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। নাট্যশিল্পে—যেমন মঞ্চসজ্জায় বৈচিত্র্য ও বর্ণের অনুমাপ থাকে তেমনি বিভিন্ন বর্ণের আলো মঞ্চ উপকরণ, চরিত্র ও কাল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তাছাড়া চরিত্রের মানসিকতাও (mood) প্রকাশ করে। সঙ্গীত যেমন মনের অনেক অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশ করে, তেমনি আলোও এই কাজের অন্যতম সহায়ক। জীবনের অন্ধকার দিক আলোর দিক একমাত্র নাট্য বস্তুতে অস্পষ্ট থাকলেও বলিষ্ঠভাবে নির্দেশ করতে পারে আলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে স্থান-কাল-পরিবেশের সাথে সাথে আলোর প্রয়োগ ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অন্যান্য আনুষঙ্গিকের যখন যেমন পরিবর্তন আবশ্যক হয় আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন আসে। চরিত্রের বিভিন্ন দিক ঠিক ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (situation) -কে একসূত্রে গ্রন্থিত করে, দর্শকের মনের দরজায় কখন বৈচিত্র্যে সম্ভারে, কখন তরঙ্গাকারে কখন নীরবে পৌঁছে দেয় আলো। অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চরিত্রের চরিত্র অনুযায়ী আলোক প্রয়োগে বৈপরীত্যও থাকে। আলোর রঙ, মণ্ডলী, ব্যবহার ও দূরত্বের ব্যবধানও নাটকের অন্তর্নিহিত অংশে পৌঁছাবার সাহায্য করে। নাটকে বাহ্যতঃ যা সত্য শুধু তাই নয় আর কিছু সত্য, আর কিছু ভাবনা দর্শকের কাছে হাজির করে আলো।

আলোক প্রপাতেরও একটা ছন্দ বা গতিময়তা আছে। বিক্ষিপ্ত বা অচিন্তিত প্রয়োগ বা শুধুমাত্র আইডিয়া বিহীন কৌশল নাট্য প্রযোজনাকে খর্ব করে। শব্দ সঙ্গীত-অভিনয়-দৃশ্য ইত্যাদি নাটককে যে গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলে আলো সে ক্ষেত্রে সেই গতিকে আরও গতিময় করে তোলে। কোন সংঘাত মুহূর্ত সৃষ্টিতে, পরিবেশ রচনায় বা নাটকীয় পরিণতিতে (climax) এই সত্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও এলোপাথাড়ি আলোক প্রয়োগে ফল ঠিক এর বিপরীত হয়ে পড়ে। সেইজন্য অভিনেতা যেমন প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি সংলাপের অন্তর্নিহিত এ্যাকশন সন্ধান করেন ও ঠিক ঠিক মত দর্শকের জন্য প্রয়োগ করেন, তেমনি আলোক প্রয়োগকার আলোকপাতের সেই এ্যাকশন সন্ধান করে সেই অনুপাতে প্রয়োগের চিন্তা করেন। বাস্তবধর্মী নাটক যেমন স্টেজের সমস্ত চৌহদ্দি পেরিয়ে দর্শকদের একই অনুভূতির বীজ ছড়িয়ে দেয়, তার মনের স্পর্শ করে—তেমনি আলো শুধুমাত্র আলো না থেকে এক মোহ বিস্তারীরূপে স্টেজের চৌহদ্দি পেরিয়ে দর্শকের চোখে নয় মনকে যখন স্পর্শ করে তখনই আলোর সার্থকতা।

এ যুগে আলোর প্রয়োগরীতির বিস্তার পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে। অবশ্যই বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই উন্নতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এ দেশে বিজ্ঞানের অগ্রসরতা তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ, তার প্রভাব আলোক রীতিতে দেখা যায়। আলোর যাবতীয় যন্ত্রপাতির অধিকাংশই এখন বিদেশে তৈরি হয়। স্বভাবতঃই বিদেশে সৃষ্ট যন্ত্রপাতির জন্য এদেশের রঙ্গালয়ও মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। বিদেশের নাট্যালয়ে আলোক বিন্যাস যতটা অগ্রসর হয়েছে সেই তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। বিদেশের যে রঙ্গালয়গুলিতে আধুনিক নাটক অভিনয় হয়ে থাকে তার নির্মাণ কৌশল ও মঞ্চ ব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের তুলনাই হয় না। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি পশ্চিমের দেশে নাটকের এত বেশী অংশ জুড়ে আছে যা আমাদের দেশে নেই। স্বভাবতঃই বাংলা দেশে অনেক সময় অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কাজ করতে হয়। এই সীমাবদ্ধতায় যদি সত্যি সত্যি কোন বৈজ্ঞানিক প্রকরণের ব্যবহারও হয় তা আমাদের দেশের অবৈজ্ঞানিক নাট্য-পণ্ডিতদের গায়ে দাহন সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক 'অঙ্গার' নাটক এর উদাহরণ।

গণনাট্য আন্দোলনের জন্মকাল থেকে নাটকের ক্ষেত্রে যে নতুন ভাবনা দেখা দিল তা সবিশেষভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হল। আগে পেশাদারী মঞ্চে যে গৎ বাঁধা আলোক কৌশল ছিল (যেমন নাচ হলেই বিভিন্ন বর্ণের আলো ঘোরানো হত। নায়ক নায়িকা বা চরিত্রের প্রত্যক্ষ ভাবে চড়া আলোর স্পট ব্যবহার হত) গণনাট্যের নতুন ধারা তাতে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করল। আলো যে প্রযোজনার একটি বিশেষ অংশ তা সেই কালেই এদেশের নাট্য যজ্ঞের কর্মীরা অনুধাবন করতে শুরু করল। আলো শুধু আলোর চমকের জন্যই নয়—নাটকের জন্য একথাও বুঝিয়ে দিল গণনাট্য আন্দোলন। অত্যন্ত সহজভাবে বিনা আড়ম্বরে নাটকের অব্যক্ত অনেক দিকই তুলে ধরল আলো। বাংলা রঙ্গমঞ্চে আলোর ক্ষেত্রে ঐটাই নবকাল। সেই নবকালের মন্ত্র নিয়ে এসেছে নতুন নতুন নাটক, নতুন প্রয়োগ রীতি। আলোকেও তাই নতুন নতুন কায়দায় আসতে হয়েছে মঞ্চে। পুরানো ধ্যান ধারণা, চিন্তা সব কিছুকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বিজ্ঞানের সযত্ন লালিত ফসলকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঞ্জীবিত হয়ে আলোকে আসতে হয়েছে এই দশকে। তাই এই দশকের আলো যদি কোন ক্ষেত্রে নাটকের চেয়ে বেশি অগ্রবর্তী হয়, তবে তার দোষারোপ আলোর উপর পড়া উচিত নয়—পড়া উচিত রোগজীর্ণ নাটকের উপরেও।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কোন কোন পেশাদারী রঙ্গালয়ে নাটকে নাট্যবস্তুকে খর্ব করে দিয়ে আলোক কৌশল সম্পূর্ণ অন্য পথে চলে গেছে এ ক্ষেত্রে হয়ত আলোক প্রয়োগকারের চিন্তার দৈন্যতা বা নাট্যভাবনা থেকে বিযুক্তি কারণ হতে পারে কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ যেটা—তা হল ব্যবসায়িক সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে তাকিয়েও কোন কোন রঙ্গালয় মালিক হয়ত আলোর এই চমক-জাদু মঞ্চে প্রপাত ঘটাতে পারেন। কেন না সাধারণ দর্শকরা আমাদের দেশে এখনও একই ক্ষেত্রে থেকে নানান সাধ আহরণ করতে চায়। স্বভাবতই দর্শককে হতভম্ব করে দেওয়ার জন্য, তার মনে চমকের বজ্রপাত ঘটাবার জন্য, বিস্ময়ের তরঙ্গ তোলার জন্য আলোকে ভেল্কির মন্ত্রদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়—যেমন ব্যবহার করা হয় চটকদারী গান, চোখ ধাঁধানো মঞ্চসজ্জা, কোন কোন

ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অতি অভিনয়ের তুফান তুলে বা সস্তা সেন্টিমেন্টের প্যাঁচ কষে। এ সবগুলিই ব্যবসায়িক কায়দা। আর এ কায়দার মধ্যে প্রতিযোগিতাও আছে।

অপেশাদারী প্রগতিশীল নাট্যদলগুলি এই কায়দা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। মুক্ত কেননা—প্রথামতঃ প্রযোজনার জন্য যে অবশ্যিক ব্যয় বহুর তাতে এই চমকের দিকে নজর দেয়ার মত অবস্থা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু সস্তা হাততালির কায়দা থেকে নিরস্ত হতে হয়। সর্বোপরি নাটকে নতুন কথা, প্রযোজনার উৎকর্ষতা সম্পর্কে এরা যতটা চিন্তাশীল হন ঠিক সেই পরিমাপেই আলোক ব্যবহার ও উৎকর্ষতার অগ্রগতি ঘটে থাকে।

একদা সূর্যের আলোক বিকিরণে কিংবা চন্দ্রালোকিত পূর্ণিমা বন্যায় মানুষের মনে যে বিপুল জিজ্ঞাসা জেগেছিল সেই অন্তহীন জিজ্ঞাসাকে শিল্পকলায় শ্রীমণ্ডিত করে নব নব অর্থে, নব নব রূপে মানুষের মনে অনেক দ্যোতনা বিস্তার করে আলো আজ শুধু আলো হিসাবেই সমাসীন নয়, জীবনের অলো হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত।

কিছু মানুষ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

সতু সেন

বিগত যুগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের মহান প্রয়োগাচার্য এবং আধুনিক নাট্যভাবনার এক প্রধান পুরুষ সতু সেনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্ক ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠ। অপরিমেয় স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছে। শেষের দিকে, যখন তিনি শরীরের দিক থেকে অনেকখানি অপটু হয়ে পড়েছেন, তখনও আমার কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। সত্যিকারের আধুনিক মানুষ ছিলেন তিনি। থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন আন্দোলনে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। নাট্যজগতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনে, যেমন নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল-বিরোধী আন্দোলনে আমরা সবাই তাঁর উপদেশ ও সহযোগিতা লাভ করেছি।

সতু সেন শুধু প্রথমই নন, একমাত্র ভারতীয়, যিনি দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যে হাতে-কলমে আন্তর্জাতিক নাট্যরীতি শিক্ষা করেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালকদের মহড়াকক্ষ থেকে পাঠ নিয়েছেন। আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশে বিশ শতকের প্রথম পর্বে নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে নতুন জোয়ার এসেছিল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের দুর্লভতম সুযোগ তাঁর হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিনিই একমাত্র ভারতীয়, যিনি একান্ত তরুণ বয়সে নিউইয়র্কের একটি বিখ্যাত নাট্যমঞ্চে পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। উডস্টকে (Woodstock Play-house) একটি নতুন থিয়েটার প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতীয় নাট্যকলার প্রতিভূ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর নাট্য সংস্থাকে পাশ্চাত্যের নাট্যামোদীদের কাছে পরিচিত করার জন্য তাঁর একক ভূমিকা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সতু সেন মঞ্চে নাটকের উপস্থাপনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। নাটককে তিন ঘন্টার সময় সীমার মধ্যে বেঁধে দেয়া, মনস্তত্ত্ব-সম্মত আলোকসম্পাত, বিভিন্ন নৈসর্গিক পরিস্থিতির মঞ্চ রূপদান, ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ, শোভন শিল্পরুচির সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার মিশ্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলির উদ্ভাবনা এদেশে তিনিই প্রথম করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ঝড়ের রাতে', 'মহানিশা', 'চরিত্রহীন', 'দুই পুরুষ', 'কামাল আতাতুর্ক' ইত্যাদি প্রযোজনার নাম বিশেষভাবে করা যায়। সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের একজন পরিচালক হিসাবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর শিল্পী জীবনের ইতিহাস স্বার্থহীন, কঠোর সংগ্রামের ও অধ্যবসায়ের ইতিহাস। মঞ্চে আলোকসম্পাতের কাজে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার দরুণ আমার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে তাঁর অবদানগুলি কতখানি ধনী করেছে।

তিনি যে সময়ে এদেশে আলোকসম্পাত ও মঞ্চ স্থাপত্যের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন,

সে সময় প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রঙমহল থিয়েটারে যুক্ত থাকার সময় আমি একটা কক্ষে কালের ধুলোয় জীর্ণ নানা ধরণের যন্ত্রপাতি দেখতে পাই। আমার ঔৎসুক্য বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরিণত হয় যখন জানতে পারি সে সব কিছুই সতু সেন আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলকে প্রকাশ করার জন্য নিজের পরিকল্পনা-অনুযায়ী নির্মাণ করেছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় এদেশে আজ পর্যন্ত নাট্য-সংক্রান্ত কোনো মিউজিয়ম গড়ে ওঠেনি, যেখানে বিগত যুগের শিল্পীদের কাজকর্মের নিদর্শনগুলিকে রক্ষা করা, সেগুলির মডেল বা আলোকচিত্র একালের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সতু সেন ছাড়াও সেকালের পটলবাবু, নানুবাবু প্রভৃতি প্রয়োগবিদরা কি অবদান রেখে গেছেন, তা সাধারণের পক্ষে জানার উপায় নেই। সেকালের কথা তো বাদই দিলাম, এই সেদিনের বা অনতি-অতীতের অঙ্গার, কল্লোল, রক্তকরবী ইত্যাদি মঞ্চসফল নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের চরিত্রে কি ছিল, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নাট্যানুরাগীরা তা উপলব্ধি করারও কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না বা পাবেন না। এ সব কিছু মূলেই আছে আমাদের ইতিহাসচেতনা, শিল্প-রীতির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। একথা তাই অনেকেরই জানা নেই যে, মঞ্চ, নাটক ও থিয়েটার সংক্রান্ত বিষয়গুলি সতু সেন কেবল আত্মস্থ করেন নি, অসংখ্য নাট্যকর্মী ও নাটক বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রী তাঁর পদতলে বসে আলোকসম্পাত, মঞ্চকলা এবং অভিনয়-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পাঠ নিয়েছেন সতু সেনের কাছেই। মঞ্চশিল্পী সতু সেনের নাম এক অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকায় ইতিহাসে থাকবে — সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

বিজনদা

রঙমহলে 'রাজদ্রোহী' অভিনয় চলছে। বিজনদা অভিনয়ের আসরে স্টেজের পাশের একটা বেঞ্চেই বেশির ভাগ সময় বসে থাকতেন। ঐ ফাঁকে বিজনদার সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ঠিক করতে কথা বলতে গিয়েছি। বললেন, 'আর বলিস না, বটুক মরে আমাকে একেবারে শেষ করে গেছে। সময়ই পাচ্ছি না। রোজই প্রায় ওর জন্যে একটা দুটো স্মৃতিসভা হচ্ছে, আর আমাকে হয় ভাষণ দিতে নয় সভাপতিত্ব করতে হচ্ছে। বটুকটা ত চলে গেল হঠাৎ কেমন বিনা নোটিশে, একেবারে বটুকের মতই আচরণ, 'just like বটুক!' 'তারপর বিজনদা, আপনিও ত just like বটুক চলে গেলেন। নাকি just-like বটুক and just like বিজন ভট্টাচার্য?' আজ বিজনদাকে নিয়েওত কত সভা, অনুষ্ঠান হচ্ছে, লেখা হচ্ছে। বিজনদা মৃত্যুর ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা 'মরাচাঁদ' অভিনয় করেছিলেন মুক্তাঙ্গনে। তারও দুদিন আগে তপন থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্যকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল, তখন কি কেউ জানত এই তাঁর শেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। বিজনদা নিজেই জানতেন? সেদিন অনুষ্ঠানের কারা উদ্যোক্তা ছিলেন জানি না, কিন্তু শুনেছি সভা চলা কালেই লোডশেডিং-এ অন্ধকার হয়ে যায় হল্ এবং মোমবাতির ক্ষীণ আলোতেই সভার কাজ চলতে থাকে। বিজনদা নাকি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, এই বোধ হয় তাঁর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপযুক্ত

পরিবেশ, ব্ল্যাক আউটের পটভূমিকায় লেখা নবান্নর নাট্যকারের জন্য এটাই যোগ্য অ্যাটমস্‌ফিয়ার। তপন থিয়েটারে সেদিন বিজনদার শেষ সম্বর্ধনা ছিল না, বিজনদার শেষ সম্বর্ধনা বোধ করি বিজনদার স্মরণে রবীন্দ্রসদনে ৩০ জানুয়ারীর সন্ধ্যেবেলা। নবান্ন যুগের থেকে শুরু করে কবচকুণ্ডল পর্যন্ত সমসাময়িক শিল্পী সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষের এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধানম্র সমাবেশ। বিজন ভট্টাচার্য সেখানে বক্তা অভিনেতা সঙ্গীত শিল্পী, তাঁর নাটকের গান চলচ্চিত্রে টিভিতে, নাট্যশিল্প ও আন্দোলন সম্পর্কে ওঁর আলোচনা, আর সব শেষে 'পদাতিক' ফিল্মের শেষে বিজনদার মুখে শেষ কথা "Be brave!" ঐ সন্ধ্যায় যেন একমাত্র শিল্পী, বক্তা, প্রধান অতিথি, সভাপতি—সব কিছুই বিজন ভট্টাচার্য। ইদানীং অল্প কয়েকজন যাদের সঙ্গে বিজনদার যোগাযোগ ছিল তাঁরা শুনেছেন বছরের পর বছর বিজনদার নানা আইডিয়ার কথা, নতুন নতুন নাটকের বিচিত্র পরিকল্পনা, অদ্ভুত সব চরিত্র, বিষয়বস্তুও একেবারে আলাদা মেজাজের।

১৯ বি ডাঃ রাজেন্দ্র রোডের দোতালায় সংকীর্ণ ঘরে বিজনদার নিজস্ব জগৎ ছিল। অতি অল্পজায়গা, তার মধ্যেই রয়েছে নানা জাতের পাখি, সব খাঁচায় রাখা। কাঠবেড়ালী খরগোস এদের সবার চরিত্র নিয়ে বিজনদার কত গভীর interest। ওদের নিয়েই অনেক সময় গল্প বলতেন নানা রকমের মজার। উঁচু খাটের ওপর বিজনদার ওইটুকু ঘরে। নাটকের দলের ছেলেরাও ঐ খাটে মোড়ায় দু একটা চেয়ার টৈয়ারে জায়গা করে নিত। খাটের পেছনে ও সারা ঘরে দেওয়ালে কত অসংখ্য মানপত্র ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত কাছের ও দূরের সব নাট্য ও সংস্কৃতি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া।

অনেক সময়ে এই ঘরেই হত নাট্যচর্চা। আবার কখনও রিহার্সালের জন্য যে সব জায়গায় বিজনদা একেবারে নিজের চেষ্টায় পেয়ে যেতেন তাও কত বিচিত্র। কখনও বালিগঞ্জে সুরতীর্থে। কখনও ল্যান্সডাউন রোডে বিরাট অট্টালিকায় একটি বিশাল ঘর। বিশাল প্রাচীন তার আসবাব পত্র, একমাত্র গৃহস্বামী কোনও কারণে বিজন ভট্টাচার্যের অনুরাগী মানুষ। তাই অতবড়ো ফাঁকা খালি বাড়ীর মধ্যেও বিজনদা তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নিয়মিত জমায়েত হতেন। বিজনদা যখন যে নাটকের কথা ভাবতেন তখন অভিনয়ের আগে সেই সব নাটক সম্পর্কে ওঁর আলোচনা ও ভাবনার রেঞ্জ দেখে অবাক হয়ে যেতাম—হয়ত তার অনেকখানিই একাধিক কারণে পরে অভিনয়ে প্রডাকশনে করা সম্ভবও হত না—কিন্তু তেজের সঙ্গে কী রকম বেপরোয়া করে ভাবতে পারতেন! তার কিছু কিছু হয়ত আরও ভালো করা সম্ভব হতে পারত—সামান্যই হয়েছে, সবটা হয়নি।

গণনাট্য সংঘের পরে নাট্যচক্র, ক্যালকাটা থিয়েটার এবং সবশেষে কবচকুণ্ডলে দেখেছি বিজনদার সঙ্গে একান্ত অনুরক্ত একদল ছেলে। এরা সত্যিই বিজনদাকে ভালবেসেছে। যথাসাধ্য হয়ত করতেও চেষ্টা করেছে, তবুও কেন যেন একটু অপূর্ণতার অনুভূতি থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত। খালেদ চৌধুরী, আমরা সবাই নানা সময় বিজনদার সঙ্গে জুটে কাজ করেছি—অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে নাটক অভিনয় হয়েছে। প্রথমে 'নীলদর্পণ' পরে প্রথম পর্যায়ে ই. বি. আর ম্যানসনে (আজকের শিয়ালদা নেতাজী মঞ্চ) 'মরাচাঁদ', 'কলঙ্ক'। নিউ এম্পায়ারে 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর'। পার্কসার্কাস ময়দানে 'মাষ্টার মশাই' (রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে)। এ্যাকাডেমীতে 'আজ বসন্ত', রবীন্দ্র সদনেও 'কৃষ্ণপক্ষ', 'নীলদর্পণ' (নবপর্যায়ে)

অভিনীত হয়েছে—আবার অনেকদিন ধরে কিন্তু বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কোনও দিন এ নিয়ে আফশোষ করতে দেখিনি বিজনদাকে, একেবারে হতাশও হননি কখনও, প্রতিবারেই নতুন উদ্যমে, উৎসাহে উদ্দীপনায় ওঁকে দেখে কী রকম অবাক লাগত। নতুনভাবে নাটক নামানোর জন্য বিজনদা নতুন ছেলেদের নিয়ে কেমন করে এরকম মাতিয়ে তোলেন, হাজারো কঠিন বাস্তব অসুবিধে সমস্যা থাকা সত্বেও। বিজনদার শেষ অভিনয় 'মরাচাঁদ' নাটক শেষ হলে আমি আর শমীক মুক্তাঙ্গনের ড্রেসিংরুমে গেলাম দেখা করতে। বললেন, কাল কথা হবে। আমরা বললাম, হ্যাঁ, প্রশংসা ও নিন্দা দুইই। বললেন, ভালো এবং মন্দ, আজকের নাটক অভিনয় নিয়ে কালই কথা হবে। আমরা বললাম, রাত হয়ে গেছে, তা ছাড়া আপনিও ক্লান্ত! ঐ অভিনয়ের দিন অনিবার্য কারণে আমার যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। অভিনয় আরম্ভও হয়ে গিয়েছিল, 'মরাচাঁদের' এই প্রথম দৃশ্যের কথা আমার জানা ছিল না। ঢুকেই শুনি একদল বাউল নেচে গাইছে "তুমি তো নও অরূপ রতন শিব সনাতন"। একটু পরেই আবিষ্কার করলাম, ঐ দশ বারো জন বাউলের মধ্যে আছেন বিজনদা এবং তিনিই সব চাইতে প্রাণবন্ত। শুরুতেই সার্থক পবন বাউলের দেখা পেয়ে গেলাম—এবং সেদিনের শেষ দৃশ্যের গান "বাঁচব রে মোরা বাঁচব ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাঙলা গড়ব"—অভিনয়ে গানে ভেঙে পড়া পবন বাউল আর একবার তাঁর জীবনের সমস্ত প্রত্যয় দৃঢ়তা নিয়ে আমাদের মুগ্ধ করলেন ঐ কোরাসে নেতৃত্ব দিয়ে।

বিজনদার মৃত্যুর পর অনেক স্মরণ-সভা হয়েছে এবং হচ্ছে। মৃত্যুর অল্পদিন পরেই স্টুডেন্টস্ হলে গণতান্ত্রিক শিল্পী ও কলাকুশলী সংঘের স্মরণসভা শুরু হতে না হতেই আবার সেই লোডশেডিং। অন্ধকারে মোমবাতি জ্বেলেই সভা চলল। তখন মনে পড়ল কদিন আগে তপন থিয়েটারে আয়োজিত সভায় বিজনদার কথা—ব্ল্যাক আউটের সময় লেখা নাট্যকারের কথাগুলো।

১৮ জানুয়ারী মুক্তাঙ্গনে কবচকুণ্ডল গোষ্ঠীর মরাচাঁদের সময় বিজনদা বলেছিলেন আজকের অভিনয়ের দোষ ত্রুটি সব শুধরে নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারী মুক্তাঙ্গনের অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সবাইকে খাটতে হবে। সেই ২২শে ফেব্রুয়ারী এল, কবচকুণ্ডল 'মরাচাঁদ', অভিনয় করল। নাটক পরিচালনা ও সঙ্গীত বিজন ভট্টাচার্য। প্রায় একমাস পরে, কিন্তু হায় আবার সেই লোডশেডিং। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ওরা দুটো পেট্রোম্যাক্স বাতি জোগাড় করে অভিনয় শুরু করল, সেই শুরুর গান ও বাউলদের নাচ "তুমি তো নও অরূপ রতন শিব সনাতন" আলোয় ছায়ায় গান হচ্ছে। পবন বাউলও নিশ্চয়ই আছেন একজন ওদের মধ্যে, কিন্তু বিজন ভট্টাচার্য নেই। শিল্পীরা গাইছেন নাচছেন, বিজনদা না থাকায় বিজনদার ইচ্ছাপূরণ করবার জন্য তাঁদের পরিশ্রম, ডেডিকেশন—সবই যেন কেমন গভীর হয়ে ফুটে উঠল ঐ হ্যাজাকের আলোয় গানে।

প্রধান সমাদ্দার থেকে পবন বাউল অনেকটা পথ। অনেক সময়, বেশ কয়েকটা বছর। প্রায় চার দশকের অবিরাম চলা। আগুন, নবান্ন, জীয়নকন্যা, মরাচাঁদ, কলঙ্ক, গোত্রান্তর, আজ বসন্ত, কৃষ্ণপক্ষ, গর্ভবতী জননী, চলো সাগরে, হাঁসখালির হাঁস, লাস ঘুইরা যাউক। এবং মরাচাঁদ নবপর্যায়ে, মৃত্যুর ঠিক আগের সন্ধ্যায় মুক্তাঙ্গনে।

তৃপ্তি মিত্র

অনেক দিন আগের কথা—চল্লিশ বছরেরও বেশি, বোধহয় সাতচল্লিশের শেষে বা আটচল্লিশের গোড়ায়, ঠিক মনে নেই। আমি আমার বম্বের পাট চুকিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। বম্বের ভি টি স্টেশনে এসে ট্রেনে ওঠার সময় দেখতে পেলাম, আমার পাশের কামরাতেই মিত্র দম্পতি—শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্র। ওঁদের সঙ্গে তখনও কোন পরিচয় হয়নি। বম্বে থাকতে মাঝে খাজা আহমেদ আব্বাসের 'ধরতী কা লাল' ছবিটি দেখেছিলাম, আরো বিশেষ করে মনে পড়ছিল, পেঙ্গুইনের সিনেমা সংক্রান্ত একটি বই—রজার ম্যানভেলের লেখা, তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের দু'টি ছবির উল্লেখ ছিল। চেতন আনন্দের 'নীচা নগর' ও 'ধরতী কা লাল' এবং এই ফিলমের ফটোও ছিল সেই সঙ্গে। বম্বে থেকে কলকাতার রেলযাত্রার দীর্ঘপথে অনেক ইচ্ছে থাকলেও ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারিনি সংকোচের জন্য। ভারতীয় গণনাট্যসংঘের 'নবান্ন' আমার কাছেও এক অনুপ্রেরণা। সেদিন কি জানতাম তারপর দীর্ঘকাল আমার কলকাতা বাসের অনেকটা সময় শম্ভু মিত্র ও বহুরূপীর নাট্যকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকব? প্রায় বহুরূপীর সূচনাকাল থেকেই কত নাটক করা হল—যার শুরু হয়েছিল নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নাট্যোৎসব—'পথিক' 'উলুখাগড়া' এবং 'ছেঁড়া তার'।

একরকমভাবে আমার বহুরূপীর কাজ শুরু হল তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটকেই। এই নাটকে আসানসোল অঞ্চলে, কয়লাখনির ধারে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশে একটি চা-এর দোকানকে কেন্দ্র করে। তুলসী লাহিড়ী খনিশ্রমিকদের জীবনযাত্রার পটভূমিতে নাটকটি লিখেছিলেন। এই দোকানের মালিক যশপাল (চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে তুলসীবাবু অভিনয় করতেন) এবং তার নাতনী সুমিত্রা দোকানের দেখাশোনা করত। অসীম নামে এক ভবঘুরে সাহিত্যিক সমাজসচেতন আদর্শবাদী তরুণ (শম্ভু মিত্র) সব শ্রমিকদের সংগঠিত করার কথা বলে বা চেষ্টা করে। পরবর্তী কোন দৃশ্যে অসীম ও সুমিত্রা (তৃপ্তি মিত্র)-র কিছু নিভৃত আলাপ আমার কাছে বেশ গভীর ও আবেগপ্রবণ মনে হয়েছিল। পরিচালক শম্ভু মিত্র তার মনোমত দৃশ্যসজ্জার মধ্যে কম্পোজিশানটি আমাকে একরকম করে বুঝিয়ে দেন। আমার মনে হল ওঁর কথাটা আমি বুঝেছি। সেই পঞ্চাশ-একান্ন সালের অপ্রতুল আলো, রিহার্সালের অসুবিধার মধ্যেও ওই দৃশ্যের ভাবনাটা করা হয়েছিল সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুহূর্তে। ওঁদের সেই অল্প আলোছায়ার কিছুটা নীচুস্বরে অভিনয়ের মধ্যে দূরাগত ট্রাকের শব্দ ক্রমে কাছে এসে বেড়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।* এটা তখনকার দিনে করতেন বড়বাবু বলে পরিচিত সুধাংশু কর—গ্রামোফোন রেকর্ডের সাউন্ডবক্সের শব্দের তারতম্যে। তখনও টেপ রেকর্ডারের প্রচলন হয়নি। লরী বা মোটরের শব্দ যখন সবচেয়ে বেশি, তখন পিছনের চটের দেওয়ালে কাটা জানালা দিয়ে শম্ভু মিত্র বা তৃপ্তি মিত্রের চেহারাকে ক্ষণিকের জন্য তীব্র হেডলাইটের আলো উদ্ভাসিত করে মিলিয়ে যেত গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে, একটু হয়ত থেমে ওদের কথা আবার শুরু হত। এই যে হেডলাইটের ঝলকানির আইডিয়াটা, শম্ভুবাবুর সাহায্যে আমরা ব্যবস্থাটা করতে পেরেছিলাম, তারপর থেকে আমার সঙ্গে ওঁদের দীর্ঘদিনের জন্য আলোয় ছায়ায় পথ চলা শুরু হল।

ক্রমে বহুরূপীর কর্মকাণ্ডে আরো যুক্ত হয়ে নানা নাট্য প্রযোজনার প্রয়োজনে আমরা

মিলিত হয়েছি। ওঁদের বাড়িতে—সেটা একাধারে বাড়ি, সংসার, রিহার্সালের ঘর, অফিস ঘরও বটে। নিবেদিত মনপ্রাণ একদল নবীন শিল্পী, তাদের সঙ্গে কলকাতার ট্রাম-ওয়েজের বেশ কিছু শ্রমিক কর্মচারী মিস্ত্রীও ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন মহর্ষি, গঙ্গাপদ বসু, কালী সরকার প্রমুখ। নিয়মিত ঠিক সময়ে সবাই আসতেন বিকেলে, অফিস ছুটির পরে সোজা বহুরূপীর ঘরে। রক্তকরবীর মত বড় মাপের নাটকও ওই ছোটঘরে মহড়া দিয়ে একটামাত্র স্টেজ রিহার্সাল দিয়ে (ই বি আর ম্যানসন ইনস্টিটিউট, এখনকার নেতাজী মঞ্চ) সেই নাটক কলকাতা এবং দিল্লির সর্বভারতীয় নাট্যোৎসবে সাড়া জাগাল। বলা হয় আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারে রক্তকরবী অনেক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমার মনে হল পথিকের সুমিত্রা, উলুখাগড়ার করুণা, চার অধ্যায়ের এলার পর রক্তকরবীতে নন্দিনীকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ ঘটনা। রক্তকরবী যখন তৈরি হচ্ছিল তখন সেই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ছোট্ট শিশু শাঁওলী ও সমস্ত বাড়িঘর রান্নাবান্নার দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে একজনই ছিলেন—তিনি তৃপ্তি মিত্র।

রক্তকরবীর সার্বিক সাফল্যের পর শম্ভুবাবু আবার নতুন নাটক ধরলেন—ইবসেনের 'ডলস হাউস'। মঞ্চসজ্জায় খালেদ ও শম্ভুদা নতুন পরিকল্পনা করলেন। তখন আমাদের সাহস ও ভাবনার মধ্যে শিল্পসম্মত আলো ও পরিবেশ রচনায় দায়িত্বের কথা আরো বেশি করে এসে গিয়েছিল। সম্ভবত সেটি অনেকখানি করাও গিয়েছিল। কিন্তু অভিনয়? ছেঁড়া তারের ফুলজানের হাসিখুশি সরল গ্রাম্য মেয়ের সেই তালাক দেওয়ার দৃশ্যের গায়ে কাঁটা দেওয়া 'আল্লা' চিৎকার কি কোনদিনই ভোলা যাবে, না কথার বর্ণনায় বোঝাতে পারব? সেই তৃপ্তি মিত্রই এবার বুলুর ভূমিকায় চরিত্রের সংশয় ও শেষের দৃঢ় প্রত্যয় কী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন! একজন ছিল অসহায় নারী, অন্যজন প্রতিবাদে দৃঢ়।

আমার মন বারবার চলে যায় রক্তকরবীর নানান দৃশ্যে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, গানে আনন্দ খুশিতে উজ্জ্বল নন্দিনী, মনে পড়ে যক্ষপুরীর জালের আড়ালে রাজার সঙ্গে কৌতূহলী সংলাপ দৃশ্য, কখনও বা বিশুনন্দিনীর দুখ জাগানিয়া, আমার ঘুম ভাঙ্গানিয়া। গানের আগে বিশুর সঙ্গে (শোভেন মজুমদার) আবছা আলো-ছায়ায় একান্ত সংলাপের দৃশ্যটি। আবার পর মুহূর্তেই যক্ষপুরীর শোষণ-যন্ত্রের হট্টগোলে নন্দিনীর আর্তব্যাকুল কান্নায়, সঙ্গীতে, শব্দে, দৃশ্যর আয়োজনে শম্ভুদা, খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে আমরা সবাই কী করে যক্ষপুরীর অত্যাচার-দৃশ্যকে একটা উত্তেজক নাট্য মুহূর্তে আনতে পেরেছিলাম! সেই প্রচণ্ড গোলমালে প্রায় অন্ধকারে নন্দিনীর কথাগুলিকে একজনই অর্থবহ করে তুলতে পারতেন, তিনি তৃপ্তি মিত্র। 'পুতুল খেলা'-তে 'ঝুলন' কবিতার আবৃত্তিতে এমন করে নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স তৈরি করতেন তৃপ্তি মিত্র—আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ওই রকম মোমেন্ট তৈরি করতে কোন শিল্পীকে দেখতে পাইনি, পাব কি না জানি না।

'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় অভিনীত হয়নি। তার অন্যতম কারণ উপযুক্ত নন্দিনী সন্ধান পাননি রবীন্দ্রনাথ। কথাটা কতটা ঠিক জানি না। তবে প্রথম বহুরূপীর রক্তকরবীর অভিনয়ের পর বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডে প্রাথমিক বিরোধিতা বা আপত্তি ছিল। কলকাতা দিল্লী বম্বেতে রক্তকরবী নাট্য-প্রযোজনার যে সমাদর ঘটেছিল তাতে

সবকিছুর মধ্যে নাট্য-প্রয়োগ, অভিনয় তো ছিলই, কিন্তু রক্তরকবীর প্রাণ-কেন্দ্র নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র। অতি সাধারণ চেহারার নন্দিনী কী ভাবে প্রতি দৃশ্যে সহজ সরল আন্তরিক অভিনয়ে মানুষের চিত্ত জয় করতেন তা বলে বোঝানো যাবে না। রবীন্দ্রনাথ এই নাট্য-প্রযোজনা দেখলে কী রকম ভাবতেন কতদিন ভেবেছি। মনে হয় উনি নিশ্চয় ওঁর ঈশানী পাড়ার নন্দিনীকে খুঁজে পেতেন।

রক্তরকবী যখন একটি সার্থক নাট্য-প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, সেই সময় আমি বিশ্বরূপা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। একদিন বিশ্বরূপার কর্ণধার দক্ষিণেশ্বর সরকার মহাশয়কে নিউ এম্পায়ারে 'রক্তকরবী' দেখতে আমন্ত্রণ করি। উনি কেন জানি না, খুব একটা খুশি হননি। প্রায়ই বলতেন, 'এটা রক্তরকবী, না রক্তকম্বল। আপনারা তো কমিউনিজম প্রচার করছেন, তবে নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র অসাধারণ। ওঁকে আমাদের স্টেজে আনা যায়? [তখন বিধায়কবাবুর সফল নাটক 'ক্ষুধা' প্রায় পাঁচশ রজনী চলছে, পরবর্তী নাটকের জন্যে এই প্রস্তাব।] আমি প্রথমে একবাক্যে নাকচই করে দিয়েছিলাম, পরে অনেক অনুরোধ করায় একদিন ইতস্তত করে বলেই ফেললাম শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রকে। ওঁরা খানিকটা অবাক হলেও একেবারে বাতিল করলেন না। বাস্তব অসুবিধার কথা আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন তৃপ্তি মিত্র। সেদিনের তরুণ নাট্যকার কিরণ মৈত্রের মূল নাটক 'বুদবুদ' অবলম্বনে কিরণবাবু, পরে বিধায়ক ভট্টাচার্য নাটকটি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনা করলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার শচীন সেনগুপ্তের মত বিধায়ক ভট্টাচার্য একসময় 'মাটির ঘর' নাটকের মাধ্যমে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তারপর অনেক দিন তিনি অন্তরালেই ছিলেন। 'বিশ্বরূপা' থিয়েটারের 'ক্ষুধা' নাটকে বিধায়ক ভট্টাচার্যের পুনরাবির্ভাব। নতুন নাটক শুনে সকলের পছন্দ হল, রিহার্সালও শুরু হল। নাটকের নাম 'সেতু'। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'সেতু' নানাদিক থেকেই মনে রাখার মত ঘটনা। একটানা পাঁচ বছরের বেশী এগারশ রজনীর মত চলেছিল। তৃপ্তি মিত্রের সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান, সঙ্গে নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, তরুণকুমারের মত শক্তিমান শিল্পীরা—দৃশ্য পরিকল্পনায় অমর ঘোষ, শব্দে কমল চৌধুরীর সঙ্গে মিলে আমি আলো-ছায়া-শব্দে এক ট্রেনের দৃশ্য রচনা করেছিলাম। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বৎসর আগের দর্শকের মন সব মিলিয়ে জয় করেছিল সেদিনের 'সেতু'। আজ শুধু থিয়েটারের অনেক অতীত নাট্যকর্মের মতই ইতিহাস, গল্প-কাহিনী, হয়ত কিছুটা কিংবদন্তী। দেখাই যাচ্ছে, শিল্পীদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। 'সেতু'-র নায়ক অসিতবরণ তো কয়েকবছর হল চলে গেছেন, আর সেই 'সেতু'র অবিস্মরণীয়া 'অসীমা' তৃপ্তি মিত্রও স্মৃতি হয়ে গেলেন।

সেতু প্রসঙ্গে জানাই প্রথম দিকে বিধায়কবাবুর করা দৃশ্যবিন্যাসের ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ছিল। প্রস্তুতি পর্বে যদিও নাটকের রিহার্সাল শ্রদ্ধেয় নরেশ মিত্র করাতেন, সে দায়িত্ব কার্যত সামলাতে হত অসিতবরণ ও তৃপ্তি মিত্রকে। সন্তোষ সিংহ নাটক-শিক্ষায় অংশ নিতেন সব সময়। ওই ট্রেনের দৃশ্য, আলো ও ঘূর্ণায়মান স্টেজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে ফাইনাল চেহারার আন্দাজ যখন আমার মনে ভাসছে, তখন মনে হল দৃশ্যের যে ব্যবস্থা নাটকে আছে, তাতে এই ধরনের দৃশ্য আমি নিজেই 'জাস্টিফাই' করতে পারছিলাম না।

এলোপাথাড়ি দুশ্চিন্তা নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে চলে গেলাম নিউ আলিপুরে। সেখানে বহুরূপীর একটি আমন্ত্রিত অভিনয় হচ্ছিল। আমার সমস্যার কথা শম্ভুদা ও তৃপ্তি মিত্রকে বলি। নায়ক বা নায়িকা কোন বিশেষ মানসিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে এটা যে যুক্তিযুক্ত না, তা ওঁরাও বুঝতে পারলেন। শ্রীমতী মিত্রের একপ্রকার সম্মতি নিয়ে ওই ট্যাক্সি নিয়েই ছুটলাম শ্যামবাজারে বিধায়কদার কাছে। বিধায়কদাকে বলি একটি নতুন দৃশ্য সংযোজনের প্রয়োজন, কেমন করলে ভাল হয় সেটা ওঁর ভাবনা। উনি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চুপচাপ শুনলেন, তারপর বললেন—'আবার বল তো কী কী চাইছ?' বললেন,—'কাল সক্কালে এসো "সিন" রেডি পাবে।' থিয়েটারের অফিসে দক্ষিণেশ্বর সরকারকে বলতে উনি ক্ষেপে গেলেন, তা কী করে সম্ভব। এ সব ইললজিক্যাল কথা। নায়িকা অসীমার মত অভিজাত মহিলা ওইভাবে ট্রেনের সামনে আত্মহত্যা করতে পারে না। বিধায়কবাবুও আপনার কথা শুনবেন না।' আমি ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি চলে গেলাম। পরদিন সকালে সাড়ে ছ'টার সময় বিধায়ক বাবুর বাড়ি যেতেই উনি সেই সুন্দর হাতে লেখা দৃশ্যটি দিলেন, পড়েও শোনালেন।

তারপর দীর্ঘদিন, ওই ট্রেনের দৃশ্যে, আলোয়, শব্দে আবেগে তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেছেন। একেবারে চরম মুহূর্তে নায়ক অসিতবরণ (পরে অসীমকুমার) ছুটে রেল লাইনের থেকে নায়িকাকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে দিতেন। দ্রুত ধাবমান ট্রেনটি তার আলো ছায়া শব্দের মায়ায় কাল্পনিক বিভীষিকা রচনা করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে দৃশ্যের অবসান ঘটত বিহ্বল দর্শকের সামনে।

তৃপ্তি মিত্র, যার কাছে নিশ্চিতভাবে প্রথম ও প্রধান ছিল বহুরূপী। পূর্ব শর্ত অনুযায়ী বহুরূপীর জন্য দিল্লীতে অভিনয় করতে যেতে হয়েছিল, সেই কারণে জয়শ্রী সেনকে পরে ওই ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। বহুরূপী তাঁর নিজের সংস্থা, যার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ। তা সত্ত্বেও যখন বাইরে কাজের ডাক এসেছে, কি চলচ্চিত্রে বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অনেক ভাবতে হয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কঠিন সত্যের মুখোমুখি সকলকেই হতে হয়। আদর্শবাদী নাট্যসংস্থা বহুরূপী। আগেও একবার রঙমহলে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' নাটকের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত নানাকারণে সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। 'সেতু' নাটকের বিজ্ঞাপনে ওঁর নামের পিছনে ব্র্যাকেটে বহুরূপী লেখা থাকত। এটাও একটা নতুন ঘটনা।

সেই প্রসঙ্গে আরো ঘটনা মনে পড়ল। একবার উনি অনেক দিন ধরে ভাবনা চিন্তা করে স্থির করেন, সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নিজের চেষ্টায় একলাই কিছু করবেন। অনেক দিন ধরে তিনি তৈরি হলেন। বন্ধু নীতীশ সেনকে দিয়ে নাটক লেখালেন, যাতে ওঁর নিজস্ব অনেক ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে আছে। এই প্রস্তুতিতে সহযোগী ও অন্যতম উৎসাহী ছিলেন ওঁর সেজদি কমলা সিংহ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিছুটা আমি। একেবারে চূড়ান্ত সময়ে বোধহয় স্টেজ রিহার্সালেরও পর একদিন রাতে আমাকে ফোন করে বললেন, 'বহুরূপীর সবাই বলছে, এটা ওদের অর্থাৎ বহুরূপীরই প্রযোজনা হোক।' আমি তো অবাক। ওঁর বহুরূপীর প্রতি মমত্ব ও আনুগত্য এবং সবকিছু মিলিয়ে মতটাও পরিবর্তন করে 'অপরাজিতা' বহুরূপীর বাইরে আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এক কথায় রাজী হয়ে

গেলেন এটিকে বহুরূপীর প্রযোজনা হিসেবে প্রচার করতে। ওঁর ভাষায় 'আমি কেমন না করতে পারলাম না।'

বিশ্বরূপায় তৃপ্তি মিত্র তাঁর সমস্ত জনপ্রিয়তা, শিল্প দক্ষতার সঙ্গে যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এলেন, তখনও ওঁর ব্যবহারে ছোটবড় সব শিল্পী টেকনিশিয়ানদের ভালবাসা পেয়েছেন। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মঞ্চ ও গ্রীনরুমের মধ্যে পরিচ্ছন্ন সুরুচির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। মাঝে মাঝেই থিয়েটারে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলার দিকে অমনোযোগ ঘটে, এসব দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সদাসতর্ক। বয়স্ক নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনি সহশিল্পীদের সঙ্গেও ছিল প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক।

কাজকেই উনি গুরুত্ব দিতেন। সকালে নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর নাটকে প্রধান ভূমিকা শেষ করে মেক-আপ তোলার সময় পর্যন্ত পেতেন না, ছুটতেন গাড়ি নিয়ে বিশ্বরূপার ম্যাটিনি ও সন্ধ্যার শো করতে। শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত-অভিনয় বাদ দিয়েছেন বলে জানি না। 'সেতু' ছাড়াও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আরো অনেক নাটক করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। যেমন 'দ্বিধা' 'থানা থেকে আসছি', 'সওদাগর', 'হাসি'। সেতু নাটক অভিনয়ের সময় প্রাচীনকালের শিফ্‌টার প্রহ্লাদ, ইলেকট্রিশিয়ান বংশী, এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন আন্তরিক, বিধায়কদার সঙ্গেও তেমনি ওঁর ভাব। বিধায়ক ভট্টাচার্য খুব ভাল নাটক পড়তেন। নিজস্ব স্টাইলে পড়লেই আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এই বিধায়কদার সঙ্গে তৃপ্তি মিত্রের নানান গল্প-আড্ডায় বেরিয়ে এল একটি নাটকের আইডিয়া। তৃপ্তিরই উৎসাহে উনি লিখতে শুরু করেন অনতি অতীতের মনমোহন থিয়েটারের বাড়ি ভেঙে ফেলার পটভূমিকায় এক নাটক, যার নাম 'সরীসৃপ'। এই নাটক লেখার বহুদিন পর তৃপ্তি মিত্র ওঁর নিজস্ব সংস্থা 'আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়' থেকেই অভিনয় করেছিলেন ১৯৩৭-র সেপ্টেম্বরে। আর একবার অসুস্থ অবস্থায় দূরদর্শনের জন্য ওই নাটকের অভিনয় করেছিলেন।

ওঁকে যেভাবে আমি চিনতাম, জানতাম—শুরু থেকে মনপ্রাণ দিয়ে সব অবস্থার মধ্যে বহুরূপীর জন্যে নাটক-অভিনয় এবং অন্য সব কাজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন উদার ও স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে। যখন নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন এতদিনের নিজে হাতে গড়া সংস্থা ছাড়বার, অনেক চিন্তাভাবনা করেই স্থির করেছিলেন। সেই বিবেচনা তাঁর দিক থেকে সঠিক হয়েছিল কি না, সেকথা কি কেউ বলতে পারে? কারো বলার অধিকার আছে?

দীর্ঘকাল নাটকের জগতে থেকে, অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী আমি। আমি দেখেছি, 'রক্তকরবী' নাটকের যে দৃশ্যে নন্দিনী বলে, "দেখতে দেখতে সিঁদূরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল, ওই কি আমাদের মিলনের রঙ!" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যখন নন্দিনী ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চেয়ে চলতে থাকে, তখন তারই সঙ্গে খালেদ চৌধুরী বেহালায় একটি অপূর্ব টানা কম্পনের রেশ তুলে পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। যেদিনের কথা বলছি, তখন থেকেই খালেদের সঙ্গে বহুরূপীর মতান্তর মনান্তর ঘটে গেছে দুর্ভাগ্যক্রমে। সেইদিন ছিল খালেদের বাজনার শেষ 'এফেক্ট'। যে 'রক্তকরবী'-র দৃশ্যে ও পরিচ্ছদ-পরিকল্পনাই নয়, খালেদ সঙ্গীত ও আবহ সৃষ্টি করত নানান টুকিটাকি উপকরণ ও যন্ত্রের সাহায্যে—সেদিন খালেদ এসে সবকিছু ঠিক মতন করলেন, আর ওই সিঁদূরে

মেঘের দৃশ্যে বেহালায় সুরের কম্পন তুলে শেষ হওয়ামাত্র নীরবে বেহালাটি নিজের বাক্সে ভরে বাইরে বেরিয়ে চলে গেলেন। মঞ্চে ও নেপথ্যে যে যার কাজ করেও চলেছি, একসময় খেয়াল হল, তৃপ্তিও খুব সচেতন, ওই বেহালার সুরের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের প্রয়োগ ভাবনা, আমার আলোছায়া মিলে যে নাট্যমুহূর্ত তা একরকম করে শেষ হয়ে গেল। তবু অভিনয় হল, অভিনয় করে যেতে হয়, বহুরূপী তারপর চলেছে, আজও রয়েছে।

আমি ও তৃপ্তি মিত্র অনেক নাটকেই কাজ করেছি, পরে যখন জানলাম উনি বহুরূপীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ত্যাগ করলেও নাট্য-চর্চায় উৎসাহী এবং করেও যাবেন—সেইদিন থেকে আমি ও খালেদ চৌধুরী ওঁর সব রকম প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এক সময় উনি দমে গিয়ে স্থির করলেন, একেবারে নতুন আনকোরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাট্য-শিক্ষায় ব্রতী হবেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সূত্রপাত হল আলো গুপ্ত ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়'। একটি কথা বলবার—এত স্মরণীয় জন্মদিন পালন আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। তৃপ্তি মিত্রর শেষ অভিনয় আরব্ধ নাট্য-বিদ্যালয়ের প্রযোজনায় 'অপরাজিতা'—তারিখ ২৫ অক্টোবর ১৯৩৭—ওইদিনই ছিল তাঁর জন্মদিন।

সাতাশি সালের শেষে অসুস্থ হবার আগে বেশ কয়েকবছর ওঁর একেবারে একা কেটেছিল। আর সেই সময় ওঁর সব ভাবনা চিন্তা স্বপ্ন ছিল আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়কে ঘিরেই। এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে মনে করতেন। আলো ও আরব্ধর অন্যান্য নবীন শিল্পীরাই ওঁর সবকিছুর সঙ্গী সহায়ক ছিল, দৈনন্দিন প্রয়োজনে, অসুখে বিসুখে সব সময়েই ওরা হাজির থাকত।

নাট্যবিদ্যালয়ের নামকরণের আগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিয়মিত ক্লাস করা শুরু হয়েছিল। দু'একটা ছোট ঘরোয়া আসরে চলত নাট্য-পাঠ। আরব্ধ নাট্য-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে রক্তকরবী নাটকটি নতুন ভাবে মঞ্চপ্রয়োগ করলেন তৃপ্তি মিত্র। সেই প্রযোজনায় মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে ছিলাম খালেদ ও আমি। বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের নির্দেশিত নাট্য-প্রয়োগ থেকে এই প্রযোজনা অনেকখানি স্বতন্ত্র। অনেক সহজ সরল সামগ্রিক ভাবনা, প্রায় কৃতিত্বই তৃপ্তি মিত্রের। সাহস ও আন্তরিকার পরিচয় ছিল নবীন শিল্পীদের অভিনয় প্রচেষ্টায়। আরো একটি নাটকে তৃপ্তি মিত্রের নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন। নাটকটি 'রঙ্গকর্মী'র 'গুড়িয়া ঘর'। ইবসেনের 'ডলস হাউসের' বাংলা 'পুতুল খেলা'-র হিন্দী নাট্যরূপ—উষা গাঙ্গুলীর। মঞ্চ-দৃশ্য পরিকল্পনা খালেদ চৌধুরী, সুরেশ দত্তের সহায়তায়। এর আগে তৃপ্তি মিত্র নিজের কিছু লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'ঘরে বাইরে', 'বহুরূপী'তে প্রযোজনা করেছেন সার্থকভাবে। আর একটি ভিন্নধর্মী রচনা, উত্তরবঙ্গের বন্যা-বিপর্যয়ের পটভূমিকায় লেখা হয়েছিল—'প্রহর শেষে'। পরে ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল 'সাঁঝ ঢলে' নামে হিন্দী রূপান্তর করেছিলেন। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় এই নাটকের অনেকগুলি সার্থক অভিনয় হয়েছিল।

রেডিও-এ উনি সত্যজিৎ রায়ের 'ফটিকচাঁদ' বাংলা ও হিন্দীতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় করিয়েছেন। থিয়েটার সিনেমার বাইরে বিভিন্ন সময়ের লেখা কিছু প্রবন্ধ, বিশেষত

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সেমিনারে পড়া 'হেথা নয়, অন্য কোনখানে' খুবই প্রশংসিত হয়েছিল বিদ্বজ্জন সমাজে। ওঁর ভাবনা চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, ওই রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল।

বছর কয়েক আগে ওঁর মনে হয়েছিল মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'আরব্ধ' নাট্যবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান করবেন। অকাদেমি মঞ্চে শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্ত ও সরযূ দেবীকে আমন্ত্রণ করেন অনুষ্ঠানের বলবার জন্য। দীর্ঘদিন অনুশীলনের পর 'আরব্ধ'র ছেলেমেয়েদের নিয়ে মহর্ষির 'চক্রব্যূহ' নাটকটি পাঠের আয়োজন করেছিলেন।

বাইরের নাট্যজগতের মানুষের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। সম্মিলিত অভিনয় ও অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। যেমন শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' নাটকে, গৃহিণী-সচিব-সখা সরযূদি, শ্যামল ঘোষাল আরো অনেকের সঙ্গে মিলে রঙ্গনায় করেছিলেন। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ 'হাজার চুরাশির মা' অভিনয় করবেন। অনেক চেষ্টার পর ওই নাটক অভিনয়ও হল—খুব পরিশ্রম করেছিলেন অভিনয়ের জন্য। সারা কলকাতা ঘুরে কত জায়গায় রিহার্সালের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু একরাত্রের বেশি অভিনয় সম্ভব হয় নি। খাটলে নিশ্চয় আরো ভালো হত। কিন্তু সেই সময় লোকের কথায় উনি হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরীরটাও তখন বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না।

লালন ফকিরকে নিয়ে মন্মথ রায় নাটক লিখে দেন সবিতাব্রত দত্তকে। 'রূপকারের' সেই নাটকে অনেক দিন অতিথি শিল্পী হিসেবে তৃপ্তি মিত্র লালনের স্ত্রী মতিবিবির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সবিতাব্রত তৃপ্তির সবচেয়ে ছোট বোন গীতার স্বামী। সবিতাব্রত এবং খালেদ চৌধুরী ছিলেন সেই মানুষদের অন্যতম, যাঁরা চিরকাল তৃপ্তি মিত্রের খোঁজখবর যোগাযোগ রেখে এসেছেন। ওঁর সাহিত্য চর্চায় যিনি প্রথম থেকেই উৎসাহ দিতেন, সেই সন্তোষকুমার ঘোষও আজ নেই। সন্তোষবাবু গৌরকিশোর ঘোষ ও মহাশ্বেতা দেবী তৃপ্তি মিত্রের আজীবন সুহৃদ ছিলেন। মহর্ষির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গৌরিকিশোর ঘোষকে হাজির দেখে আনন্দিত হয়েছি। সব বোনের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। এ ছাড়া ওঁর অনেকদিনের পুরনো বান্ধবী দু'তিনজনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমি জানি রবীন্দ্রসদনের প্রাক্তন প্রশাসন অধিকারিকা ডঃ তপতী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃপ্তির গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আর একজন থিয়েটারের বন্ধু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃপ্তির অনেক আলোচনা হত। অনেক প্ল্যান ছিল দু'জনেরই—বড় এবং ভালভাবে নতুন কিছু করার। অজিতেশই আমাকে বলেছিলেন, বিশেষ করে 'থানা থেকে আসছি' অভিনয়ের পর। তৃপ্তি মিত্রের সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজের একটা সূচনাও হয়েছিল, অজিতেশের মৃত্যুর কিছুদিন আগে। শুনেছি নটী বিনোদিনীকে নিয়ে তৃপ্তি একটা নাটক লিখছিলেন, শেষ করেননি। আমার স্ত্রী গীতাকে শুনিয়েও ছিলেন। আশা ছিল, উনি ওটা একদিন শেষ করতে পারবেন।

বহুরূপীর 'গন্ডার' নাটকে একটি বেড়ালের ভূমিকা ছিল। সেই ছোট বেড়ালটি পড়ে তৃপ্তি মিত্রের বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। ওর জন্য কী ভালবাসা মমতা ছিল দেখেছি। একেবারে মায়ের মত স্নেহ। কালক্রমে বেড়ালটি মৃত্যুর পর তারই বংশধর অনেকদিন

পূর্ণ মর্যাদায় রাজত্ব করেছিল—নাম রেখেছিলেন মুনু। একদিন তারও মৃত্যু হল। তখন ওর কী বেদনা, কী দুঃখ! সেই অনুভূতি সম্ভবত ওঁর একটি ছোট্ট গল্পে দেখা দিয়েছে। মহৎ শিল্পসৃষ্টিটা হয়েছিল ওঁর এই অসহায় প্রাণীর প্রতি অনুকম্পায়। পাখি গাছপালা এ সব ওঁর খুব প্রিয় ছিল। ওঁদের ১১ নম্বর নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ির স্বল্প পরিসর বারান্দায় টবের গাছগুলি নিয়মিত যত্ন করতেন। বেশি দিন কাজের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হলে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করতেন গাছ নিয়ে। আমরাও এই নিয়ে কত ঠাট্টা করেছি—আজ মনে পড়ে। এই অনুভূতির সঙ্গে সত্যকে স্বীকার করার জন্য একটি তেজস্বিতার সংমিশ্রন ঘটেছিল। কিছুদিন আগে দূরদর্শনের একটি পুরনো স্মৃতিচারণায় অনেক মতপার্থক্য সত্ত্বেও নবান্ন গণনাট্য সঙ্ঘের বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে সবিস্তারে বলেন। নবান্ন সম্পর্কে ওঁর স্পষ্ট বক্তব্যটি বাদ পড়ায় উনি খুবই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েও, এ নিয়ে আর কিছু উদ্যোগ নেননি। কারণ উনি বোধহয় কোনোদিনই শক্ত হতে পারলেন না, কোন ব্যাপারেই নয়।

সবশেষে কয়েকটি ছোট গল্প। প্রাত্যহিক সমাজের চারপাশ থেকে দেখা ঘটনা নিয়ে লেখা। ওঁর গল্প বলার স্টাইল তো বটেই, তা ছাড়া একটা সহজাত সংবেদনশীল অনুভূতি ছিল। ওঁর একটি ছোট গল্প বই—'এই পৃথিবী রঙ্গালয়' পড়ে মন উদাস হয়ে যায়। ভাবি, তৃপ্তি মিত্রের 'আরব্ধ' কি শুধু নাট্য-বিদ্যালযেই রয়ে গেল? সমস্ত জীবনকে উনি যেভাবে ধরতে শুরু করেছিলেন, মঞ্চের নানা চরিত্র-চিত্রণেই নয়, সার্থক সাহিত্য রচনায়—তাও শেষ হয়ে গেল। চিরকালের মত।

ডক্টর সত্যজিৎ রায়

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমরা কয়েকজন বেকারবন্ধু প্রায় বোহেমিয়ান জীবন কাটাতাম। একটা স্বপ্ন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, ছবি তৈরি করব, নাটক করব ইত্যাদি। আমি তখন সবে আমার হাজরা রোডের "ডার্করুম" মানে, মেসের অন্ধকারে একতলা ঘর ছেড়ে এস আর দাস রোডের একটা ঘরে এসে উঠেছি। আমার রুমমেট বংশী (চন্দ্রগুপ্ত) তখন একটা আধটা ফিল্মে আর্ট ডিরেকশানের কাজ করছে। এইসময় হৃষির (হৃষিকেশ মুখার্জি) মারফত ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাটির কথা কিছু কিছু কানে আসতো। বোধহয় ফিল্ম সোসাইটিতে কয়েকটা ছবিও দেখেছি। আমাদের ফিল্ম নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই, মৃণাল, আমি, ঋত্বিক, সলিল, হৃষি সবাই ভাবছি কি করে শুরু করা যায়, বিজনদাও (ভট্টাচার্য) ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এইসূত্রে সত্যজিৎ রায়ের নামটাও কানে এসেছিল বংশীর মুখে 'মানিক-মানিক' নামটা অনেকবার বলতে শুনেছি। বংশী রেনোয়ার 'দি রিভার' ছবির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রেনোয়ার শিল্প নির্দেশক মঁসিয়ে লুরিয়ে আসতেন নিউ থিয়েটার্সে সৌরেন সেনের সূত্রে তাঁব সঙ্গে আমাদের আলাপও হয়েছিল। তখন জেনেছিলাম যে সেই ছবির নির্মাণের সঙ্গে অনেকে যুক্ত ছিলেন; তার মধ্যে হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশী তো ছিলেন, ছিলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত, আর একজন ছিলেন-কে-না

সত্যজিৎ রায়; তখন সুকুমার রায়ের ছেলে হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। যদিও তখন আমি সত্যজিৎ নামের সঙ্গে খুব পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম 'সিগনেট প্রেসের' দৌলতে। কারণ আমি তখন সিগনেটের যত বই বেরোত যে 'টুকরো কথা' হত, তা পড়তাম। সিগনেটের প্রেজেন্টেশন, প্রডাকশন, পাবলিকেশন সবটাই ছিল অনবদ্য, আর তার মূলে দুজনের নাম ছিল, একজন ডি কে-দীলিপ গুপ্ত, অন্যজন হলেন সত্যজিৎ রায়, যিনি অলংকরণ, প্রচ্ছদ সবই করাতেন। এখন বিশেষভাবে মনে আছে বিষ্ণুদে-র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' এবং জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন'-এর প্রচ্ছদ আরও বেশি করে মনে পড়ে 'আম-আঁটির ভেঁপু' (পথের পাঁচালি)। আমাদের ইস্কুলে 'শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'-রচনায় আমি লিখেছিলাম যে 'পথের পাঁচালি' আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বই। আমি শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের পরিচয় পেয়ে গেছি 'আম আঁটির ভেঁপু'র ছবি এবং বই দেখে।

একদিন বংশীর মুখে শুনলাম যে মানিক ছবি করবে-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি'। আমি শুনে প্রায় আঁৎকে উঠলাম। বললাম, সর্বনাশ করেছ তোমরা, সিনেমাওয়ালারা সত্যিই সর্বনাশ করে ছাড়বে। আমার জীবনের একটা সত্যিকারের সাধের বই, সেটাকেও তোমরা ফিল্ম করে নষ্ট করবে। এটা আমাব মোটেই ভাল লাগছে না।

তারপর মাঝে মাঝেই দেখি, একজন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে খোঁজ করেন-বংশী আছে? -না পেয়ে চলে যান। পরে বংশীকে বলি লম্বা মতন একজন ভদ্রলোকের খোঁজ করতে আসাটা-বংশী বোঝে মানিক এসেছিল। ইতিমধ্যে বংশী সত্যেন বসুর 'ভোর হয়ে এলো' ছবিতে কাজ করছে। তারও আগে জ্যোতির্ময় রায়ের 'অভিযাত্রী' ছবিতেও কাজ করেছে, তাতে বোধহয় এক ছোট্ট চরিত্রে অভিনয়ও করেছে।

লক্ষ্য করতাম বংশী বেশি মত্ত থাকত পথের পাঁচালির গল্প বলতে। কীভাবে শ্যুটিং হচ্ছে-কোথায় হচ্ছে-ইত্যাদি। একদিন শুনলাম অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে আমি শুধু শুনে যেতাম, বিশেষ পাত্তা দিতাম না।

সত্যজিৎ রাযের সঙ্গে ভালরকম আলাপ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকের প্রস্তুতির সময়। মঞ্চসজ্জার একটা ডিজাইন বংশী এক্সিকিউট করবে, নিউ এমপায়ার-এ অভিনয় হবে। উদ্যোগ বোধহয় পূর্ব-পরিষদের। তখনও কলকাতা শহরের মঞ্চ জগতের মঞ্চসজ্জা ও আলোক পরিকল্পনার কাজ পুরোদমে শুরু করিনি। কিন্তু আমার অনেকরকম চিন্তাভাবনা আছে। এই নাটকে আখরোট বনের একটা আভাস দিয়ে - কালোর পটভূমিকায়-একটি অবিস্মরণীয় সুন্দর ডিজাইন করেছিলেন, কে-না, সত্যজিৎ রায়। তাই এই নাটকে আলোর কাজ করার উৎসাহ আমার বেড়ে গেল।

তপতী নাটকে কুশীলবরা ছিলেন তৎকালীন নামী শিল্পীরা যেমন-বিকাশ রায়, নীলিমা সান্যাল (তপতী), সুচিত্রা মিত্র (বিপাশা), রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী - আরো অনেকে। সত্যজিৎ রায়ের মঞ্চসজ্জার ডিজাইন রূপায়ণ করবে বংশী প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই নাটকের উদ্যোক্তা ছিলেন বাণীকান্ত গুহ, সতীকান্ত গুহ, সনৎ লাহিড়ী প্রমুখ।

তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁকে আরও বেশি করে জানতে পারলাম। বংশী বলত "সবই অপরিচিত নতুন মুখ, ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রী সব"-একমাত্র বংশীই যা কয়েকটা অন্য ছবিতে আগে কাজ করেছে - শুনলাম রবিশঙ্কর সুর সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই বাংলা হিন্দি ছবি দেখার আমার একটা আকর্ষণ ছিল। বম্বে টকীজ, নিউ থিয়েটার্সের অনেক ছবি দেখেছি, যদিও নাটকের প্রতি আমার বেশি ইনভল্‌মেন্ট ছিল। কিন্তু যখন পথের পাঁচালি মুক্তি পেল বসুশ্রীতে রাস্তাঘাটের চেহারাই কেমন বদলে গেল। রাস্তার মোড়ে বিশাল বিশাল হোর্ডিং - দুর্গার হাত ধরে অপু দৌড়চ্ছে। ছবির থেকে শুরু করে তার কম্পোজিশন, তার লে-আউট-তার পুরো ব্যাপাটাই অন্যরকম - সেগুলো সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি।

ছবি করতে করতে ওদের অর্থের জন্য কয়েকবার থামতে হচ্ছিল। আমিও ব্যক্তিগতভাবে দু-একজায়গায় খোঁজ-খবর করেছিলাম কি ক'রে অর্থসংগ্রহ করা যায়। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল।

এই ছবি যেদিন মুক্তি পেল, সেদিনই দেখতে গেছিলাম। দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। প্রচলিত বাংলা, হিন্দি এমনকি বিদেশী সবকিছুর চেয়ে আলাদা। শিহরিত হচ্ছিলাম এই ভাবে, যে 'পথের পাঁচালি' লুকিয়ে মাসিক পত্রে পড়তাম, স্কুলের রচনায় লিখেছি "আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বই", সেই বই যিনি গ্রাম বাংলার জীবনকে এমন কবে মূর্ত করেছেন সেলুলয়েডে, তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়। পরের দিন তাঁর লেকটেম্পল্‌ রোডের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে বললাম "সত্যজিৎ বাবু, দারুণ লেগেছে ছবি"। আমি তখন উদভ্রান্তের মত হয়ে গেছি। বললাম, "আপনি একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন।" শুনে বললেন, "সেকি!" আমি বললাম, "নেমন্তন্ন করলাম, যাবেন সন্ধ্যেবেলা"। তখন উনি এত ব্যস্ত হননি, পৃথিবীজোড়া নামডাক হয়নি-তখন সবে তার সূত্রপাত। হিন্দুস্থান পার্কে আমার দেড়খানা ঘরে, সত্যজিৎবাবু, বংশী, সুব্রত মিত্র আর মৃণাল সেন এলেন সন্ধ্যেবেলা। খাওয়া দাওয়া হল। সুব্রত সেতারে পথের পাঁচালি ছবির দইওয়ালার সিকোয়েন্সটা একটু বাজাল। অনেক গল্প করলাম। তারপর থেকেই সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বজোড়া সম্মান-আর অভ্যর্থনা শুরু হয়ে গেল। মনে পড়ে ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্সের সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আর তারপরে কলকাতা কর্পোরেশন সম্বর্ধনা দিয়েছে - তারপর আস্তে আস্তে সারা বিশ্বজুড়ে সম্বর্ধনা পেয়েছেন। কিন্তু প্রথম ভাললাগার প্রথম সামান্য আয়োজন আমার বাসায়। এখনও তাঁর ছবি দেখি ; সব ছবি যে সমান ভাল লাগে তা নয়, কোন কোন ছবি মুগ্ধ করে-তবে সত্যজিতের "ইনার আই" আলোছায়ার শিল্পী হিসেবে সবচেয়ে বিস্ময় জাগিয়েছিল। কিছুদিন আগের ছবি "শাখা প্রশাখা" সেটাও ভাল লেগেছে।

এই সুযোগে আর একটা কথা বলতে চাই। তাঁর লেখা গল্প যখন প্রথম ছেপে বেরোল (বোধহয় সন্দেশে) : আমি প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলাম সেটা পড়ে। উনিও সেটা মনে রেখেছিলেন। তার পর যখন উনি ডক্টরেট পেলেন (কোথা থেকে মনে নেই) ; আমি ফোন ধরে বললাম "ডঃ রায় আছেন"? ওদিকে খুব অবাক কণ্ঠস্বর, "কাকে খুঁজছেন"-"ডঃ রায় মানে ডঃ সত্যজিৎ রায়", তখন উনি ওঁনার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে খুব হাসলেন। এই আমাদের সত্যজিৎ রায়, আমার খুব কাছের মানুষ বলে আমি গর্বিত। ওঁর সৃষ্টি ছবি ও শিল্পকলার প্রতি অন্য সবার মত আমিও একজন গুণগ্রাহী ভক্ত। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও কৌতূহল আছে। কিছুদিন আগে বিজ্ঞান বিষয়ক একটা নতুন প্রজেক্ট-এর কথা ডঃ রায়কে বলেছি। উনিও সেটাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন-দেখা যাক।

তাঁর শিল্পশৈলীর বিভিন্ন ধারা-যেমন, লেখা, ছবি আঁকা, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, সঙ্গীত ভাবনা ইত্যাদি সবটার মধ্যেই এক আশ্চর্য সমন্বয় খুঁজে পাই। তাঁর নানান বিষয়ে চিন্তা ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁকে আরো অনেকদিন এভাবে দেখতে চাই-তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। নতুন কাজের মধ্যে সেটা হয়ত কোনওদিন সার্থক হবে।

শম্ভু মিত্র

এই তো ক'দিন আগে হাতে পেলাম শম্ভুদার লেখা নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ 'সন্মার্গ সপর্যা' তাঁর পুরনো লেখা এবং নতুন লেখা মিলিয়ে এই গ্রন্থ আমাদের কাছে আজ এক বিরাট সম্পদ। দেখলাম তাঁর সক্রিয় মনন আজও এতটুকু শ্লথ হয়নি।

প্রথম জীবনে শম্ভু মিত্রকে অনেক দূর থেকে শ্রদ্ধা করতাম, কারণ তখনও কাছে যাওয়ার সুযোগ ঘটে ওঠেনি। আকর্ষণও অনুভব করতাম কাছাকাছি হওয়ার বম্বেতে, 'ধরতি কা লাল' ছবি করে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র ফিরছেন। আমিও ফিরছি বম্বে থেকেই একটি ফিল্মের কাজ সেরে পাশাপাশি কামরা। কিন্তু কাছাকাছি আসা হয়নি। তার বেশ কিছু দিন পরে শম্ভুদার সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপের সূত্র ছিল দুটি এক ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেক্রেটারি নিরঞ্জন সেন। দুই মৃণাল সেন। মৃণালের বাড়িতে শম্ভুদা যেতেন। মৃণালের বাবা শম্ভুদাকে ভালবাসতেন। আমিও মৃণালের বাড়ি যেতাম। সেইভাবে শম্ভুদার সঙ্গে প্রথম পবিচয়। স্মৃতির পাতা বোধহয় ফোটোর মত দু-তিন দশকে ঝাপসা হয় না। আমি তো দেখছি বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে সব। অবশ্য তা বোধহয় শম্ভু মিত্রের মত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যের কথা বলেই। ই বি আর রেলওয়ে ম্যানসন ইন্সটিটিউটে (বর্তমানে নেতাজী মঞ্চ) বহুরূপী নতুন নাটক নামালেন 'উলুখাগড়া'। আমার কাছে কাজ করার আমন্ত্রণ এল। কিন্তু আমি করতে পারলাম না। তখন ঋত্বিক ঘটক আমাকে ফিল্ম প্রোডাকসানের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। 'উলুখাগড়া' মঞ্চসজ্জায় সাহায্য করেছিলেন বিখ্যাত বংশীচন্দ্র গুপ্ত। পরে যিনি সত্যজিৎ রায়ের ছবির সেটের একচেটিয়া কাজ করেছেন। আমার বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার এস আর দাস রোডের বাড়ির রুমমেট। সব মনে পড়ে যায়। যাই হোক সেবার 'উলুখাগড়া' নাটকে আলোর ব্যাপারটা বোধহয় সামলে নিয়েছিলেন মহম্মদ ইসরাইল। ফলে শম্ভুদার সঙ্গে যোগাযোগ হোল না। ভবানীপুরে স্মার্ট গ্রাউন্ডে যে শান্তি সম্মেলন হয়েছিল সেখানে পাইকারি আলোর দায়িত্ব ছিল আমার। সম্মেলনে শম্ভু মিত্র নির্দেশিত অভিনীত সেই ইতিহাস সৃষ্টির নাটক ছেঁড়াতারের একটি দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল। সেই বিখ্যাত তালাকের দৃশ্য।

মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম। তারপর পথিক নাটকে আলো করার আমন্ত্রণ এল আমার কাছেই। তুলসী লাহিড়ীর লেখা নাটক। আলো করলাম। এতদিন কাজের মধ্যে এমন চিন্তা ভাবনার ছোঁয়া পাইনি। নাট্য পরিচালক স্বয়ং শম্ভু মিত্র। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর দ্রুত সূক্ষ্ম এত তীক্ষ্ম এবং মঞ্চে তার প্রকাশও ঘটাতেন এত মাত্রার সংযোগে যে এতদিন বাদে আমি প্রকৃত কাজের আনন্দ পেতে শুরু করলাম। মনে পড়ে সেদিনের সব কাজের কথা। পথিক নাটকেরর পটভূমি জি টি রোড। তার ধারে ঘর-বসতি। দোকানের

ঘর যে জি টি রোডের ধারে তা বোঝাতে গেলে মঞ্চে তার প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক। সে ঐ ঘরের জানালা দিয়ে হেড লাইটের আলোয় মাঝে মাঝে ঘরকে ঝলসে দেওয়া আর শ্রীসুধাংশু কর মহাশয় (বড়বাবু নামে বিখ্যাত) তাঁর হাতে গ্রামোফোন রেকর্ডে সংগৃহীত গাড়ির আওয়াজ হেড লাইটের আলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি হল। কেমন করে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে সব হয়ে যেত।

নিউ এম্পায়ারে বহুরূপী নাট্যোৎসব করল। সেই নাট্যোৎসবে উলুখাগড়া নাটকের আলো করার দায়িত্ব আমার ওপর। এখনও মনে আছে নাটকে তৃপ্তি মিত্রের নাম বোধহয় করুণাই ছিল, একটি দৃশ্যে সেই করুণার চেহারায় অস্বাভাবিক ভাবের আভাস ধরবার ব্যাপার ছিল। একটি কাঁচের সেন্টার টেবিল যোগাড় করা হল। তার ওপর একটা হাল্কা লেসের কভার দেওয়া হল এবং টেবিলের নিচে আলো রাখা হল। ব্যাপারটা দারুণ এল। কিন্তু এসব তো এভাবে আসতো না যদি না শম্ভুদা ভাবনা-চিন্তা, নাটক পরিবেশনে অভিনয়ে — সর্বস্তরে নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে আগ্রহশীল হতেন। তিনি কাজের ক্ষেত্রটাই তৈরি করে দিতেন। প্রতিটি স্তরে তাঁর মেধার কো-অপরেশন থাকতো দারুণ। যেমন ভাবতে পারতেন তেমনি ভাবাতে। অপরের ভাবনা যদি যথোপযুক্ত হত তবে তা গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। মনে আছে 'রক্তকরবী'তে রাজার যে জালের ঘর তার মাথায় রাখা হত একটা বাজপাখির ইমেজ। তার দু'পাশে দুটো চোখের মত। তাতে লাল আলো থাকতো। রাজা কথা বললেই সেগুলো জ্বলে উঠত। একদিন মনে হল ও দুটোতে লেন্স লাগিয়ে দিলে আগুনের মতো এফেক্ট আসবে। আর মনে হচ্ছিল ব্যাপারটাতে ভয়ঙ্করতাই যেন চাইছে। শম্ভুদাকে বলা মাত্র উনি রাজি।

যখন শম্ভুদার প্রতিভার মাপটার কথা চিন্তা করি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। মহর্ষি মারা গেছেন। মহম্মদ ইসরাইল, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, সবিতাব্রত এবং গীতা ভাদুড়ী সব দল ছেড়ে গেছেন। এমতবস্থায় একজন শিল্পী নতুন নাটক নামাচ্ছেন যে নাটক বাংলা তথা ভারতের নাট্য ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন একটা অধ্যায়, নাটকটি হল 'রক্তকরবী'। এমন সৃজন প্রতিভা আমি তো আর দেখিনি। আমার কাজের ক্ষেত্রে যে সোনার বছরগুলো কেটে গেছে তার প্রথম এবং অনেকটা জুড়েই শম্ভু মিত্র। তারপর অবশ্যই আর একজনের নাম করতে হয় তিনি উৎপল দত্ত। তাঁর প্রয়োগ ভাবনা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ভাবলে অবাক লাগে না? নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়িতে ছোট ঘরে শম্ভুদা কি অনায়াসে একের পর এক কালজয়ী নাটক সৃষ্টি করে গেছেন। আর এইরকম প্রতিভার পাশাপাশি বলেই বোধহয় কাজের উদ্যমটাও ছিল আমাদের সাংঘাতিক। আর সে উদ্যম মূল্যও পেত মহান প্রতিভাদের কাছে। শম্ভুদা নিজে তার মূল্য দিতেন এবং শম্ভুদার মুখেই শোনা পার্ক সার্কাসের রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমাকে খালি গায়ে ছোটাছুটি করে কাজ করতে দেখে প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় শম্ভুদাকে বলেছিলেন, এই ছেলেটিকে দেখে সতুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সতুও এমন কাজপাগল ছিল। সতু মানে মঞ্চজগতের যুগান্তর আনয়নকারী সতু সেন। ভারতীয় থিয়েটারে রিভলভিং স্টেজ এবং আধুনিক আলোক ব্যবস্থার প্রবর্তক। যাই হোক যে কথা বলছিলাম, সেই কাজের উদ্দীপনা এতই বেশি

ছিল যে তখন আমরা কত ছোটখাট উপকরণ দিয়ে নাট্য পরিবেশ অনুযায়ী আদর্শ মঞ্চ মায়া তৈরী করতে চেয়েছি এবং হয়তো অনেকটা পারাও গেছে। 'রক্তকরবী'র প্রথম দিকে মেঘ দেখাবার জন্য ইমপোর্টেড ক্লাউড প্রজেক্টর ছিল না। আলোর মায়া তৈরী করবার জন্য মিরার স্পট হাতে আসেনি। মনে পড়ে 'রক্তকবরী'র সেই বিশুনন্দিনী দৃশ্যের কথা। আলোব ছেঁড়া ছেঁড়া প্যাটার্ন দেখান হল, পিজবোর্ডে ছুরি চালিয়ে তা চিরে চিরে সেটাকে বড় বড় ফ্ল্যাড লাইটের সঙ্গে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে। 'রক্তকবরী' নাটকে শম্ভু মিত্রের পর যাঁর কথা মনে না এসে পারে না তিনি খালেদ চৌধুরী। শম্ভুদার মঞ্চ ভাবনা খালেদ চৌধুরী জীবন্ত করে তুললেন। যদিও সেইসব কাজে আমরা শম্ভুদার চিন্তায় স্নাত হয়েছিলাম। ভাবা যায়? 'রক্তকরবী'র মতো নাটক নামাতে শম্ভুদা মাত্র একটা স্টেজ রিহার্সাল করাতে পেরেছিলেন, কোনরকমে ই বি আর রেলওয়ে ম্যানসন ইন্সটিটিউটে। 'চার অধ্যায়'-এর শেষ দৃশ্যে ছাদের ধারে ক্যাকটাসের চিন্তা, দূরে দূরে বাড়ির আলো, সেগুলো নিবে নিবে দুটি ক্ষীণ আলো জ্বালানোর ভাবনা রবীন্দ্রনাথে নেই। ও চিন্তা শম্ভু মিত্রের। রবীন্দ্রনাথে বোধহয় আছে দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর আর 'পিছনে মরণের ঘন কালো যবনিকা।'

অভিনেতা শম্ভু মিত্র সম্পর্কে সাধারণ নাট্যামোদী হিসেবে এইটুকু বলতে পারি ভারতীয় থিয়েটারে তার মত অভিনেতার তুলনা পাওয়া একটু মুশকিল। শম্ভুদার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার ফলস্বরূপ বলা যায় তাঁব নাট্যচেতনা, শিল্প ভাবনা এবং আন্তরিক অথচ কঠোর ডিসিপ্লিন আমাকে ভীষনভাবে প্রভাবিত কবেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁব 'সম্মার্গ-সপর্যা' গ্রন্থের নতুন লেখা পড়লে এবং পুরানো লেখা থেকে যুগপোযগী রচনাগুলি নির্বাচন দেখলেই বোঝা যায় তাঁর চিন্তা চেতনা এখনও কত আধুনিক এবং বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন।

আজ যে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, সেইখানে উদয়শংকর অনেকদিন ধরেই তাঁর অভিনব প্রযোজনা শংকরস্কোপের আয়োজন করেছিলেন। তারপর শম্ভুদার মাথাতেই প্রথম ভাবনা এল অ্যাকাডেমিতে নিয়মিত অভিনয় করার ব্যাপারে আর সেটা শুরু হয়েছিল বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' নাটক দিয়ে। তারপর থেকেই অ্যাকাডেমির জনপ্রিয়তার সূত্রপাত। যদিও মঞ্চ হিসেবে অ্যাকাডেমিকে সার্থক আধুনিক থিয়েটার মঞ্চ বলে মানতে পারি না।

'রক্তকরবী' নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে প্রথম দিল্লিতে নাট্যোৎসবে অভিনীত হয়। তারপর থেকে সারা ভারতবর্ষে শিল্পরসিক নাট্যপ্রেমীর কাছে শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী সমাদর লাভ করে। কাজের ক্ষেত্রে আমাকে আজও সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়। ভারতবর্ষের নাটকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মান্য শ্রদ্ধেয় নাম যেটা শুনি সেটা হল শম্ভু মিত্র।

আর এই প্রসঙ্গে আরও বলতে ইচ্ছে করে আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের আর একজন মানুষের কথা তার নাম পৃথ্বীরাজ কাপুর। পৃথ্বী থিয়েটার সম্পর্কে ওঁর নাট্যভাবনা বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি শম্ভুদা। ওঁর পৃথ্বীরাজ সম্পর্কে একাধিক রচনায় তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাই। আর এই পৃথ্বীরাজজি একদিন ঘটনাক্রমে দিল্লীর রবীন্দ্ররঙ্গশালার বিরাট উন্মুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে খালি গলায় শেক্সপীয়ারের কিংলিয়ার আবৃত্তি করে শব্দ প্রতিধ্বনি

পরীক্ষা করেছিলেন, তার সঙ্গী এবং শ্রোতা ছিলাম আমি। এইসময় তিনি হঠাৎ কাঁধে হাত রেখে বলে উঠলেন শম্ভুর তাপস সেন আছে আমার যদি থাকতো তাহলে পৃথ্বী থিয়েটার তুলে দিতাম না। সবিনয়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ছেচল্লিশ সালে বম্বে ছেড়ে আসার আগে আমি প্রথমেই পৃথ্বীরাজজীর কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম আমার আলোর ভাবনা নিয়ে ওঁর পৃথ্বী থিয়েটারে কাজ করার জন্য। কিন্তু উনি জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজ (রাজকাপুর) ওঁর নাটকের আলো করে সুতরাং আর কাউকে দরকার নেই। যাই হোক, এসবই আজ স্মৃতি। শম্ভুদার সঙ্গে সে দিনগুলোর কথা মনে করার পাশাপাশি সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে শম্ভুদার লেখা 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির দৃশ্যগুলির বর্ণনা করছিলেন তার চিত্রকল্প চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন আর আমার কাজ করার চিন্তা বেড়ে যাচ্ছিল। শম্ভুদা যদি আবার চাঁদ বণিক করেন - এটা স্বপ্নই - তবু সে কাজের জন্য এবং সে কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে আমি আজও একান্ত আগ্রহী। তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গিতে মেলেনি, হয়তো বা এমন জায়গাও আছে, কিন্তু সে সবের চেয়ে অনেক অনেক বড় শম্ভু মিত্রের ব্যাপক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার স্মৃতি। শম্ভুদার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে দীর্ঘকাল কাজ করে আমার সেই উজ্জ্বল অনুপ্রেরণার কথাটাই আমি চিবকাল মনে রাখতে চাই।

খালেদ চৌধুরী

আমাদের কাজের জীবনে তো অনেক লোকের সঙ্গেই পরিচয়, জানা-চেনা। কিন্তু দু জনের নাম আলাদা করে মনে থাকবে। শুধু শিল্পের আঙ্গিনায় নয়—এই দু জনের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে ব্যাপক জানা, চেনা, পড়াশুনার ক্ষেত্রে যে অন্তরঙ্গতা তা আমার জীবনে অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। একজন বংশী-চন্দ্রগুপ্ত, আর একজন খালেদ চৌধুরী। বংশী চলচ্চিত্রের জগতে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রেখেছে। অনেক কিছুর মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সেই শুরুর সময় পথের পাঁচালী থেকে অনেক ফিল্মে তার শিল্প ভাবনার পরিচয় দিয়েছে। পরে বম্বেবাসী হয়েও কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত বংশী। কয়েক বছর আগে আমেরিকায় আকস্মিক ভাবেই ওর মৃত্যু হল।

আমার অভিজ্ঞতায় খালেদ এক আশ্চর্য্য প্রতিভা। মঞ্চ, সঙ্গীত, ধ্বনি—আবার অন্যদিকে প্রচ্ছদ অঙ্কন, অসাধারণ শৈল্পিক চেতনা। অনন্য চিন্তা-ভাবনা সব মিলিয়ে ও বিরল এক মানুষ। নাটকে বহুদিন ওর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার ঘটেছে। বহুরূপী আবার বহুরূপীর বাইরেও। 'শহীদের ডাক' সম্ভবতঃ ওর প্রথম প্রকাশ্য কাজ। পরবর্তী সময়ে 'রক্তকরবী' থেকে ওর জয়যাত্রা। রক্তকরবী'র মঞ্চসজ্জা, পোষাক পরিকল্পনা, সঙ্গীত, আবহ সবই ও করেছিল শম্ভু মিত্র মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে। স্মরণীয় ঘটনা। খুব সমাদরও হল। আর সেই প্রথম খালেদকে আমরা জানলাম-চিনলাম। বলা উচিৎ ওই চিনিয়ে দিল জানিয়ে দিল। Ibsen এর Doll's House—বুলু/তপন দম্পতির

মধ্যবিত্তের ঘর। রক্তকরবীর থেকে অন্য ধারার কাজ। ঠিক realistic set নয়—এক কালো Back drop এ প্রতীকী মঞ্চসজ্জা। কিছু arch বাঁকাচোরা কিছু লাইন নিয়ে এক চিত্রকল্প। ঘরের পর্দা বদলে এক অর্থবহ difference তৈরী করেছিল ও। সবচেয়ে অবাক করার মতো কাজ করল তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় 'ডাকঘর' নাটকে। প্রথমবার যে মঞ্চসজ্জা করেছিল পরবর্তী সময় অনেক পাল্টে দেয়। অদ্ভুত simple set, পরের কাজ 'অংশীদার'। একটা গাছ করেছিলlevel crossing এর পাশে চায়ের দোকানের ধারে। আমরা তো ভীষণ মুগ্ধ। সারা রাত ধরে নিউ এম্পায়ারে গাছটা লাগানো হল। খালেদ পরে বলল, গাছটা ঠিক হয়নি। বড় বেশী realistic—এভাবে মঞ্চে স্থাপন, ঠিক নয়। শিল্পের শর্ত অন্য। এইরকম চিন্তার অনন্যতা। আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয় যখন রক্তকরবী করে তখন total মঞ্চসজ্জাই বদলে সহজ সরল করে দিল। 'পাগলা ঘোড়া' দশদিনের তফাতে বহুরূপী আর অনামিকা করল। আমি আর খালেদ দু জনেই ছিলাম দুটো production-এ। শম্ভু বাবু একটু চিন্তিত ছিলেন। খালেদ শম্ভু বাবু আর শ্যামানন্দের ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দুই রকম মঞ্চ ডিজাইন করল। খালেদ চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব। ওর সৃজনশীলতা কোনভাবেই পরিমাপ করা যায় না। হিন্দী 'ঘরে বাইরে', তরুণ রায়ের 'রজনীগন্ধা' কি পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত অথচ নাটকের প্রয়োজনীয় মুহূর্তগুলোকে প্রকাশ করতে পেরেছিল অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। রজনীগন্ধায় pictorial অথচ কি সহজ মঞ্চসজ্জা। একমাত্র নির্মল গুহ রায়ের করা উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকারে' ছাড়া এ রকম কাজ আমি আর দেখি নি। খুব অল্প কথায় এক গভীর মাত্রা যোগ করতে পারে ও। 'কালের যাত্রা' করতে গিয়ে কী disturbed ছিল। কতবার set এর নক্সা করেছে। দুটো শ্রেণীর সংঘাত—কী সুন্দর প্রতীকী রূপ দিয়েছিল। মুক্ত অঙ্গনের মতো মঞ্চ, রূপকারের আর্থিক অনটন এ সব নিয়েই কাজটা হয়েছিল। 'সুতুরমুর্গ', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' হিন্দীতে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আজও মনে করতে পারবেন এই দুটি নাটকে দৃশ্য পরিকল্পনার কথা। একবার খুব অসুস্থ খালেদ। পাঁচ-সাত দিন মাত্র পর থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বিসর্জন' নাটকে কিছু suggestion দিল—নাটক অন্য মাত্রা পেল। আবার হালের নাটক মনোজের 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', নান্দীকারের 'শেষ সাক্ষাৎকার' কত আধুনিক। তার পরিমিতি ও চিত্রকল্প আলাদা করেই নাট্য বিষয়কে সাহায্য করেছে, পরিবেশ রচনায়। ওর ঘরানাই আলাদা। এই রকমভাবে খালেদ কতো লোকের সঙ্গে কাজ করেছে আবার যেখানে নিজে খুব অনুপ্রাণিত হতে পারে নি সেখানে কাজও করেনি। সবিতাব্রত দত্তের জন্য রূপকারের 'অচলায়তন' নাটকের প্রস্তাবে—সমগ্র নাট্যবস্তুর ভাবনা চিন্তার ঠিক মতো মন থেকে সাড়া পায় নি বলে একেবারেই রাজী হল না। পরে অবশ্য রূপকারের জন্য ঐ কাজটা আমারই একরকম করে দিতে হয়েছিল অচলায়তনের ব্যাপারে খালেদের সম্মতি পাওয়া যায় নি বলেই। নাটকের সমস্ত কিছু বুঝে ও সব সময় কাজ করেছে। ওর সাহিত্যবোধ, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী সবটাই অনেক গভীর ও সিরিয়াস।

দীর্ঘকাল নানা রকম টানাপোড়েন, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, গণনাট্যের সঙ্গে ওর যোগ তো গবেষণার বস্তু। লোকসঙ্গীতে তার আজীবন অভিনিবেশ, Institute of Folklore & Culture প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বহু প্রাচীন প্রায় হারিয়ে যাওয়া

লোক সুর সংগ্রহ, তার notation, anthology তৈরী করা, এগুলোতে ও নিজেই একটা Institution. পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ওর জ্ঞান, C. P. T. 'রামায়ণ' পুতুল নাটকে দৃশ্য ও সমস্ত চরিত্রের concept অনুযায়ী প্রাথমিক পরিকল্পনা (বাস্তব রূপদান করে সুরেশ দত্ত), যোগেশ দত্ত'র পদাবলীতে সাহায্য, নাট্যশোধ সংস্থানে নাটকের Archieve তৈরীতে ওর নিরলস, নীরব পরিশ্রম খালেদকে অন্য পরিচয়ে দেখতে পাই। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। কয়েক বছর আগে ও অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ছিল। এই রকম অবস্থায় মানুষের নানা রকম মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়। খালেদও আচ্ছন্ন, অসুস্থ, অবসন্ন অবস্থায় আধোঘুম চেতনার মাঝখানে স্বপ্নের মতো কিছু কিছু চিত্রকল্প আবছাভাবে দেখেছিল আর ঐ image গুলো বিছানায় শুয়ে রঙে রেখায় কয়েকটি বিচিত্র ছবি আঁকে ও। আমরা যারা ঐ ছবিগুলো দেখেছি সেখানে মঞ্চ, প্রচ্ছদ ও সঙ্গীত শিল্পীর সত্তা ছাড়িয়ে এক নতুন সৃষ্টির আভাস পেয়েছি বাইরের সাধারণ মানুষ এই পরিচয়টি জানতেও পারবেন না। খালেদও কাউকে দেখায় নি, বলেও নি সম্ভবতঃ। 'রক্তকরবী'র সঙ্গীত সৃষ্টির সময়ে ব্যাঞ্জো আর একতারাকে মিলিয়ে একটা বাদ্যযন্ত্র তৈরী করেছিল—নাম দিয়েছিল ব্যানতারা—পূর্ব পশ্চিমের সার্থক সমন্বয় বলা যায়।

তরুণদের জন্য ও সব সময় এগিয়ে আসে। যারা সত্যিই কিছু করতে চায় খালেদ আজও তাদের নিরাশ করে না। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি যখন তৈরী হল অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ও প্রথমে যোগ দেয় নি। তারপর প্রশিক্ষণ শিবিরের চিন্তা যখন আকাদেমি করল বিভাস, ইন্দ্রনাথ, আমি সবাই ওকে ধরলাম। ও রাজী হল এবার। পরপর বেশ কিছু প্রশিক্ষণ শিবিরে খালেদ এল। আর আমরা দল বেঁধে ওর ক্লাশগুলো শুনতাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। আসলে ও যখন কথা আরম্ভ করে তখন তার যে প্রসার, ব্যাপ্তি তাতো সহজে পরিমাপ করা যায় না। অথচ আমাদের অমনোযোগিতায় ওর এসব অসাধারণ বক্তব্যগুলো আমবা কোনভাবেই ধরে রাখতে পারি নি। এ যে কতো বড় ক্ষতি তা বলে বোঝানো যায় না। এর মধ্যেই একটা Advanced Workshop করা হবে বলে আকাদেমি ঠিক করল। খালেদ, আমি, কুমার রায় আরো অনেকে নানারকম ভাবনা-চিন্তাও শুরু করে দিলাম। আমি খালি ভাবছিলাম এবার খালেদকে বেশ মোক্ষমভাবে ধরা যাবে। অথচ আকাদেমি প্রকল্পটা চালু করতে পারল না। আমরা সবাই খুব হৈ চৈ করেই আকাদেমিতে যোগ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অনেক কিছু করা যাবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। খালেদ কাগজে-কলমে এখনও সহসভাপতি অথচ কার্য্যতঃ ও নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়েছে। আর আমরা একটা বড়ো প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলাম। খালেদের মতো মানুষের চিন্তার ফসল আমরা সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারলাম না।

এই জীবনে চলতে গেলে কতো রকমের Compromise আমরা হামেশা করি। দুই জগতে একই সঙ্গে বিচরণ করি। খালেদ কোনদিন তা করে নি। কোন রকম জোড়াতালি ওর পছন্দ নয়। ওটাকে ঘৃণা করে ও। সারা ভারতে ওর জন্য কতো কাজ পড়ে রয়েছে। বলেছি, অনুরোধ করেছি। করে নি। অথচ একবার হ্যাঁটুকু করলেই অনেক বড়ো স্কেলের কাজ করতে পারত ও। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও তথাকথিত গড্ডলিকা প্রবাহে ও

নিজেকে সমর্পণ করে নি। খালেদ তাই অনেকখানিই আমাদের থেকে আলাদা। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে নিবিড়ভাবে আছে, থাকবে, তবুও বিশেষ এক ব্যতিক্রম খালেদ চৌধুরী।

উৎপল দত্ত

সেই উনিশ'শো পঞ্চাশে কফি হাউসে উৎপল দত্তের সঙ্গে আলাপ হবার পর দীর্ঘকাল কেটে কেছে। লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রথম বাংলা নাটক কনস্ট্যানটিন সিমোনভের 'সাংবাদিক' আই.টি এফ প্যাভিলিয়নে হবার পর থেকে কত নাটক লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপে করেছি এবং আমার তখনকার অর্ধপরিণত আলো-ছায়ার চিন্তা নিয়ে উৎপলকে যা কিছু বলেছি সোৎসাহে সেটা শুনেছে এবং একসঙ্গে কাজ করেছি। আধুনিকরূপে যখন রঞ্জি স্টেডিয়ামের যুব উৎসবে 'অচলায়তন' 'কালের যাত্রা' করল তখন তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তারপর বহুকাল কেটেছে। এক হিসেবে বলতে গেলে আমার কর্মজীবনের একটা স্বর্ণযুগ উৎপলের সঙ্গে একবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সেটা হল পায় উনিশ'শ উনপঞ্চাশ-ষাটের থেকে যখন মিনার্ভা থিয়েটার অধিগ্রহণ করা হল লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের পক্ষ থেকে, সেই দশ বছর। দশটা বছর উৎপল দত্ত এল টি জি - আমরা সবাই একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি একটা পরিবারের মত। তখন প্রায় সব কিছু ভুলে গিয়ে আমরা দিনরাত ওই মিনার্ভা থিয়েটারে বিডন স্ট্রিটে পড়ে থেকেছি।

গভীর সংকটের সময়েও মাথা ঠান্ডা রেখে নাটকের প্রোডাকশন - কি করে হবে, কি করতে পারব - এসবই ভেবেছে। আমার অদ্ভুত অদ্ভুত উদ্ভট চিন্তাভাবনা, সমস্যা সম্বন্ধে যখন যা বলেছি সমস্ত কিছুতেই সে 'হ্যাঁ' বলেছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে কী হয় দেখার জন্য। না হলে বলেছে। খুশি হলে উৎসাহ দিয়েছে। উৎপলের চিন্তাভাবনার ফসল আজ সর্বজনবিদিত। এল টি জি-র সামনে যখন অনেক দুর্যোগ, সঙ্কট সেই সময় এরকম একটা 'মানুষের অধিকার'এর মতন একটা নাটক অবলীলায় অল্পদিনের মধ্যে নামিয়ে ফেলল। সেই নাটকে লিবোভিৎসের ভূমিকায় উৎপলের অভিনয় আমার মতে তার জীবনের অন্যতম সেরা অভিনয় ও প্রযোজনা। নানারকম সঙ্গীত আহরণ যে আবহসঙ্গীত এই নাটকে তৈরি করা হয়েছিল তাও একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কাজ। সেইসঙ্গে আরেকটা নাটক মনে পড়ে। 'তীর'। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় এই নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে আমি সব সময় একমত না হলেও আমরা গিয়েছিলাম নকশালবাড়ি। চারু মজুমদারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। উৎপল, আমি আর নির্মল গুহরায়। তারপর সেই 'তীর'কে সাজিয়েছিল। সেখানকার মানুষ, সেখানকার চরিত্র সব লোকজনদের দিয়ে। সেই নাটকে নানারকম রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। সেই মতবাদগুলোকে একসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিভিন্ন মানুষ বলছে-এর একটা দৃশ্য পরিকল্পনা উৎপল যেটা করেছিল আমি তো ভাবি যে পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম নাট্য প্রযোজনার দৃষ্টান্ত বোধহয় খুব কম আছে। যদিও 'তীর' খুব বেশি মানুষ দেখেনি, এবং যদিও তার কোনও ফটোগ্রাফ তার কোনও রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। কিন্তু পরপর সারি সারি কতগুলো জানালার

খোপের মধ্যে দিয়ে এক চিন্তায় এক একজন মানুষ তার কথা বলছে, কংগ্রেসি নেতা, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী, নকশালবাড়ির নেতা, পুলিসের কর্তা এবং নানান মানুষ জোতদার এবং কখনও কখনও সমস্বরে বলছে এমনকি উল্টোপাল্টা বলছে - এলোমেলো ভাবে সে এক অভূতপূর্ব মন্তাজ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল উৎপল। তেমনি তিতাসেও। তার চিরাচরিত বিচরণক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে কি করে যে তার মনে হল অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উপন্যাস থেকেও নাটক করা যায়। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। নাটক তৈরি হল। নিয়ে এল বিজন ভট্টাচর্যকে। রামকেশবের ভুমিকায়। গোকন ঘাটের মালোপাড়ার দৃশ্য, মেলার দৃশ্যগুলো মনে রাখার মত। মেলার দৃশ্যে কী অভূতপূর্ব সমাগম ঘটিয়েছিল! হলের মাঝখানে পাটাতন দিয়ে মেলার লোকের আনাগোনা—দুপাশের বাক্সে নানারকম কারুকার্য—সে একটা স্পেক্টাকুলার সিন! হঠাৎ লোককে চমকে দিত। নির্মল চৌধুরীর সঙ্গীত, বিজনদা, উৎপল ও তার সহযোগীদের অভিনয়—দারুণ জমাটি ব্যাপার। রাতে মেঘনা নদীতে গভীর ষড়যন্ত্র করে কালোবরণ হত্যা করবে—এই দৃশ্যের জন্য অনেকদিন খাটতে হয়েছিল আমাদের। ধৈর্যের সঙ্গে উৎপল অপেক্ষা করেছে। তেমনি 'কল্লোল' নাটকে রয়াল এয়ারফোর্সের বিমান আক্রমণের দৃশ্য নিয়ে আমরা হিমশিম খেয়েছি, কিন্তু উৎপল কখনও অধৈর্য হয়নি। এটাই উৎপলের সঙ্গে কাজ করার সবচেয়ে বড় আনন্দ। কতরকম এক্সপেরিমেন্ট করেছি ওই মিনার্ভা থিয়েটারের ভাঙাচোরা জিনিস নিয়ে। সে সম্পূর্ণ সহায়তা করেছে। উৎপলের সঙ্গে মিনার্ভায় কাজের দশবছর, আমাদের দুজনের জীবনেই একটা যুগলবন্দী বলা যায়। উৎপলের স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে অনেক সময়ই হয়ত আমি একমত হতে পারি না বা পারিনি, তাও করেছি আর সবশেষে কিছুকাল আগে নাট্য অকাদেমির প্রযোজনায় 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'। এতে দীর্ঘকাল বাদে আমি আর উৎপল একসঙ্গে কাজ করলাম। যে চৈতালী রাতের স্বপ্ন প্রায় কুড়িবছর আগে মিনার্ভার দৈন্যদশায় আমরা করেছি। উৎপলের 'কল্লোল' একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সমাজে এমন একটা সাড়া জাগিয়েছিল, যে ষাটের দশকের মধ্য ভাগে যুগান্তর এসেছিল। সেই 'কল্লোলে'র বিজ্ঞাপন বন্ধ করে, উৎপলকে গ্রেপ্তার করে অনেক কিছুই তো করা হল। সেই 'কল্লোল' আবার হচ্ছে। উৎপল করছে। আমি এখানে উৎপলের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি কল্লোলকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না। কল্লোলের সমসাময়িক সময়টা দরকার। যেমন 'নবান্ন'র সেই সময়কে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলা হয়ত যায় না। এখানে আমার সঙ্গে উৎপলের মত মেলেনি। কিন্তু উৎপলকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। সে আমার দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধু। উৎপলের এই নানাদিকে নানারকম নাট্যপ্রযোজনার কর্মকান্ড তাতে আমার যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দুই-ই আছে। একজন সার্থক প্রযোজক রূপে আধুনিক নাট্যপ্রয়োগরীতি পরিচালনায় যে দৃষ্টান্ত সে রেখেছে তারজন্য শুধু বাংলা নয় সারা ভারতে উৎপল দত্ত একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম।

নাটকীয় সৌমিত্র

নাটকে আলো দেবার জন্য অনেকে এসে ধরে তার মধ্যে কত অপরিচিত নতুন সংস্থা বা ব্যক্তি আমাকে অনুরোধ করেন খানিকটা সঙ্কোচও দ্বিধা নিয়ে। ভাবটা, বাবা এত নামী লোক অনেক টাকা অনেক বায়না—এই রকমই এক অনুরোধ নিয়ে অনেক বছর আগে বোধহয় উনিশশো ছাপ্পান্নো সাল হবে—এক অপরিচিত সুদর্শন যুবক আমাকে রবীন্দ্রভারতীর রথীন্দ্রমঞ্চে এসে অনুরোধ জানালো তাদের কলেজের একটি নাটকে আমি যদি আলোর দায়িত্ব নিই। আমি বোধহয় একবাক্যে রাজী হয়ে গেলাম। এবং টাকাপয়সার ব্যাপারেও অভয় দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলাম ছেলেটিকে। নাটকের নাম 'মুখোস' W.W. Jacob এর লেখা মঙ্কিস প (Monkeys Paw) অবলম্বনে লেখা—নাট্যরূপ কার মনে নেই পরে জেনেছি ঐ নাটক দিল্লিতে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিল। আরো পরে ঐ ছেলেটির পরিচয় পেয়েছিলাম যে ও নাট্যচার্য শিশির ভাদুড়ীর অনুরক্ত ছাত্র, নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—আরো পরে তাকে সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসারে আবিস্কার করি অপুর ভূমিকায়।

তারপর আজ অনেকদিন হয়ে গেল সৌমিত্র শুধু চলচ্চিত্রের সফল জনপ্রিয় অভিনেতাই নয় একজন সত্যিকারের নাট্য অনুরাগী মানুষ। থিয়েটারে ওর সঙ্গে আমার আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও কাজের সূত্রপাত হল অভিনেতৃসংঘের নাট্য প্রয়োগের ভেতর দিয়ে।

ইবসেনের 'গোষ্টস' নাটকের অনুবাদ 'বিদেহী' সৌমিত্রেরই এবং পরে অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে আরো অনেক নাটকে কাজ করেছি ঐ সংঘের দুই প্রধান যুগ্ম সম্পাদক সৌমিত্র ও অনুপকুমারের সঙ্গে। বিদেহী ছাড়াও সিনেমা শিল্পের নায়কের জীবন ও সংকট নিয়ে ও লিখেছিল 'রাজকুমার'। সেটা প্রথমে অভিনেতৃসংঘ পরে বোধহয় পাবলিক থিয়েটার কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চেও অভিনীত হয়েছিল। সৌমিত্রর সঙ্গে ওই নাটকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নায়িকার ভূমিকায় পাট করতো। সেই রাজকুমারে প্রথম সৌমিত্র একটা অংশ বেশ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে সিনেমা প্রজেকশনের ব্যবহার করেছিল এবং তাও ওরই অভিনীত অপুর সংসারের শেষ দৃশ্য সত্যজিতের ফিল্ম clipping দিয়ে। এর আগে আমি দেখেছি উৎপল দত্তের 'অজেয় ভিয়েৎনাম' প্রযোজনায় স্টেজে চলচ্চিত্রের সার্থক শিল্পসম্মত প্রয়োগ মঞ্চ আলো ও ধ্বনিও সঙ্গীতের সমন্বয়ে।

কিন্তু কলকাতার থিয়েটারে একজন আধুনিক নির্দেশকের ভূমিকায় সত্যিকারের পরিচয় পেলাম সৌমিত্র যখন পেশাদার মঞ্চে এলো ওরই লেখা নাটক 'নামজীবনে' নাট্যকার ছাড়াও এখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সার্থক ভূমিকায় ছিল নির্দেশনা ও নায়কের চরিত্র অভিনয়ে।

উৎপল দত্তের পর আমি এই প্রথম একজন আধুনিক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাট্যবিদকে পেলাম—যার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচিতি ছিল একজন আগ্রহী দর্শক হিসেবে তার চেয়ে বড়ো কথা শিশির কুমারের খাঁটি অনুগামী শিষ্য হিসেবে।

নামজীবনএ এসে দেখলাম প্রথম script reading থেকেই ও একদম জমিয়ে দিল। এরপর ধাপে ধাপে মঞ্চ পরিকল্পনার কথা এল আমি সুরেশ দত্তকে নিয়ে গেলাম সুরেশকে সৌমিত্র তার চিন্তা ভাবনা সবিস্তারে বুঝিয়ে তো দিলই, আর এও জানালো যে একটি

মাত্র দৃশ্য নাটকে শুরুর থেকে শেষ। সুরেশও সৌমিত্রর পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়নে কাজ করেছিল যাতে সৌমিত্রের স্টেজএ অভিনয়ের কম্পোজিশন আবহাওয়া সবটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। আমিও সৌমিত্রের এ নাটকে আলোর প্রয়োগ পরিকল্পনা করে বলতে গেলে সাধারণ রঙ্গালয়ে একটা ব্যতিক্রমী কাজ করার জন্য আনন্দ পেয়েছি। আধুনিক থিয়েটারের সকল বিভাগের সার্থক সমাবেশে একটা নতুন নজির স্থাপন করা গেল সৌমিত্র চ্যাটার্জীর এ প্রযোজনায়—এবং তার জন্য আমি বিশেষ করে মনে করি কাশী বিশ্বনাথের মতো মঞ্চে এই দুঃসাহসী প্রয়োগ সম্ভব করে তোলার জন্য প্রযোজক হরিদাস সন্যালের কথা। নামজীবন নাটকের খুবই নাম হয়েছিল সেদিন—অনেক আলোড়ন তুলেছে অভিনন্দনও অনেক পেয়েছে সৌমিত্র ও আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রযোগে এই নাট্যসৃষ্টি—তথাকথিত কোনও জাঁকজমক ছাড়া রূঢ় বাস্তবতার পরিবেশে একটি প্রায় বস্তির বাসিন্দারা জীবন্ত হয়ে কলকাতার একটা চেহারা হাজির করতে সক্ষম হয়েছিল সৌমিত্রর প্রথম পাবলিক থিয়েটারের আত্মপ্রকাশে—আরো অনেক অভিনন্দনের মধ্যে আমার মনে আছে আমার দীর্ঘকালের সহযোগী বন্ধু উৎপল দত্ত একটি উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ সমলোচনা লিখলেন নামজীবন প্রসঙ্গে ওদের 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায়।

নামজীবন সৌমিত্রের শিল্পবোধ পরিমিতি ও নিষ্ঠা আমাকে আবার নতুন করে উৎসাহিত করেছিল পেশাদারী থিয়েটারে পেশাদার (প্রফেশনাল) কথাটার মর্যাদার বিষয়ে। সুরেশ দত্ত কৃত দৃশ্য সজ্জা ছাড়া ও সঙ্গীতের প্রয়োগে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা ঠিক শম্ভুমিত্র ও উৎপলদত্তের সঙ্গে অতীত শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাববিনিময়ের জায়গাতেই পৌঁছেছিল। যেমন একটা দৃশ্যের শেষে নায়িকার সায়াহ্নে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, ভাঙা পলেস্তারা খসা সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে—লিলি চক্রবর্তীকে ঐ রকম একটা তেরছা (slanting) ম্লান দিন শেষের প্রায় গাঢ় রঙীন আলোয় নিস্তব্ধ বসে থাকা—ঐ জীর্ণ ফাটল ধরা ইঁটের গা বেয়ে এসে আলোটি কোন মতে বাণীর ভূমিকায় লিলির মুখাবয়ব দৃশ্যমান করল, ঐ খানে দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটায়, ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া অন্ধকারে সঙ্গীতের অনুষঙ্গে।

আরও একটি দৃশ্যের শেষে সৌমিত্র ওই বস্তিবাড়ীর ছোট একটি বালিকা রুনির সঙ্গে গল্প করছে নিজেদের ছোট জগতের সুখ দুঃখ সমস্যা নিয়ে, এমন সময় বৃষ্টির আভাস দিয়ে মেঘ গর্জন—বৃষ্টির এই ইলিউশনও সৃষ্টি করতে পারতাম কিন্তু সে সব কিছুই না করে আমি আস্তে আস্তে ওদের ওপর আলো কমিয়ে প্রায় অন্ধকার করে দিলাম এবং এই ব্যাপারটায় সৌমিত্রও একমত ছিল।

আমার ধারণা নাট্যকার শিশির কুমারের অনুপ্রেরণা তো ছিলই তার সঙ্গে দীর্ঘ দিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করে নানা বিষয়ে বিশেশত সঙ্গীত ও আবহ্ সৃষ্টির কাজে ওকে এরকম করে ভাবতে শিখিয়েছিল যেটা হয়তো খানিকটা ফিল্মিক বা প্রচলিত থিয়েটারের সঙ্গীতের থেকে আলাদা। নামজীবনে যখন মাঝে মাঝে একটু ওপরের দিকে সৌমিত্রর ক্ষুদ্র শোবার ঘরটি দৃশ্যমান খুব smoothly counter weight পুলী ব্যবস্থার সাহায্যে সামনে দেওয়ালটা উঠে যেত একটু আলো ও তার সঙ্গীতের সুপ্রয়োগে ঐ দৃশ্য উপস্থাপনার শুরুটা কত ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত।

এই নামজীবন কলকাতায় থিয়েটার আলো করে অনেকদিনই চলেছিল। তারপর প্রায়ই আমি সৌমিত্রকে সিরিয়াস থিয়েটারে আরও লাগবার জন্য তাগাদা করেছি অনেকদিন পরে আবার বিশ্বরূপা থিয়েটার ওর লেখা ফেরাতে কাজ করলাম এই নাটকের শেষের দিনগুলোতে সৌমিত্র একদিন আমাকে ওর গ্রীনরুমে বলল পরের নাটকের কথা এবং একদিন ওর নাটকটা শুনলাম ভালও লাগল, বিশেষত নাটকের মঞ্চ উপস্থাপনের কথা ওর মুখে জেনে আরও আগ্রহী হলাম, প্রস্তাবিত নাটক নীলকণ্ঠ মঞ্চস্থ হবে রঙমহল থিয়েটারে। আর ঐ রঙমহলের রিভলভিংস্টেজকে ব্যবহার করে একটিই কম্পোজিট দৃশ্যসজ্জার মধ্যে লেভেল ও ঐ নাটকের পুরোনো জমিদার বাড়ীর বিভিন্ন অংশ দেখানোর জন্য ঘূর্ণায়মান মঞ্চ অন্য রকমের ব্যবহার করার কথা সৌমিত্র আগেই বিশ্বরূপার ঘরে বসে একটা সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই এর বাক্স নাড়াচাড়া করে বুঝিয়েছিল। তাতেই আমি আকৃষ্ট হলাম, নাটক শোনার পরতো কথাই নেই।

পরে আমি রঙমহলে গিয়ে শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্ত ও নাট্য প্রযোজক শুভম (আসলে শ্রীমতী শুক্লা সেনগুপ্ত) কর্তৃপক্ষকে জানালাম সৌমিত্রের সামনেই, এ নাটক আমি ছাড়া হতে পারে না—কিন্তু আপাতত সেটা সম্ভব নয় কারণ আমি এক মাসের জন্য মস্কো চলে যাচ্ছি—সৌমিত্র আর দেবনারায়ণ বাবুরা আমার যুক্তি মেনে নিলে আমি ফেরার পরই দেরী করে নাটকের উদ্বোধন করতে রাজী হয়ে গেলেন।

আমি ফিরে এসে জানলাম যে আর তিনদিনের মধ্যে 'নীলকণ্ঠ' খোলা হচ্ছে—ইতিমধ্যে মস্কো থেকে সৌমিত্রকে টেলিফোন করে আমার দেশে ফেরার দিনটা জনিয়েছিলাম। কিন্তু অবাক হলাম সেই দেরীই তো করলেন কিন্তু এরকম একটা নাট্যপ্রযোগের প্রস্তুতির সময়ই তো পেলাম না—যেমন সৌমিত্র আগের নাটক 'ফেরার' সময় বিশ্বরূপায় পারেনি—প্রযোজক ছিলেন ঐ শুক্লা সেনগুপ্তরাই নানা কারণে ওদের তিনদিনের মধ্যে নাটক খোলার বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ছিল এবং আমিও সেটা স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

যাই হোক নীলকণ্ঠ ঘোষিত উদ্বোধনের ঠিক তিনদিন আগে এলাম রিহার্সালে—শুরুতেই মেজাজ খারাপ sound বা Music পাওয়া যাবে না কারণ সেই কর্মী সেদিন আসেন নি। একে রিভলভিং স্টেজের নতুন ভাবে প্রয়োগ তার সঙ্গে আলো মঞ্চ শব্দ আবহ সবকিছু জড়িয়ে—তবু ভাবলাম দেখাই যাক ধৈর্য ধরে। একটানা রিহার্সাল চলল এবং আমি তো সম্পূর্ণটা দেখে বলে দিলাম ঠিক আছে অমুক দিনই বই খোলা হবে। আমার সহকারী দুলাল সিংহ তো অবাক, আমি বললাম সমস্ত ব্যাপারটা আজ এতই নিখুঁত ও পরিপাটি শব্দ ও সঙ্গীত বাদে যে আমি স্থির করে ফেললাম দুদিনেই আলোর ব্যবস্থাটা করে দিতে পারব, কারণ ইতিমধ্যে সৌমিত্র পুরো প্রডাকশনটায় একটা সম্পূর্ণ চেহারা দাঁড় করিয়েছে—একমাত্র সেট তৈরীর ব্যাপারে নির্মলগুহ রায়ের কিছু কাজকর্ম বাকী ছিল—সেগুলো আমি শেষ মুহূর্তে প্রযোজকদের সহযোগিতায় ম্যানেজ করে নিলাম।

নীলকণ্ঠ নাটকে মঞ্চপরিকল্পনা অভিনয় সবকিছুর অভিনবত্বের মধ্যে সৌমিত্রের মৌলিক কল্পনার পরিচয় পেয়েছি আর সে কারণেই ঐ নাটকে আমিও অন্য রকম করে আলোর বিন্যাস করতে মজা পেয়েছি, দৃশ্যান্তরে স্টেজ ঘুরিয়ে ব্যবহার তো ছিলই। তাছাড়া নাটকের মাঝখানে সাঙ্গপাঙ্গদের প্ররোচনায় মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ও উত্তরোত্তর মদ খেতে বাধ্য

হয়ে যে অসহায় বেহেড মাতলামীতে রূপান্তর হবার সংযত অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাবান্তর মঞ্চে আমি খুব কমই দেখেছি। অস্তস্তিমিত নীচু কোন থেকে আসা আলোয় সেই আর্ত বিদ্ধস্ত অসহায় মানসিকতার যে অভিব্যক্তি ওই নাটকে প্রকাশ করতে পেরেছিল আজও আমার মনে সে স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। আর এই ধরনের ভিন্নধর্মী ব্যতিক্রমী নাট্য প্রয়াসের জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ শুভম কর্তৃপক্ষ, শুধু নিছক আর্থিক লাভের কথা মনে রেখে এঁরা কিন্তু ও নাটক অনেক দিন ধরে মঞ্চে প্রথমে রঙমহল পরে বিশ্বরূপায় চালান নি।

সৌমিত্রর মতো আমার প্রিয় নির্দেশকের কাছে একটাই ক্ষোভ সৌমিত্র এত ভাল নাটক সংলাপ লেখে, কিন্তু সব সময়েই কেন যে বিদেশী নাটকের ওপর ভরসা করে আসছে এবং তার যথেষ্ট সার্থক ও বিশ্বাসযোগ্য রূপান্তর করতেও সক্ষম হয়েছে—একমাত্র ইবসেনের 'গোস্টস' শুধু অনুবাদ করেছিল, যদিও খুব ভাল অনুবাদ, তবু বলব চলতি কথা প্রবাদবাক্যে ও ভাষার ওপর যার এত দখল সে মানুষটা কেন নিজে নাটক লিখবে না নতুন করে—যদিও ও সবসময় বলে যে ও ব্যাপারটা ওর সাধ্যের বাইরে, আমি কিন্তু তা মনে করিনা সৌমিত্র চ্যাটার্জির মধ্যে একজন প্রচুর সম্ভবনা ও প্রতিশ্রুতিময় নাট্যকার লুকিয়ে আছে—সৌমিত্র একটু উঠে পড়ে লাগলেই হয়।

দৃশ্যকাব্যের অঙ্গন : ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত

পশ্চিম থেকে আমদানী করা ভারতের আধুনিক থিয়েটার অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় নিয়েছে সেই জায়গায় এসে পৌঁছতে, যেখানে দাঁড়িয়ে সে তার নিজস্ব সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে নিজের মত করে চিন্তা করতে পারে। বহুকাল যাবৎ দৃশ্য পরিকল্পনা বা মঞ্চকৌশলের কাজ প্রাসাদ-রাজপথ-রাজকীয় উদ্যান দরবার ইত্যাদি আঁকা রোলারে জড়ানো পটেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই রীতির বাইরে প্রথম পদক্ষেপ ঘটল ফ্লাই গ্যালারির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যা আঁকা সীনের উর্দ্ধগতি লুকোতে সাহায্য করল। ক্রমশঃ এই প্রমাণসাইজ সীন থেকে এল কাপড়ে-আঁকা ফ্ল্যাট আর সত্যিকারের দরজা জানালা সমেত বক্সসেটিং। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উদ্ভাবনায় সূচিত হল স্বয়ংনির্ভর ফ্ল্যাটের প্রয়োজন। স্বল্পতর পরিধির ডিস্ক এর জন্য দৃশ্যপরিকল্পনাকারীরা বাধ্য হলেন মঞ্চকে তিনটি সমান অথবা প্রায় সমান অংশে ভাগ করে অভিনয়ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে ফেলতে। এই সময়ে কমপোজিশন এবং পরিবেশ রচনার দিকে দৃষ্টি প্রায় দেওয়াই হয়নি। এই সংক্রান্ত সমস্ত চিন্তা ভাবনা ছিল ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্রকলার প্রভাবে আচ্ছন্ন—দ্বিমাত্রিক অংকনশৈলী, সূক্ষ্ম, স্পষ্ট রেখায় আঁকা চরিত্রের এবং গাছপালা মেঘ নদী সূর্য চাঁদ ইত্যাদির কন্টুর। তৎকালীন মঞ্চসজ্জার বিবর্তনে ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা এবং একটা সামগ্রিক দৃশ্যক্ষেত্র রূপায়নে আলো ও রঙের সমতা সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছিল উগ্র অর্থহীন জাঁকজমকে, বৈচিত্র্যহীন ওভারসিমেট্রিক্যাল থাম ও খিলানের সমাবেশে তথা উড়ন্ত পরী বা শিরচ্ছেদ দৃশ্য জাতীয় পাইরোটেকনিক এবং আয়নার ম্যাজিকের প্রাবল্যে।

অ্যাংগুলার (কোনাকোনি) খিলান সিঁড়ি প্ল্যাটফর্ম আর আলোক প্রক্ষেপণের ব্যবহার সমেত সলিড ত্রিমাত্রিক সেটের রূপায়ণ সম্ভবপর হওয়ার ফলে দৃষ্টিভঙ্গির এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল। উইংস ঝালর এবং অদৃশ্য চতুর্থ দেওয়ালে ঘেরা ঘন বর্গসদৃশ সীনিক স্পেসের শুরু হল। এই নতুন অধ্যায়ে আলো তার প্রক্ষেপ কোণ, রঙ এবং উজ্জ্বলতার অসীম বৈচিত্র্য এবং অবাধ মিশ্রণের স্বাধীনতা নিয়ে আক্রমণ করল অভিনেতা এবং সেট কে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য উন্নততর যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠতর রঙ্গমঞ্চ, উপযুক্ত ডিমার কন্ট্রোল বোর্ড আর স্পট লাইট সমন্বিত আধুনিক আলোক বিন্যাস এবং বামপন্থী থিয়েটারের আবির্ভাব আগেকার চমকপ্রদ দৃশ্য রচনা প্রথাকে আদর্শগত এবং তত্ত্বগতভাবে বাতিল করল। পঞ্চাশের দশকের নবীন পরিচালকেরা সদ্য তৈরী থিয়েটারগুলোকেও যেমন কাজে লাগালেন তেমনি আবার বাঁশ-চট-ত্রিপলে গড়া অস্থায়ী মঞ্চে নাটক করতে করতে ছড়িয়ে পড়লেন সমস্ত দেশ জুড়ে। প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের

বাইরে এই নতুন থিয়েটারের চ্যালেঞ্জ অল্প খরচে দৃশ্য পরিকল্পনা, কম্পোজিট সেট, প্রতীকি অথবা ব্যঞ্জনাধর্মী আলোকসম্পাত সবকিছু মিলিয়ে সাহসী পরীক্ষার বহু বিচিত্র ফসল গ্রাম ও শহরের দর্শককে করল সমানভাবে প্রভাবিত। নতুন গ্রুপগুলো; যারা অজস্র অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক অসুবিধার সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল তারা ক্রমশঃ নানা রূপ, রঙ, রেখা ও আকারের স্বল্পব্যয় কিন্তু শিল্পোত্তীর্ণ মঞ্চ ভাষায় আত্মস্থ হতে থাকল। শহরের থিয়েটারও ক্রমশঃ দারিদ্র্যের চাপে রঙ্গালয় বিচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিলো পার্কে, গুদামে, কারখানা প্রাঙ্গণে, স্কুল বা লাইব্রেরীর হল ঘরে, বেসমেন্টে—ঐশ্বর্যহীন অথচ প্রাণবন্ত সান্নিধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন থিয়েটারের দাবীও মাথা তুলে দাঁড়াল বড় শহর সর্বত্র, যে থিয়েটারে দৃশ্যমান স্পেস কে কাজে লাগানো যাবে সবরকমভাবে, সবদিক থেকে।

দৃশ্য নির্মাণ এবং রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে নানা মাপের স্কোয়্যার, কিউব, অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ গোলক, বক্ররেখা প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। এগুলো জোড়া দেবার নির্ঝঞ্ঝাট অথচ মজবুত ব্যবস্থার কথাও এই সঙ্গে ভাবতে হবে। এর সঙ্গে নানা আকৃতি ও আয়তনের ট্র্যানসলুসেন্ট অর্থাৎ অর্ধস্বচ্ছ বা প্রায়স্বচ্ছ উপাদানে গড়া ফ্ল্যাটও আসতে পারে, যার ওপর আলোছায়ার কমা বাড়া এবং রঙের খেলার মধ্যে দিয়ে অসাধারণ ছবি ও আবহাওয়া তৈরী করা সম্ভব। মঞ্চসজ্জার ভারও এতে অনেক কমিয়ে ফেলা যাবে। সুতবাং বলা যায় এই আঙ্গিকে মঞ্চে ছবি তৈরী করতে আলো প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। অভিনয় ভূমি প্রসারিত বা সংকুচিত করাতেও তার নিয়ামক দায়িত্ব রয়েছে। কাজের জন্য আরও বড় জায়গার ব্যবস্থা যেমন দরকার তেমনি প্রেক্ষাগারে দর্শকগণের অংশ এবং মঞ্চে অভিনয় এলাকার পাল্টাপাল্টি করার অর্থাৎ ইন্টারচেঞ্জেবিলিটির সুযোগ সৃষ্টি করার দরকার—এই দুই স্তরের নিয়ন্ত্রণের জন্য যান্ত্রিক কৌশলও থাকা দরকার। যে কোন দিকে এবং উচ্চতায় আলো, সেট এবং অন্য যন্ত্রপাতি লাগানর মত ফ্রেমওয়ার্ক রাখতে হবে। অভিনয় ক্ষেত্রের কোন কোন অংশ প্রায়ই মাস্‌ক করতে হয়: সেজন্য স্বয়ং নির্ভর ফ্ল্যাট বা ফ্রেমে আঁটা পর্দা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রসেনিয়াম ফ্রেমের বিশেষ সুবিধা এই যে, এখানে আলো গভীরতা আনতে পারে, এমফ্যাসাইজ করতে পারে, আলোক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মডেলিং-এর সুযোগ দেয়। প্রসেনিয়াম মঞ্চের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভব হয়েছে দৃষ্টিরেখাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাচ্ছে বলে। কিন্তু আজ প্রথানুগ প্রসেনিয়াম ফ্রেমের সম্বন্ধে যে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য মূলতঃ দায়ী ইতালির স্টাইলের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের গুরুভার এবং আতিশয্যে আক্রান্ত দৃষ্টান্তসমূহ। অথচ যতই আমরা অনির্দিষ্ট অভিনয় অঙ্গনের দিকে এগোই ততই দর্শকের কল্পনার ওপর চাপ দিতে হয়। এই পদ্ধতির থিয়েটারে দর্শক ও নাটকের মধ্যে ফাঁক ভরাট করা চলে একমাত্র আলোর সৃষ্টিশীল প্রয়োগের মাধ্যমেই। বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বস্তুর আকৃতি, তার টেকসচার, রঙ, কোণ সব মিলিয়ে, শিল্পসম্মত আলোকসম্পাতের মাধ্যমে আশ্চর্য দৃষ্টিনন্দন এফেক্‌ট তৈরী করা যায় যা অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে নাট্য মুহূর্তের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তটির মূল স্পন্দন পরিবর্তমান আলোক প্রক্ষেপণের প্যাটার্ণে স্পন্দিত করা যায়। এভাবে সূক্ষ্ম আলোক পরিকল্পনার ভাষায় মানুষেব

অভিজ্ঞতার সমগ্র সম্পদ কে অনূদিত করা যায়, দৃশ্যসৃষ্টির শিল্পসমৃদ্ধ এবং ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন প্রকরণ আয়ত্বে আসে। আবার ব্যয় সংকোচ এবং আঙ্গিক সারল্যের ঝোঁক যেন বেশি দূর না যায় তাও দেখা দরকার। যে কোন দৃশ্যকল্পনাতেই তার নিজস্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকতে হবে। নাটকের অন্তর্বস্তুর সঙ্গে সেই কল্পনার যেন কায়িক সংযোগ থাকে, তা যেন দর্শকের বোধগম্য হয়। অ্যাবস্ট্রাকশন এবং প্রতীকধর্মীতার অবাধ প্রকাশে কোন বাধা নেই, তবু মূল নাট্যবস্তুর কথা মনে রাখতে হবে সব কিছুতেই। ন্যাচারালিস্টক না হয়েও রূপ এবং আকৃতিকে সুনির্দিষ্ট পরিচ্ছন্নতায় আনা যায়।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা আধুনিক বহুমূল্য যন্ত্রপাতিকে দূরে ঠেলে দিলেও অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ নগণ্য মাল-মশলা দিয়ে খুব ভাল ভাবে তাদের অভাব পুরণ করা যায়, করা সম্ভব, যদি সত্যিকারের কল্পনা শক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। ভারতীয় থিয়েটারের সঙ্গে বহু বছরের যোগাযোগের সক্রিয় অভিজ্ঞতায় এটাই শিখেছি। নতুন থিয়েটারের দৃশ্য পরিকল্পকের এটা ভুললে চলবে না। আমাদের দেশে যেখানে আরো অনেক থিয়েটার চাই শহরে এবং শহরের বাইরে, সেখানে সমস্ত সীনিক স্পেস সম্পর্কে প্রচুর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া দরকার। যে উন্নতশীল দেশের বিকাশের চরিত্র সব জায়গায় সমান নয় তার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন এবং সুবিধাও আলাদা আলাদা হবে। ভারতের মত দেশের পক্ষে সীনিক স্পেস তৈরীর কোন একটা ফরমূলা দেওয়া যায় না বা দেওয়া গেলেও সেটা সুদীর্ঘ পরীক্ষা সাপেক্ষ বিষয়। তবু কাজ চালিয়ে যেতেই হবে—অল্প সময়ে অল্প বাজেটে ছোট থিয়েটারের জন্য, আরও বেশি অভিনয়ের জন্য, আধুনিক থিয়েটার এবং ব্যাপক জাতীয় দর্শক সমাজকে পরস্পরের কাছে পরিচিত করে তোলার জন্য।

[বিগত মার্চ ১৭-২২, ১৯৩৭ পারীতে নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশকদের এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন ইউনেসকো ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনষ্টিট্যুট প্রখ্যাত আলোকশিল্পী শ্রীতাপস সেন ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েও নানা কারণে যেতে পারেন নি। 'সীনিক স্পেস : ইণ্ডিয়ান পার্সপেকটিভ' নামক তাঁর একটি নিবন্ধ ওই বিশ্ব সম্মেলনে তাঁর অনুপস্থিতিতে পঠিত হয়।]

আলো ও ছায়া

মানুষের মনের উপর আলোর প্রভাব কাজ করে একেবারে শৈশব থেকেই—মায়ের মুখখানি ও অতি পরিচিত মুখগুলির ছোট্ট গণ্ডি থেকে শুরু করে, নানা বস্তু, বর্ণ এবং চেনাজানা মুখগুলির সম্পর্কে দৃষ্টিপ্রসূত অনুভূতির মধ্যে দিয়েই বাইরের বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা আসে। ধীরে ধীরে কেটে যায় দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিপ্রসূত অভিজ্ঞতায় পাওয়া সমস্ত ধারণাগুলি মনের মধ্যে জমা হতে থাকে। ছোট ও বড, গতিশীল ও স্থির, উজ্জ্বল ও মলিন, নানা দৃশ্য বস্তুগুলি—সচেতন ও অচেতন, উভয় প্রণালীর সাহায্যেই প্রাত্যহিক জীবনের দৃশ্যগুলির নানা অনুষঙ্গরূপে মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকে।

এই পদ্ধতি, মনের মধ্যে দৃষ্টিজাত অর্থের এক সম্ভারের সৃষ্টি করে—এবং সকল যুগের সকল জাতির শিল্পী ও সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে প্রতীক এবং ভাবনার প্রকৃত উৎসের কাজ করে। মানুষের জীবনপথের সূচনাপর্বে—যখন সে প্রথম দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে, তখন থেকেই সে চারিদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে,—তারায় ভরা আকাশ, সূর্যের উদয়, বিভিন্ন ও বিচিত্র আকারের মেঘের সমাবেশ, চন্দ্র, বজ্র এবং বিদ্যুৎ (অবশ্যই শব্দের ব্যঞ্জনা সহ), গাছপালা, গুহা, পর্বত, নদনদী, সাগরতরঙ্গ, প্রবহমান জলধারা, এবং সেই জলধারায় ঝিকমিক করে ওঠা আলোর নানান নক্সা। কালিদাস, হোমার, গ্যেটে, শেক্‌সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সকল সৃজনশীল শিল্পীকেই প্রেরণা দিয়েছে এই বিশাল দৃশ্যপট।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন বলে মনে হয়, কিন্তু একজন সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল পর্যবেক্ষকের কাছে,—আলো ও ছায়া, রঙ ও রূপের এই বিচিত্র ব্যাপারগুলিও বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় মনে হয়। সেইজন্য, কেবলমাত্র দুটি চোখ মেলে সবকিছু বিশদভাবে দেখে শুধু মনের মধ্যে জমিয়ে রাখাই নয়, আমরা আমাদের অন্তরের তাগিদে উদ্দেশ্যগত ভাবেই বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করি, নতুন করে প্রকাশ করার চেষ্টা করি—গল্পবলা থেকে শুরু করে রূপকথা, ঘুমপাড়ানী গান থেকে শুরু করে কবিতা, কিংবা প্রাচীন আখ্যানকথা, চিত্র, ভাস্কর্য, এবং অবশ্যই নাটক, চলচ্চিত্র ও নৃত্যকলায়।

প্রযুক্তিবিদ্যা এবং আলোকবিজ্ঞানের উন্নতি এবং অগ্রগতি সভ্য মানুষের কাছে সক্রিয়ভাবে এবং ইচ্ছানুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আলোক ও তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ এনে দিয়েছে। অন্য সব ক্ষেত্রের মত থিয়েটারও সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োগবিদ্যার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে উদ্যত হয়েছে। এমন কি, বিগত শতক শেষ হওয়ার মুখে—যখন বৈদ্যুতিক আলোক সরঞ্জামের কোন অস্তিত্বই ছিল না—তখন অ্যাডল্‌ফ আপিয়া ও গর্ডন ক্রেগের

মত ব্যক্তি মঞ্চ নামক ত্রিমাত্রিক আয়তনের অন্ধকার কুঠরিটিকে সেইভাবে ব্যবহার করার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁদের ভাবনা চিন্তাকে নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

ভারতের প্রসিনিয়াম থিয়েটারে পশ্চিমের থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে। আর সব ক্ষেত্রের মতই বিগত দুই শত বছর ধরে বিদেশে যে বিকাশ ঘটেছে, তার ভাবধারা সরাসরি গ্রহণ করে আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে স্থাপত্যরীতি ও আলোকসম্পাতের পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু মঞ্চকলার ক্ষেত্রে আমাদের পরিচালক, নাট্যকার এবং কলাকুশলীদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত সঙ্গতির অভাব, কারিগরিশিল্প, এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদ অবস্থা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন করেছে ঠিকই—কিন্তু অনেক সময়েই অর্থসংস্থান, মহলা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সীমিত সুযোগের মধ্যেও যেটুকু সাজসরঞ্জাম পাওয়া সম্ভব,—তারই সাহায্যে কল্পনাশক্তির প্রয়োগে সেইসব সমস্যার সমাধান হয়েছে।

অতএব, উন্নত ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি,—যেগুলি আমদানী বা ঋণের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব,—সেগুলির প্রয়োজন এবং গুরুত্ব, থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান শৈল্পিক উপায়েও করা অসম্ভব নয়। ধৈর্য, চেষ্টা এবং চিন্তা ভাবনা, বিস্ময়করভাবেই যথাযথ সমাধানের পথ দেখাতে পারে। নিরুপায় সীমাবদ্ধতাই সৃজনশীলকে বাধ্য করে তার কল্পনাশক্তি এবং প্রাত্যহিক বিভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে। এই অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় শিক্ষক আর আছে বলে মনে হয় না।

পরিশেষে, স্থপতি, প্রযুক্তিবিদ এবং নির্মাণকারীদের মধ্যে থিয়েটারের শিল্পগত এবং প্রযুক্তিগত যেমন, মঞ্চের সঠিক অবস্থান, আলোকসম্পাত, শব্দক্ষেপণ,—এই উভয় দিকের প্রয়োজন সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা থাকলে, যেমন সবদিক থেকে সুবিধাজনক হয়, তেমনি তাদের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক একটা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে যেটি অত্যন্ত মূল্যবান। সেক্ষেত্রে থিয়েটারের আয়তন, তার নানা সমস্যা, অর্থসংস্থান এবং আলোক-সম্পাতের সাজসরঞ্জামের বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে যদি নতুন কোন থিয়েটারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তবে সেই থিয়েটার শুধু বর্তমানেরই নয়, ভবিষ্যতের শিল্পীদেরও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

মহাশূন্যে আলোকসম্পাত

এই উপস্থাপনাটি শুরু হয় এক নাটকীয় পরিবেশে, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, সভাপতির টেবিলের পেছনে রাখা শুধুমাত্র একটি মোমবাতির আলোয়, যে আলোর আবছা দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল মঞ্চ ছাপান অভিক্ষেপণ পর্দাটির ওপর; বক্তা কথা বলতে শুরু করতেই তাঁর গলা প্রেক্ষাগৃহের পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল, কথা বলতে বলতে তিনি আসনগুলির মাঝখানের পথ দিয়ে হেঁটে এসে মঞ্চে উঠলেন। মঞ্চে ওঠার পর মোমবাতিটি তুলে নিয়ে তিনি এই প্রথম সেটিকে সকলের দৃষ্টিগোচর করলেন; মোমবাতিটিকে টেবিলের ওপর রাখার আগে তিনি সেটিকে ব্যবহার করলেন তাঁর নিজের ও সভাপতির মুখ আলোকিত করে তাঁদের পরিপার্শ্ব ছায়াচ্ছন্ন করে তোলার জন্য। তারপর মোমবাতির আলোতেই তিনি বলতে লাগলেন:

একেবারে শুরুতে ছিল শব্দ আর আলো—বা অন্ধকার। আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, অন্ধকারে আমাকে অনুভব করতে—আমার অবস্থান নিরূপণ করতে পারছেন আপনাদের দুটি কানের সাহায্যে যা আপনাদের আর আমার মাঝখানের আয়তনটির ভেতর মধ্যস্থতা করছে। আপনাদের শ্রবণশক্তি আমার স্বরের গতিপথ এবং গভীরতা সম্বন্ধে আপনাদের জন্য একটি প্রায়-নিখুঁত অনুভব তৈরি করে দিচ্ছে। শব্দের অবস্থান নির্দেশ দিয়েই প্রত্যক্ষ চেতনার সূচনা। আর তা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই পুরাবৃত্ততে যা শুধু আমার নয়, আপনাদেরও।

আমার কাছে কোন আদর্শ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় প্রদীপ নেই, কিন্তু এই মোমবাতিটি তদৃশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে একটি ছোট্ট, কাঁপাকাঁপা আলো স্পেসের অনুভব সৃষ্টি করতে পারে। আলো এবং শব্দ দ্বারা সৃষ্ট এই আয়তনের চেতনা পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহটিতে প্রাণের আরম্ভ থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, এমনকি যখন প্রাণ ছিল সমুদ্রগর্ভস্থ—যখন প্রাণের নিম্নতম ও সরলতম রূপগুলির—এককোষী এ্যামিওবা, প্রোটজোয়া বর্গ—উৎপত্তি হয়েছিল সেই তখন থেকেই। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সঙ্গে চলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্বনিয়ন্ত্রিত চলন ও ইন্দ্রিয়জ কার্যের আদিমতম নিদর্শন এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আলোকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে টিকে থাকবার জন্য এককোষী উদ্ভিদদের আলোর প্রয়োজন ছিল। এ্যামিওবা চলার ও খাওয়ার সময় তার আকৃতি বদলাত এবং এই ভাবেই সে ভেতরে ও বাইরে আয়তনের সৃষ্টি করত। জলে ভেসে থাকা জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের কণিকার চারপাশে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর সেটিকে নিজের শরীরের মধ্যে টেনে নিয়ে এ্যামিওবা খেত। খাবার হজম করে তাকে প্রোটোপ্লাজমে পরিণত করে নিজের আকৃতি বৃদ্ধি করত; আর আবর্জনাটুকুকে ফেলে দিতে পারত শুধুমাত্র চলবার সময় সেটিকে পেছনে রেখে গিয়ে। নিযুত বর্ষ আগে এ্যামিওবারই মত কোন প্রাণী থেকে সব জীবিত প্রাণীর উৎপত্তি। সে সময় মেরুদন্ডবিশিষ্ট কোন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। আর অনেক পরে তারা এল, আদিম মাছ থেকে শুরু করে পরম্পরাক্রমে উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি এবং তারপর স্তন্যপায়ী জন্তুতে পরিণত

হয়ে। বিবর্তনের সূত্রের সব ক্ষেত্রেই প্রাণের বহুরূপ আছে যা ক্রমশঃ পরিণত এবং আরও পরিণত হয়ে উঠেছে।

যখন মাছেরা, সরীসৃপেরা আর উভচর প্রাণীরা ওপর-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে, চারপাশে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের সেই সন্ধান-ক্রিয়ায় জলের আয়তন একটি সংজ্ঞা পেত। আমাদেরও একটি আয়তন আছে, যা শূণ্য নয়, তা একটি বায়ুমণ্ডল। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত, বিশ্বজাগতিক এই আয়তনের সমগ্র শূণ্যতা ইথার দিয়ে পরিপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হত, যে ধারণা বিজ্ঞান দ্বারা অসমর্থিত, যে বিজ্ঞান এখন বিশ্বজাগতিক আয়তনে—বহিরঙ্গ এবং অন্তর্লীন দুয়েতেই—ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে।

বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে আয়তনের কথা বলতে গিয়ে, আমাদের শুধু আয়তন সম্পর্কিত চলতি ধারণাগুলির দিকে মনোযোগ দিলেই চলবে না, আয়তন-কাল সম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে আয়তনের বক্রতা সংক্রান্ত চিন্তাউদ্রেককারী কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষক প্রশ্নের আলোচনাও করতে হবে। আমার মনে হয় আয়তনতত্ত্বের দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক তল-সংক্রান্ত আবিস্কারের গত শতাব্দীর দুটি নমুনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এ. এফ. মোবিয়াস (১৭৯০-১৮৬৮) আবিষ্কৃত মোবিয়াস স্ট্রিপ ফালির আকারে একটি আশ্চর্য কাগজের তল যার অন্যকোন পিঠ নেই, যেটি তৈরি একটি সরু আয়তাকার কাগজের ফালিতে ১৮০ ডিগ্রী আধা-পাক দিয়ে, তারপর তার দুই প্রান্তকে এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে। আর তাতেই সৃষ্টি হয়ে যায় বাঁকওয়ালা একটি মাত্র তল। এই একপিঠওয়ালা ফালিটি কল্পনা করা শক্ত, কিন্তু তৈরি করা সোজা, আর অপ্রত্যাশিত নানা বৈশিষ্ট্যে ভরা। দ্বিতীয় নিদর্শনটি হল ক্লাইনের বোতল, অন্তর্লীন ও বহিরঙ্গ আয়তনের প্রেক্ষিতে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিত। ক্লাইনের বোতলের ভেতরটি ফেলিক্স ক্লাইন (১৮৪৯-১৯২৫) এমন অদ্ভুতভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন যে তার ভেতরের অংশটি বাইরের বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে একটি কানা-বিহীন অবিচ্ছিন্ন সমতলের সৃষ্টি করেছিল। ক্লাইনের বোতলের সঙ্গে মোবিয়াস ফালি জুড়ে নিয়ে একটি লিমেরিক আছে, সেটা এইরকম:

গণিতের বিশারদ, ক্লাইন নাম তার
ভাবে মোবিয়াস স্ট্রিপ স্বর্গের ব্যাপার
বলল সে স্ট্রিপ জুড়ে দাও
গোড়া-আগা যদি আটকাও
বিচিত্র বোতল পাবে, যেমন আমার।

পাখিরা যখন খাবারের খোঁজে, কিংবা নিছক আনন্দেই বা খেলতে খেলতে, ওপরে-নীচে বা পূর্বে-পশ্চিমে উড়ত তখন তারা বায়ুমন্ডলের যে আয়তন ব্যবহার করত তার বিবর্তন ঘটেছিল সেই সব উভচরদের আনাগোনায় যারা পৃথিবীর আদিম কালে ঘোরাফেরা করতে পারত।

আপনারা দেখতে পারছেন এবং অনুভব করতেও পারছেন যে এই কথা বলতে বলতেই টেবিলের ওপর রাখা আলোটির আরও কাছে সরে এসে আমি আমার অবস্থানটি বদলে নিয়েছি। যেই আমি শিখাটি থেকে সরে যাচ্ছি অমনি আমার সম্বন্ধে আপনাদের অনুভবটিও বদলে যাচ্ছে। অথচ, আমি যা সত্যিই বদলাচ্ছি তা হচ্ছে আমার সম্বন্ধে আয়তন-গত

অবস্থান। এই ভাবেই আপনি আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। সমুদ্রের নীচে জীবনের প্রকাশগুলির মধ্যে, এককোষী জীবগুলির আলো প্রত্যক্ষ করার মত কোন উপকরণ ছিল না। তাদের শুধু এমন কয়েকটি টোল ছিল যা আলো বা ছায়া বা অন্ধকারে সেন্‌সিটিভ, এবং এইভাবেই তারা নিজেদের প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি অনুভূতিশীল ছিল যার ফলে তারা যা নাকি তাদের অস্তিত্বকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছুর আরও কাছে বা আরও দূরে সরে যেতে পারত। ক্রমশঃ এই টোলগুলি কিছু কোষ ও স্নায়ুর একটি জটিল সমন্বয়ে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে পরিণতি লাভ করল প্রত্যক্ষ চেতনার দুটি উপাদানে—চক্ষু যা আলো গ্রহণ করার যন্ত্র, আর মস্তিষ্ক যা চক্ষু দ্বারা প্রেরিত বার্তাগুলির সর্বশেষ ব্যাখ্যাকার।

আগুন ধরে রাখার আধার এই মোমবাতি, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক প্রবর্তনগুলির মধ্যে অন্যতম, যার পরে এল চাকা, প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে সবচেয়ে জরুরি আবিস্কার। বিজলি বাতি এসেছে আরও পরে।

(বক্তা ইলেকট্রিশিয়ানকে নির্দেশ দিলেন পাদপ্রদীপের সমতলে রাখা একটি বাক্সের উপর বসান বৈদ্যুতিক আলোর একটি বাল্‌ব জ্বেলে দিতে।)

তাহলে আলোর আদিম রূপগুলির একটি—খোলা নগ্ন সেই আলো যা কাঁপে—আর এবার আমরা পেলাম বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌ব যা ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে বিবর্তনের আরও নানা পর্যায়।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে, হোমো সেপিয়েন্‌সরা যে ধারাটির অন্তর্ভুক্ত তাদের বলা হয় প্রাইমেট, বা মুখ ধারা, মানুষের সংশোধনাতীত দম্ভের একটি আদর্শ উদাহরণ। ষাট নিযুত বর্ষ আগে যখন প্রাইমেটরা অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়, তখন তারা গাছে বাস করতে শুরু করে এবং বৃক্ষনির্ভর জীবন বেছে নেয়, সেই সঙ্গে ডাল আঁকড়ে ধরার মত হাত তাদের তৈরি হয়। প্রায় চল্লিশ নিযুত বর্ষ পূর্বে, কিছু কিছু প্রাইমেটদের দ্বিনেত্র-নির্ভর দৃষ্টিশক্তি তৈরি হয়, সেই সঙ্গে রঙ চেনবার দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তিকে সহজতর করে তোলবার মত বৃহত্তর মস্তিষ্ক। শূন্যের মধ্যে এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাতায়াতের প্রয়োজন আয়তনের অনুভবের বিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। খাবারের প্রয়োজনে মাটির ওপর সমান্তরাল একটি অন্য চলনও ছিল। বৃক্ষ-নির্ভর জীবনের প্রয়োজনে দুটি জরুরি বিবর্তনকে পরিণতি দিল, যথা চোখের রশ্মিকেন্দ্রানুসরণ ক্ষমতা এবং ব্রডমানের স্ট্রিয়েট কর্টেক্স নামক মস্তিষ্কের সেই জটিল ক্ষেত্রের মধ্যে স্নায়বিক বেগের প্রবাহ, যেখানে সেটি শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন মত ব্যাখ্যাত হয়, এবং বা অবস্থানুযায়ী প্রাইমেটটিকে লাফাতে ও তার শিশুটিকে কুড়িয়ে নিতে—রক্ষা করতে বা তাকে খাওয়াতে সক্ষম করে তোলে।

যখন একটি মানবশিশু বড় হয়ে উঠতে থাকে, সে প্রথমে চেষ্টা করে তার পরিপার্শ্বের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে এবং তার সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে থাকে। কয়েক সপ্তাহ পরে সে চিনতে পারে তার মার মুখ এবং আকার, পরিমাপ, রঙ, উজ্জ্বলতা ও অন্ধকার, কোমলতা ও কাঠিন্য—তার দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শানুভূতি দিয়ে নির্ণয় করতে পারে; স্নায়বিক বেগগুলি তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের সংবেদনতন্ত্রগুলি দিয়ে ব্যাখ্যাত হতে থাকে। শ্রবণতন্ত্রটিও

শিশুটির প্রত্যক্ষচেতনায় সহায়তা করে—তার প্রকোষ্ঠ স্বরূপ নালীগুলির মাধ্যমে এবং কানের মধ্যে তিনটি উপাদানের সাহায্যে, এই উপাদান তিনটি বিভিন্ন সমতলে স্থাপিত—একটি উলম্ব, একটি অনুভূমিক এবং আরও একটি অক্ষে। শ্রবণের যে অনুভূতি আমাদের সক্রিয় রাখে—নড়ায়-চড়ায়, দাঁড় করায়, হাঁটায়, লাফ দেওয়ায় ও নাচায়, ঢাকের, সঙ্গীতের, তালের যে অনুভব, আমাদের মধ্যে অংশগ্রহনের উপলব্ধি জাগায় এমনকি তখনও যখন আমরা সত্যি সত্যিই অংশগ্রহন করছি না, গতকাল সকালে নৃত্য-পরিবেশনটি দেখার সময় যেমন ঘটছিল। এইরকম উপলব্ধি হয় তখনই যখন অনেকগুলি অনুভূতি একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত হয় কর্ণপটাহের পেছনে, এবং আমরা এই স্নায়বিক বেগগুলির সাহায্যে ভাবতে পারি আর মস্তিষ্ককে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারি।

বিবর্তনের আরও আগের এক পর্যায়ে, যখন আমরা পেছনের দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতাম আর আমাদের সামনের দুটো পা যুক্ত থাকত ব্যবহার করার জন্য, তখন আমাদের দেখার ক্ষমতাটা এমন ছিল যে সামনের দিকে তাকিয়ে মেঘ, আকাশ, নক্ষত্র ও ঘনিয়ে আসা আঁধার দেখতে পেতাম। তারপর আমরা আবিষ্কার করলাম গুহা, পৃথিবীর-মাটিতে, গাছের ওপর যা হল প্রাইমেটদের- দ্বিতীয় আবাস। প্রকৃতিই গড়েছিল গুহাগুলিকে কিন্তু শীত, বৃষ্টি ও আদিম জন্তু-জানোয়ারদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার তাগিদ মেটাবার জন্য, সেগুলিকে আবিষ্কার ও পুনসম্প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষিত রাখারও এ ছিল একটা উপায়। দীপও ছিল সুরক্ষার আরও একটি উপায়, মানুষই তা সৃষ্টি করেছিল প্রকৃতিকে নিজের সুবিধানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসে। এই বাতিটির সাহায্যে আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমার চারপাশের গভীরতা, ছায়া ইত্যাদি কল্পনা করে নিতে পারছেন এবং আমি দাঁড়িয়ে আছি যে আয়তনের মধ্যে সেটিকে আর তার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারছেন। দূরত্ব, আসবাবপত্রের ছায়া এবং অন্য সব কিছুর একটা ধারণা আপনারা গড়ে নিতে পারছেন।

(বক্তা এবার ইলেকট্রিশিয়ানকে একটি ফ্লুরোসেন্ট টিউব জ্বালাতে বললেন)।

এবার আপনারা বদলটা দেখতে পাচ্ছেন। বোধহয় আপনারা আমাকে আরও ভালোভাবে এবং একটু অন্যভাবে দেখতে পাচ্ছেন। এখন সবকিছুই অন্যরকম দেখাচ্ছে। আমি আলোর রঙ ও চরিত্র—যে ছায়াহীন ও নির্দয় আলোর সঙ্গে আমরা এখন অভ্যস্ত—সে বিষয়ে কিছু বলছি না। এই আলো সবকিছুকে কীরকম ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি একটি আধুনিক ধরণের আলো, যে আলো আয়তন সম্পর্কে আমাদের বোধ এবং আয়তনে আমাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে। এ্যামিওবা তার নিজের মধ্যে অন্তর্বর্তী একটি আয়তন সৃষ্টি করেছিল, না ভেবেই, কারণ চিন্তা করার মত কোন মস্তিষ্ক তার ছিল না। কয়েকটি বিভিন্ন জৈবিক প্রযুক্তির মিশ্রণ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি, যেগুলি একটি সুপরিণত মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলি নিয়ে—নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনায় ও চেতনায়—আমার নিজের সম্বন্ধে আমার সচেতনতা একজন মানুষ হিসেবে—যে মানুষটি আমার বন্ধু তৃপ্তি মিত্রের মত অভিনয় করে না, কিম্বা নয় কোন স্থপতি, দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী। তবুও উইংসের পাশ থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির আশ্চর্য বিকাশ লক্ষ্য করেছি আমি লক্ষ্য করেছি আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে নানা উদঘাটন, শক্তির স্ফুরণবিষয়ক পদার্থ বিজ্ঞানের কথা, প্রোটনের

চারপাশে ইলেকট্রনের আবর্তন নিযুত-কোটি আলোকবর্ষ দূরে ঘটে-চলা বিরাট সমস্ত আনুবীক্ষনিক ও মহাবীক্ষনিক ঘটনাবলী। আজ আমরা বেতার তরঙ্গ-নির্ভর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে—ছায়াপথ সমূহ, তড়িত-চুম্বক শক্তির উৎস মহাজাগতিক বস্তুনিচয়, কম্পমান বেতার সঙ্কেত দ্বারা হদিশ-পাওয়া নক্ষত্র-গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, নিযুত-কোটি আলোকবর্ষ দূরে জ্যোতিবিদ্যায় নতুন নতুন সীমানায় পৌঁছতে পারছি। সময় মাপতে পারি—পারি গণনা করতে মাইক্রোসেকেন্ডে ($১০^{-৬}$, এক সেকেন্ডের নিযুত ভাগের এক ভাগ), ন্যানোসেকেন্ডে ($১০^{-৯}$,এক সেকেন্ডের কোটি ভাগের এক ভাগ) এবং এমনকি ফিরে যেতে পারি সময়ের আদিতে (বিগ্‌ব্যাঙ্)$১০^{-৪৩}$ একের পর তেতাল্লিশটি শূন্য দ্বারা বিভাজিত সেকেন্ডে। এই যখন আমি এই আয়তনের মধ্যে নিজের অবস্থানটি নিরূপিত করে নিচ্ছি ঠিক তখনই আমি যে আবার কীভাবে আলো এবং সময়ের জালে আর চারপাশের এই সমস্ত তার ও স্টপ-ওয়াচ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছি সেই সম্বন্ধেও সচেতন রয়েছি। সময় এবং আলো, এবং এদের সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা, আমাদের জড় পদার্থ বা অজৈব বস্তুতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আমরা নিজেদের প্রকৃতির সর্বোত্তম প্রকাশ বলে মনে করি এবং আমরা যে কোন বিষয় নিয়ে—নক্ষত্র, ছায়াপথ এবং জীবন ও অন্যান্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারি। মন এবং বস্তুর মধ্যে গূঢ় অর্থপূর্ণ সংযোগ সম্বন্ধে যে সব ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত আধুনিক অনুমান বা দূরকল্পনা করা হযেছে এবং যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সদাসর্বদাই চলেছে সে সম্বন্ধে আমি এখনও খুব বিহ্বল বোধ করি। সেই বিহ্বলতা নিয়ে আমি আমার আলোচনা planes ও surface-এ আবদ্ধ রাখছি।

(বক্তা একটি বিশেষ ধরণের লক্ষ্যনির্দেশক আলো জ্বালালেন যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য)।

আপনারা আমার মুখের অর্দ্ধেক দেখতে পাচ্ছেন—দেখতে পাচ্ছেন তার সমস্ত উঁচুনীচু ও গভীরতা, টিউবলাইটের আলোয় এ সমস্ত ধরা পড়েনি। আমি একটু ঘুরলেই ছায়া ফেলছি। ভারতে এবং অন্যত্র প্রাচীন স্থাপত্যে যে সব প্রাকৃতিক দিকনির্দেশক আলোর স্তম্ভ (লাইটহাউস) ব্যবহৃত হত—মন্দিরে, দুর্গে অথবা বাসগৃহে—এটি তারই একটি অনুকরণ। কোণারকে শেষ গর্ভগৃহটিতে পরপর সাজান জানালা বা আলো আসার রন্ধ্রের সারি দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলির বিন্যাসের সামান্য হেরফের অথবা স্থানচ্যুতিতে চুঁইয়ে-আসা, ছড়িয়ে পড়া আলো গর্ভগৃহে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ অন্ধকার সরিয়ে একটি রহস্যময় আধো অন্ধকার সৃষ্টি করে, যে আধো-আঁধার দেবদর্শনের সঠিক পরিবেশ। এলিফ্যান্ট গুহার শিব ত্রিমূর্তি খোলা সূর্যালোকে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হত। শ্রাবণবেলাগোলার বিশাল দণ্ডায়মান গোমতেশ্বর মূর্তিটিকে আলোকিত করার প্রস্তাব যখন দেয়া হয়েছিল আমাকে, আমি রাজী হইনি। বলেছিলাম; ওটিকে ছোঁবেন না। মানুষ সৃষ্টি করেছে বা করতে পারে এমন কোন আলো নেই যা এই একশিলা মূর্তিটির প্রতি সুবিচার করতে পারবে। এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। গুহার ভেতরে দেশলাই কাঠির কাঁপা কাঁপা আলোর যাদুই ওই আকৃতিগুলির প্রতি যথার্থ বিচার করে। একই ধরণের জাদু সৃষ্টি হয় কেরালা কথাকলির ঐতিহ্যপূর্ণ মশালের কম্পমান আলোয়, যা হ্যালোজেন আলো বা অন্য কোন রকম কৃত্রিম আলোকসম্পাতের নাগালের বাইরে।

দিক নির্দেশক আলোয় অথবা যে আলোয় গভীরতাটি পাওয়া যায় এবং ফোটনগুলি বা আলোকের কণাগুলিকে, ভাস্কর্যগুলিকে, স্তম্ভের মাথা ও কার্নিসের মধ্যবর্তী অংশগুলিকে, এবং অভিক্ষিপ্ত ভাস্কর্যকে যখন ছুঁয়ে যায়, তাতে আয়তনের এক ধরনের অনুভব অন্তর্লীন থাকে। আধুনিক এবং প্রাচীন স্থাপত্যে আমরা যে বৃত্ত, সমতল এবং গম্বুজগুলি দেখি তারা তাদের আয়তনিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য বাহ্যিক বা অন্তরীন আলোর — তা সে মানুষের নির্মিত বা প্রাকৃতিক যাই হোক না কেন—তার ওপর নির্ভরশীল। অস্তমিত বা উদীয়মান বা মধ্যদিনের সূর্যের আলোর যে রশ্মি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসে, গভীরতা, কারুকার্য এবং ছায়া সৃষ্টি করে, সেই আলোই মানুষকে আয়তনের কথা ভাবিয়েছিল। আকাশের অন্ধকার আর তারার নকশা ও তাদের আপেক্ষিক অবস্থানই আমাদের মূর্তি কল্পনা করতে এবং ঐ আকাশে দেবদেবী ও জন্তু-জানোয়ারের কল্পনা করতে শেখায়। এই ভাবেই বাহ্যিক আয়তন ধ্যান ও কল্পনার অন্তরীণ আয়তনকে সংজ্ঞায়িত করে। যে সব জীবতাত্ত্বিক, শারীরবৃত্তিক এবং স্নায়বিকতন্ত্র আমাদের অন্তবর্তী ও বাহ্যিক আয়তনের সঙ্গে যুক্ত করে, যা বহু নিযুত বর্ষ ধরে সমুদ্রের গভীর গর্ভের সেই এ্যামিওবার সময় থেকে লেন্স এবং চক্ষু অস্তিত্বমানে হওয়ার আগে থেকে আমাদের সঙ্গে আছে, তাদের আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আয়তন—Space, অভিক্ষেপন পর্দা—Projection screen, দ্বিনেত্র-নির্ভব দৃষ্টিশক্তি—binocular vision, আপেক্ষিকতাবাদ—Theory of relativity, মহাবীক্ষণিক—macroscopic, বেতারতরঙ্গ নির্ভর দূরবীক্ষণ—radio telescope, তাড়িত-চুম্বক শক্তিকউৎস মহা জাগতিক বস্তু নিচয়—quasars, কম্পমান বেতার সঙ্কেত দ্বারা হদিশ পাওয়া নক্ষত্র—pulsars, দিক নির্দেশক—directional.

[ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস আয়োজিত 'কনসেপ্টস অব স্পেস: এ্যানসিয়েন্ট এ্যাণ্ড মডার্ণ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত।]

অনুবাদ: অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো নিয়ে নতুন ভাবনা

পঞ্চাশ বছরের বেশী হয়ে গেল আলো নিয়ে কাজ করছি—নাটকে নৃত্যে শিল্পের নানা কর্মকান্ডে, কিন্তু এতদিন ধরে আলোর সঙ্গে ঘর করেও আজ দেখছি আলোর স্বরূপটা কতটুকুই বা জানলাম! যা দেখি আর দেখাই থিয়েটারে, ছবিতে, চলচ্চিত্রে তার থেকেও অনেক বেশি রহস্য রয়েছে আলোর মধ্যে—অন্ধকারের রহস্যেব থেকেও বিচিত্র ও জটিল।

এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনে সেদিন নানারকম পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি, হঠাৎই চোখে পড়ল একটি সিনেমা-পত্রিকা—যথারীতি তার মলাটে জ্বলজ্বল করছেন তিন চিত্র-নক্ষত্র—অমিতাভ বচ্চন, প্রাণ ও হেমা মালিনী। আমার থেকে এঁদের দূরত্ব অবশ্যই বহু যোজনের, তবে কর্মসূত্রে সম্প্রতি হেমামালিনী পরিচালিত কিছু নৃত্যনাট্যে আলো করতে হয়েছে, যেমন আগেও করেছি বৈজয়ন্তীমালার "চন্ডালিকা"য়। তাচ্ছিল্যভরে সরাতে গিয়ে চোখ পড়ল পত্রিকাটির শিরোনামে, অবাক কান্ড, এই পত্রিকাটি কোন সিনেমা ম্যাগাজিন নয় তো, এটা হল 'নিউ সাইন্টিস্ট' নামক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানের জার্নাল। উল্টে দেখি ওই পত্রিকার একটি বিশেষ প্রবন্ধ 'হোয়াট ইজ লাইট?' মানে আলো জিনিসটা কি? নিউ সাইন্টিস্ট-এর মলাটে বম্বের জনপ্রিয় তারকাদের ছবি দেবার কারণ পত্রিকাটির এবারের কভার স্টোরি হল "ইন্ডিয়া ওয়েকস আপ টু এড্স"। ভারতবর্ষে এড্স রোগের সূচনা বড় বড় শহরে এবং সেই সংক্রান্ত মূল রচনার জন্য প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ফটোগ্রাফার দিলীপ মেহ্তার তোলা বম্বের বস্তি অঞ্চলের একটি ছবি। যেখানে খোলার ঘরের চালের ওপর টাঙানো ছিল সিনেমার বিশাল হোর্ডিং—তাতেই ঐ তিন জনপ্রিয় তারকার মুখ আঁকা ছিল। এ সংখ্যার মলাটের আইডিয়াটা একটু অন্য ধরনের।

পঞ্চাশ বছরের আলোর কারবারী আমি, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম—অনেক অজানা তথ্য পেলাম, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু একেবারে শেষ কটি লাইন পড়ে থমকে গেলাম। আইনস্টাইন তাঁর মৃত্যুর ক'বছর আগে বলেছেন "আলোর কণিকাগুলি ঠিক কি? আমি গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভেবেচিন্তেও এর কূলকিনারা করতে পারলাম না। আর আজকাল টম, ডিক, হ্যারি ভাবে ওরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। কিন্তু এটা ওদের ভুল।" আলোর রহস্যময়তার সপক্ষে এরকম অতুলনীয় উক্তি বুঝি আর হয় না।

আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতায় আলোর তরঙ্গের কম্পনভেদে নানা রঙ তার রঙিন চেহারায় পত্রে পুষ্পে মেঘে আকাশে পাহাড়ে নদীতে সাগরের ঢেউ-এ মন মাতায়। সেই রঙিন আলোর কারসাজি আমরা জীবনে রোজই দেখতে পাই সকাল সন্ধ্যে রাতে ঘরে বাইরে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। আর এই দেখার সঞ্চয় থেকে শিল্পী ছবি আঁকেন। মঞ্চে অভিনয়, দৃশ্যপট সব কিছুর শিল্পসম্মত ভাবনায় আলোকবিন্যাস করাও সম্ভব হয়েছে

আধুনিক স্পটলাইট, ডিমার ও রঙিন ফিল্টার-এর পরিকল্পিত প্রয়োগে।

আজ থেকে তিনশো বছর আগে নিউটন সূর্যের আলোর থেকে সাতটি রঙ দেখিয়ে আলোর বিষয়ে নানা তত্ত্বের সঙ্গে আর একটি ধারণাও পাকা করে দিয়েছিলেন। সূর্যের থেকে সোজা পথে যে কিরণ আসছে সেটা উনি প্রিজমের কাঁচের মধ্যে দিয়ে পার করে আলাদা আলাদা সাতটি রঙে ভেঙে দেখালেন, আর এও বললেন যে ঐ সোজা পথে সূর্যের থেকে আসা আলোক রশ্মি হল করপাসল্স অর্থাৎ আলোককণা। সেদিনের শিক্ষিত সমাজ নতুন করে আলোকপ্রাপ্ত হল, আলোকসম্পাতকারী আর কেউ নন স্বয়ং স্যার আইজাক নিউটন।

তারপর দীর্ঘকাল নিউটনের আলোর কণিকা রূপটাই বিদ্বজ্জন সমাজে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তবু একটা কথা থেকেই যায়। নিউটনের নানা তত্ত্বের মধ্যে 'নিউটন্স্ রিং' ব্যাপারটা বেশ খানিকটা নিউটনের কণিকা তত্ত্বের বিরোধী বলেই মনে হয়।

'নিউটনস রিং' জিনিসটা কি?

নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী রবার্ট হুক একটি কাঁচের ওপর একটি উজ্জ্বল লেন্স রেখে দেখতে পেলেন ওই কাঁচ ও লেন্সের পরস্পর ছুঁয়ে থাকা যে সূক্ষ্ম বিন্দুর অবস্থান, সেই কেন্দ্রের থেকে চক্রাকারে কতকগুলো আলো-ছায়ার প্যাটার্ন এবং সেটাকে উনি আলোর তরঙ্গরূপের একটি প্রমাণ হিসাবে বলেছিলেন। কিন্তু হুকের মৃত্যুর এক বছর পরে নিউটন ওই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করে বলেন আলোর কণার ঠিকরে আসার থেকেই ওই রকম চক্র বা রিং দেখা যায় এবং দুর্ভাগ্যবশত ওই রিং-এর নামকরণও একরকম অন্যায়ভাবে 'নিউটন'স রিং বলে আখ্যাত হয়ে আসছে। কিন্তু রিংটি প্রথম লক্ষ্য করেন স্বয়ং রর্বাট হুক এবং আলোকে তরঙ্গ বলে গণ্য করলে তবেই ওই প্যাটার্ন সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও নিউটন সাহেব নিজে দৃঢ়ভাবে ওঁর Corpuscular মতেই অটল রয়ে গেলেন, কিন্তু তখন থেকেই আলোর ঢেউ-এর সপক্ষে মতিগতি নানাভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতো, আলোর স্বরূপ নিয়ে অনেক কাল ধরে নিউটনের কণিকা তত্ত্বটা মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে টমাস ইয়ং তাঁর বিখ্যাত 'ডাবল স্লিট' এক্সপেরিমেন্ট করে প্রমাণ করলেন আলোর তরঙ্গ রূপ। আর এ শতাব্দীর তিরিশের দশকে কোপেনহেগেনের কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা আনলেন আর এক ভাবনা যে আলো তরঙ্গও বটে আবার কণিকাও বটে। এবং হেঁয়ালিটা বিচিত্র এই কারণে যে পরীক্ষার সময় একসঙ্গে দুটো ব্যাপার দেখা যাবে না, প্রমাণ করা যাবে না। তরঙ্গের জন্য পরীক্ষা করলে তরঙ্গ রূপটাই ধরা পড়বে আর কণিকার জন্য পরীক্ষাতে শুধু কণিকা চরিত্র ধরা পড়বে।

আলোর ঢেউয়ের নাচন যে মানুষটি দেখালেন তাঁর সম্পর্কে দু'একটি কথা এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ডাক্তার টমাস ইয়ং, এম.ডি., পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন, তাছাড়া উনি বিলেতের রয়াল সোসাইটির ফেলো ও ফরেন সেক্রেটারী এবং ফ্রান্সের ন্যাশানাল ইনস্টিটিউটের সদস্য ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই ওঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। মাত্র দুবছর বয়সে উনি অনায়াসে পড়তে শিখে নিয়েছিলেন। চার বছর বয়সের মধ্যে পুরো বাইবেল-দুবার পড়ে ফেলেন। পরের বছর ল্যাটিন পড়তে

ও লিখতে শেখেন আর চোদ্দতে ইয়ং ল্যাটিন ছাড়াও গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, হিব্রু, আরবী ও ফার্সী ভাষা রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

সাহিত্য, অঙ্ক, পদার্থ ও জীববিজ্ঞানে দক্ষতা লাভ করে নানা কলকব্জা, লেদ মেশিন চালানো আয়ত্ত তো করেছেনই তার সঙ্গে আবার বই বাঁধাই এবং নানা রঙ মিশ্রণের কাজে মগ্ন থাকতেন। মানুষের চোখ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করে দৃষ্টি ও চোখের রঙ দেখার অনুভূতির বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ সবের জন্য মাত্র একুশ বছর বয়সে ইয়ং রয়াল সোসাইটির ফেলোর সম্মানে ভূষিত হন।

ডাক্তারী পড়ার শেষ বৎসরে ইয়ং শব্দতরঙ্গ নিয়ে গাণিতিক ব্যাখ্যা করে মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শব্দ তরঙ্গ সম্পর্কে আগ্রহী তো ছিলেনই আর ১৭৯৯ সালে রয়াল সোসাইটিতে আলোর তরঙ্গ রূপের নতুন ভাবনা নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেদিন এই তত্ত্ব প্রকাশ্যে ঘোষণা করাটা বেশ সাহসের কথা, কাবণ তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে স্যার আইজাক নিউটনের আলোব কণিকারূপ (Corpuscle) মেনে নেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বলে।

ইয়ং-এর আলোর তরঙ্গ ব্যাখ্যা সেদিন বিদগ্ধ মহলে আলোড়ন তুলেছে এবং এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশে ডাঃ ইয়ং তাঁর ডাক্তারী প্রাকটিসে ফিরে যান। ডাঃ ইয়ং প্রবল বিরোধিতার মধ্যে জানিয়ে দেন যে একদিন না একদিন উনি ওঁর তরঙ্গবাদের পক্ষে আরো বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ হাজির করবেন, আর উনি ব্যক্তিগতভাবে নিউটনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শুধু অন্ধভাবে যাঁরা নিউটনের মতবাদের সমর্থন করেছিলেন তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেন। পূর্বসূরী রবার্ট হুকের কাজেব উল্লেখ ও সমর্থন করতেন তিনি। ইয়ং-এর প্রায় দুশো বছর আগের বিজ্ঞানী যিনি আলোব ঢেউ-চরিত্রের পক্ষে কণিকা মতবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উক্তি করেন, তিনি রবার্ট হুক। রবার্ট হুকের অন্য পরিচয় হল ইনি মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের একজন আবিষ্কর্তা।

ডাক্তারি পেশায় ফিবে গিয়ে ইয়ং ওর মধ্যেই ব্যস্ত থাকতেন, যদি না কাউন্ট রামফোর্ড ওঁকে ঠিক ঐ সময় রয়াল ইনস্টিটিউশনে দুবছরের জন্য একটি বিশেষ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতেন।

তখন থেকে ইয়ং লেগে গেলেন আদাজল খেয়ে আলোর তরঙ্গ চরিত্র প্রমাণিত করার সাধনায়। রয়াল ইনস্টিটিউশনে যোগ দেবার ক'মাসের মধ্যে ওঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আলো ও রঙ' (অন দা থিওরি অফ লাইট অ্যান্ড কালারস) নিয়ে তিনি প্রামান্য রচনা উপস্থাপন করেন নিউটনের কণিকাবাদকে একরকম চ্যালেঞ্জ করে।

আলোক তরঙ্গের মৌলিক অনুসন্ধান ছাড়াও ইয়ং রয়াল ইনস্টিটিউট-এ আরো রকমারি বিষয়ে কাজ করেন: যন্ত্রপাতি, মেকানিক্স এবং ডায়নামিক্স, স্থাপত্যবিদ্যা, চাকা ও দড়িদড়ার প্রয়োগ, পাম্প ও ফোয়ারা, ড্রিলিং—এসব তো ছিলই আর ওঁর পুরানো ও প্রিয় বিষয় শব্দ তরঙ্গ নিয়ে অনেক ছবি নক্সা দিয়ে দুখন্ডে হাজার পৃষ্ঠার বিরাট বই লেখেন। এতে আরো ছিল গণিতের প্রায় পাঁচশো প্রবন্ধ। কিন্তু এই বই—ডঃ ইয়ং'স লেকচার্স ইন ন্যাচারাল ফিলোসফি এন্ড মেকানিক্যাল আর্টস, প্রকাশিত হল ১৮০৭ সালে। আর ডঃ ইয়ং এই বইএর জন্য প্রাপ্য এক হাজার পাউন্ড আর হাতে পেলেন ন' কারণ ইতিমধ্যে

ঐ প্রকাশক কোম্পানি ফেল মেরেছে।

ডঃ ইয়ং বিদ্বজ্জন সমক্ষে রয়াল সোসাইটিতে ওঁর ডাবল স্লিট পরীক্ষার কথা ঘোষণা করেছিলেন একজন অ্যামেচার হিসেবে। তারপর হয়তো নানা কারণে একটু হতাশও হয়ে পড়লেন। কিন্তু ওঁর আলোর ব্যাপারে বক্তব্যটা কি তাহলে মাঝপথে মারা গেল, হারিয়ে গেল?

রয়াল ইনস্টিটিউটে ইয়ং-এর দিন কেটেছে নানা অশান্তিতে, অস্বস্তিতে। ওখানকার কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা ওঁকে কষ্ট দিত। এবং উনি নিজে সুবক্তা ছিলেন না সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। উনি নিজেই বলেছেন, "আমি প্রচন্ড চেষ্টা করি ভাল করে গুছিয়ে বলতে তবু এটাও তো বুঝতে হবে, পঞ্চাশটি লেকচার, তাও আবার এত ভিন্ন ভিন্ন ছড়ানো বিষয়বস্তুর ওপর তৈরি করা বড় সহজ কাজ নয়। এত জটিল সব বিষয়, যে আমি কিছুতেই একটা বক্তৃতা আমার মনোমত দিতে পারলাম না।" ইয়ং এ-সমস্ত নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ইনস্টিটিউট ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। টমাস ইয়ং-এর চরিত্রের বর্ণবহুল জীবনের আর এক দিক হল ইনি রয়াল ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে যান কারণ উনি কাজকর্মে লেখাপড়ায় সব সময়ে সাধারণ দরিদ্র নীচের তলার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আর গরীব মানুষের লড়াই-এ তাদের সমর্থন করে এসেছেন বলিষ্ঠভাবে; রয়াল ইনস্টিটিউটে মহিলাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে স্ত্রীজাতির শিক্ষার স্বপক্ষে নির্দিষ্ট প্রস্তাবও রেখেছিলেন। এই সব ঘটনায় ওখানকার ওপরওয়ালারা ক্রমে ওঁর ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন, যার জন্য ওঁকে এই সংস্থা ছাড়তে হয়।

ইয়ং-এর সেই বিখ্যাত পরীক্ষাটি কি ছিল? খুব সহজ এর আয়োজন—ইয়ং একটা বোর্ডের দুটি সরু ছিদ্র দিয়ে একটা আলো ফেলে দেখান ঐ আলোটি আরেকটি একটু দূরে রাখা এক স্ক্রীন-এ পড়েছিল আর সেখানে আলোর প্যাটার্নের একটা বিশেষ চেহারায় ধরা পড়েছিল আলোক তরঙ্গের 'বিঘাত বিন্যাস' (Interference pattern of Light Waves)। এই দ্বিতীয় পর্দায় পড়া আলো-ছায়ার নক্সাটি হল আলোর তরঙ্গ রূপের বড়ো সাক্ষী।

টমাস ইয়ং-এর শিশুকাল থেকে ওঁর নানাভাষায় পারদর্শিতার কথা বলেছি। কিন্তু ওঁর আরও একটা বিরাট অবদান আছে ভাষার ব্যাপারে। নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনী নীলনদের উপত্যকায় অভিযানের সময় রশিদ বা (রসেটা) নগরের কাছে একটি কালো পাথরের চাঙড় আবিষ্কার করে। সেই 'রসেটা' পাথরের গায়ে খোদাই করা ছিল গ্রীক ভাষার লিপি, আরো ছিল এক অজানা রহস্যময় লিপিমালা ঐ পাথরের বুকে। সেগুলো হল সেদিনের অজানা মিশরীয় বর্ণমালা। যাকে আজ বলা হয় হাইরোগ্লাইফিক্স (Hieroglyphics)। ইয়ং লেগে গেলেন ঐ সংকেতময় বর্ণমালার পাঠোদ্ধারের গবেষণায়—শেষ পর্যন্ত উনি সফল হলেন অজানা ভাষার অর্থ বের করতে। তার থেকে মানুষ জানতে পারল পাঁচ হাজার বছর আগের মিশরীয় সভ্যতার কাহিনী। যার মধ্যে একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল, আলোর দেবতা 'আতনের' (সূর্য) উপাসনারত রাজা ফ্যারাওর ছবি, যে 'আতনের' আলো আসছে সাড়ে আট মিনিটের পথ বেয়ে, পৃথিবীর

বুকে প্রাণের স্পন্দন তুলছে। আর সে আলোক রশ্মির তরঙ্গ ও কণিকারূপের বিতর্কে মত্ত আছি আমরা। আর টমাস ইয়ংই ১৮০৩ সালে দেখিয়েছিলেন ঢেউ-এ ঢেউ-এ আলোর নাচন।

ইয়ং-এর জীবন প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প শোনা যায়: এক দক্ষ সার্কাস খেলোয়াড় ক্ষিপ্রগতিতে ছুটন্ত ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে বসে নানা কসরৎ দেখান। অনেক উঁচুতে শূন্যে তারের ওপর ব্যালান্সের খেলা দেখিয়েও দর্শকের হাততালি কুড়োন আর দিনশেষে বাড়িতে এসে নিজের বইপত্র খাতায় ডুবে যান। সার্কাস কোম্পানীর নাম ফ্রাকনি সার্কাস আর ঐ খেলোয়াড়টিই হলেন আমাদের টমাস ইয়ং, উনি যে সমস্ত দড়ি দড়ার খেলা দেখাতেন তার থেকেই নাকি দড়ির কম্পন ও সঞ্চালন বৈশিষ্ট্যের আইডিয়া আসতো আর সেগুলো উনি কাগজে কলমে নক্সায় যাচাই করতেন। আগেই ইয়ং-এর শব্দ তরঙ্গের ওপর আগ্রহ ছিল—তাই নিয়ে উনি নানা তারের বাদ্যযন্ত্র, বেহালা, গিটার ও পিয়ানোর ধাতব তারের দৈর্ঘ্য ও শব্দ তরঙ্গের গাণিতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভেবেছেন ও লিখেও গেছেন। কিন্তু এই সার্কাস শিল্পীর ভূমিকার কথাটা কতটা সত্যি, কতটা কল্পনা কে জানে!

আলোর তরঙ্গ রূপ ছাড়াও ইয়ং মানুষের দৃষ্টি বিজ্ঞান ও রঙের অনুভূতি নিয়ে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। ইয়ং-এর রঙ দেখবার জন্য যে থিয়োরি—চোখের মধ্যে তিন রঙের রিসেপ্টর বা ট্রাইকোমেট্রি, এই সম্পর্কে পরে আরও এক বিরাট বিজ্ঞানী এইচ. ভন. হেল্‌মহোল্টজ ১৯২৪ সালে ইয়ং-এর মূল ভাবনার অনুসরণ করে এক নতুন অনুভূতির থিয়োরি প্রবর্তন করেন আজকে যেটা ইয়ং-হেল্‌মহোল্টজ থিয়োরি (ইয়ং হেল্‌মহোল্টজ থিয়োরি অফ কালার ভিশন) নামে বিখ্যাত। এই হেল্‌মহোল্টজ সত্যি এক বড় মানের গবেষক। এঁর শব্দ আলো ও অনুভূতির স্নায়বিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ওপর বহু প্রামান্য ও মূল্যবান কাজ আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। সার্কাসে দড়ির খেলার খবর কতটা ঠিক জানি না কিন্তু এটা ঠিক প্রায় পনের বছর পর ইয়ং ওঁর ফরাসী বিজ্ঞানী বন্ধুকে চিঠি লেখেন আলোর তরঙ্গ রূপের সঙ্গে একটা টানটান করে বাঁধা দড়িতে ঝাঁকুনির থেকে উদ্ভূত ঢেউয়ের মত সঞ্চালনভঙ্গির তুলনা করে। ওই বন্ধুর নাম ডোমিনিক আরাগো। আরাগো ওঁর আর এক নবীন বিজ্ঞান-কর্মী আগাস্টিন ফ্রেনেলকে ডাকলেন (Fresnel-এর 'এস' উচ্চারণ হয় না)। ফ্রেনেলই শেষ পর্যন্ত আলোর তরঙ্গরূপ চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করলেন বেশ ক'বছর পর। রয়াল সোসাইটি এই আবিষ্কারের জন্য ফ্রেনেলকে একটি বিশেষ সম্মানসূচক মেডেল দেন। ইয়ং-এর অনুরোধে মেডেলটি আরাগো অসুস্থ ফ্রেনেলের হাতে তুলে দিলেন আর তার আটদিন পর ফ্রেনেলের মৃত্যু হল।

ফ্রেনেলের কথায় মনে পড়ে, আমরা যারা থিয়েটারে সিনেমায় কাজ করছি, দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত ছিলাম ফ্রেনেল লেন্সের সঙ্গে। আমাদের মঞ্চের ও স্টুডিওর কাজে আমরা ফ্রেনেল স্পট ব্যবহার করি উঠতে বসতে, কিন্তু আমরাই কি জানি ফ্রেনেল নামে এক বিজ্ঞান-গবেষক ছিলেন? তিনি ওই ফ্রেনেল লেন্স বলে কথিত ঠিক যে-জিনিসটা প্রবর্তন করেছিলেন তাকে 'ফ্রেনেল জোন প্লেট' বলেই অভিহিত করেন। আলোকতরঙ্গের নানা সূক্ষ্ম গানিতিক হিসেবনিকেশ করে এই বিশেষ 'জোন প্লেট' (Zone plate) -এর উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি।

ফ্রেনেলের আলোকতরঙ্গ প্রমাণেরও একটু ছোট পটভূমিকা আছে। উনি যখন প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে আলোর তরঙ্গরূপ চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন একটা খবর এল। ফরাসী বীর নেপোলিয়নের এক ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল মালু একদিন সন্ধ্যেবেলা ওঁর ঘর থেকে প্যারিসের অস্তগামী সূর্য দেখছিলেন অদূরবর্তী লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের জানালার কাঁচের থেকে ঠিকরে আসা আলোক রশ্মি থেকে। উনি অন্যমনে দেখছিলেন একটি বিশেষ ধরনের কৃস্টাল— যার নাম ক্যালসাইট বা চলতি ভাষায় বলা হয় আইসল্যান্ড স্পার (Iceland Spar)। 'আইসল্যান্ড স্পার' বা ক্যালসাইট হল এক ধরনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট। দুই শতাব্দী আগে ফরাসী নাবিকেরা এই বিশেষ.কৃস্টালটির সন্ধান পায় আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর দিকে উত্তর মেরুর কাছে আইসল্যান্ড অঞ্চলে। তার ভেতর দিয়ে, কর্ণেল মালু হঠাৎ খেয়াল করে দেখেন যে ঐ ক্যালসাইটের মধ্যে দিয়ে একটার বদলে দুটি রাঙা সূর্য দেখা দিল আবার.ক্যালসাইটটি সামান্য নাড়াচাড়া করতেই একটি সূর্য বেশী উজ্জ্বল লাগছে অন্যটি কেমন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল সাহেব একটু কৌতূহলী হয়ে গেলেন। এই ইঞ্জিনিয়ারের নাম কর্ণেল এটিন্ লুই মালু (Eiteen Louis Malus)। ফরাসী অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স ১৮০৮ সালে আলোর ডাবল্ রিফ্রাকশনের ওপর শ্রেষ্ঠ গাণিতিক তত্ত্বের একটি বিশেষ প্রতিযোগিতায় মালুকে তাঁর মৌলিক গবেষণা 'দা থিওরি অফ লাইট ইন ক্রিস্টালাইন সাবস্টেন্সেস'-এর জন্য পুরস্কার দেন। এর সূত্র ধরে ফ্রেনেল সাহেব আলোক তরঙ্গের আড়াআড়ি (Transverse) চলার কথা ও আলোর কথা অনেক গাণিতিক বিশ্লেষণ সহকারে প্রমাণ করলেন।

নিউটনের সময়ে আলোর কণা রূপের বিপক্ষে আরও কিছু নামকরা বিজ্ঞানী যেমন ক্রিশ্চিয়ান হুগেন্স (Christian Huygens) যিনি রোমার-এর বৃহস্পতির উপগ্রহের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোর গতি নিরূপণ করতে অনেকখানিই সক্ষম হন। আর একজন রবার্ট হুক। এঁরা অনেক যুক্তিতথ্য সহ আলোর তরঙ্গ চরিত্র বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট ছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত কণিকা মতটাই টিকে থেকেছিল ফ্রেনেল আর ইয়ংদের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের দরবারে।

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আইনস্টাইন আলোর কণিকারূপের প্রবক্তা ছিলেন, ওঁর রিলেটিভিটির তত্ত্বের ব্যাপার তো আজ সবারই জানা। আইনস্টাইন ওঁর 'ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট'-এর জন্য ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। আর কোপেনহেগেন-এ ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবতারণা হলেও এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক নীলস বোর ১৯২২ সনে নোবেল পুরস্কার পান। সেই নোবেল বক্তৃতায় নীলস বোর তাঁর আলোক তরঙ্গবাদের সপক্ষে বলেন, আর পরে পরিহাসচ্ছলে বলেন, বার্তা পাঠাতে হলে আইনস্টাইন মশায়কে যে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে সেটাও তো তরঙ্গের সাহায্যেই (Electro magnetic waves)।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তারা আলোর কণিকা ও তরঙ্গ দুটি স্বভাবের কথা মেনে নিয়ে ঘোষণা করলেন আলোর দ্বৈত ভূমিকার কথা (ডুয়েল ক্যারেক্টার অফ লাইট) আর এও বললেন যে আলোর কণারূপ ও তরঙ্গরূপ একসময়ে ধরা মাপা দেখা সম্ভব নয়। কোনও দিন পরীক্ষা করে এই দুটো রূপ একসঙ্গে দেখা যাবে না, একটা পরীক্ষায় শুধু কণিকারূপই ধরা যাবে, আবার তরঙ্গের জন্য পরীক্ষার আয়োজন করলে কণিকাবৈশিষ্ট্য

পরীক্ষককে ফাঁকি দিয়ে পালাবে।

সদ্য প্রকাশিত নিউ সাইন্টিস্ট পত্রিকায় আলোর ওপর লেখাতে জানতে পারি প্যারিসে অ্যালেন অ্যাসপেক্ট ও ফিলিপ গ্র্যাঞ্জিয়ার (Alain Aspect and Phillip Grangier) সম্প্রতি এক যুগান্তকারী পরীক্ষায় বলেছেন যে আলোর ফোটন রূপের যাচাই করবার জন্য সাধারণ আলোর উৎস ব্যবহার করে একক ফোটন পাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য এই সব আলোর কোনও কোয়ান্টাম চরিত্রও পাওয়া যাবে না। নানা পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ক্যালসিয়াম পরমাণুর থেকে একক ফোটন আলো বের করে অ্যাসপেক্ট ও গ্র্যাঞ্জিয়ার আইনস্টাইনের আলোর কণিকারূপ দেখতে পেয়েছেন।

অ্যালান অ্যাসপেক্ট ইতিমধ্যে বিজ্ঞান জগতে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ইনি জন স্টুয়ার্ট বেলের "নন লোকালিটি ও অ্যাকশন অ্যাট এ ডিসটান্স"-এর মতো আধুনিকতম কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের জটিল ও তাজ্জব কাণ্ডকারখানার ওপর নতুন আলোকসম্পাত করেন ১৯৮২তেই।

গত নভেম্বরের নিউ সাইন্টিস্টে অ্যাসপেক্ট ও গ্র্যাঞ্জিয়ারের এই নতুন পরীক্ষায় আলোর কণা ফোটনকে একটা একটা করে আলাদাভাবে বাগে আনার খবরে আরো বেশী মনে পড়ে গেল, আমাদের দেশের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে আলোর মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে একটি বিশদ পরীক্ষা করেছিলেন। পরে আজ নিউ সাইন্টিস্ট পত্রিকার 'What is light' প্রবন্ধের দুজন লেখক—একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞান-লেখক জন গ্রিবিন আরেক জন হলেন এই কলকাতার নবীন বিজ্ঞানী ডঃ দীপঙ্কর হোম।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের আঙিনায় যুগে যুগে কতবার কতই না চূড়ান্ত ও আপাত অভ্রান্ত ধ্যান ধারণা ও থিওরি এসেছে। সেই নিউটনের সময় থেকে কতবারই তো মনে হল এইবার চরম জানা হল নির্ভুল থিওরি—কিন্তু আজ এটা স্পষ্ট যে বিজ্ঞানে জীবনে সমাজে এবং রাজনীতিতে ফাইনাল বলে কিছু থাকে না। চিরকালই আমরা শিখব, ভাবনা চিন্তার নিত্যনতুন বদল ও বিকাশ ঘটবে। দুশো বছর আগে ইয়ং-এর বিখ্যাত ডাব্‌ল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের আরো একশো বছর আগে নিউটনের সূর্যের সাতরঙের এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে আর তার আগে মানবসমাজকে আলো দিয়েই নতুন নতুন চেতনা দিয়েছেন কোপার্নিকাস কেপলার আর গ্যালিলিওর মত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

এই শতাব্দীর আগের শতাব্দীতেও আলো সম্পর্কিত অনেক বড়ো পরীক্ষা হয়ে গেছে। অ্যালবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মর্লি গত শতাব্দীর শেষভাগে ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন—শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওই পরীক্ষায় দেখা গেল ইথার বস্তুটি কল্পনামাত্র, বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নেই। আর ওই শতাব্দীর শেষ দশকে—১৮৯৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর মাইক্রোতরঙ্গের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য জোড়া প্রিজম ব্যবহার করে একটি পরীক্ষা করেছিলেন। সেই পরীক্ষার বর্ণনা আছে যে বইটিতে তার নাম কালেক্টেড ফিজিক্যাল পেপার্স অফ জে সি বোস। আর ঐ বইটির ভূমিকা লেখক ছিলেন জে জে টমসন,—তিনি ওই বছরেই আবিষ্কার করেছিলেন পরমাণুর অন্যতম উপাদান ইলেকট্রনকে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষায় আলোক রশ্মির টানেল এফেক্ট প্রত্যক্ষ করবার জন্য দুটো প্রিজম মুখোমুখি বসিয়ে দুটোর মাঝখানে একটু সামান্য ফাঁক—তাঁর প্রস্তাবিত

আলোক রশ্মির দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম ফাঁক—অর্থাৎ ১ সেন্টিমিটারের চেয়ে কম রেখে উনি সেদিন ওঁর সেই অদেখা আলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। এই প্রিজম দুটোর জোড়া অবস্থানে এটা একরকম হিসেবে ব্যবহার হল।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার সঙ্গে অ্যাসপেক্ট-গ্র্যাঞ্জিয়ারের একটা একটা আলাদা ফোটন ধরার কায়দা (তাও গতানুগতিক আলোর উৎস বাল্ব বা Laser নয়) থেকে এক নতুন আইডিয়া এলো; অনুপ্রাণিত হলেন এ-দেশেরই তিনজন বিজ্ঞানগবেষক। ওই পরীক্ষার সূত্রে আরও সূক্ষ্মভাবে ওই ধরনের একটা সেট আপ করে আলোর দ্বৈত চরিত্র (Duality) অর্থাৎ তরঙ্গ ও কণিকা রূপের প্রমাণের সম্ভাবনার ভাবনা ওঁদের মগ্ন করল। অ্যাসপেক্ট-গ্র্যাঞ্জিয়ারের পরীক্ষায় একটা একটা করে আলোর কণা ছেঁকে ধরবার পদ্ধতি অনুসরণে, এক নতুন পরীক্ষার পরিকল্পনা করলেন কলকাতার দুই বিজ্ঞানী ডঃ পার্থ ঘোষ ও ডঃ দীপঙ্কর হোম আর হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিরিশ আগরওয়াল। এঁদের উদ্দেশ্য একই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আলোর কণিকা ও তরঙ্গরূপকে যুগপৎ প্রমাণ করা।

এক কথায় ভারতের তিন গবেষকের মূল ভাবনাটা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক হলেও মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট বা কম পরিসরের ফাঁক দরকার প্রিজম জোড়ার মাঝখানে। আলোর তরঙ্গের মাপ এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে মাত্র $১০^{-৫}$ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ·০০০০১ সেন্টিমিটার-এর মত ফাঁক থাকবে দুটি প্রিজমের মাঝখানে, বাস্তব বুদ্ধিতে মনে হয় প্রায় একটার সঙ্গে অন্য প্রিজমটা একেবারে ঠেকেই থাকার কথা। আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতে এই রকম হিসেবের মাপের কথা ভাবতেই পারা যায় না।

তবু আধুনিক প্রযুক্তি ও টেকনলজিতে উন্নত দেশ জাপানে, দুই বিজ্ঞানী ওয়াই মিযোবুচী এবং ওটাকে (Y. Mizobuchi and Otake) ওই দেশের হামামাৎসু ফটোনিক্স-এর সেন্ট্রাল ল্যাবোরেটরিতে GHA (Ghose Home Agarwal)-এর পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে এক সূক্ষ্ম ও জটিল পরীক্ষায় মগ্ন রয়েছেন প্রায় এক বছর যাবৎ। ইতিমধ্যে অনেকটা আশাব্যঞ্জক খবরও ওঁদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ বসুর পরীক্ষিত পথ ধরে এবং অ্যাসপেক্ট ও গ্র্যাঞ্জিয়ারের একক ফোটন ধরার কৌশল থেকে আলোর তরঙ্গ ও কণিকা রূপ একই সঙ্গে পরখ করার ঘটনা এ শতাব্দীর শেষে নতুন ভাবনার সূচনা করতে পারে। আলোর কণিকা ও তরঙ্গরূপের নীলস্ বোর বর্ণিত পরিপূরক নীতির কমপ্লিমেন্টারিটি সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করতে পারে এই পরীক্ষা। আর এই রহস্যময় তরঙ্গকণিকা ডুয়ালিটিকেই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের একমাত্র রহস্য বলে অভিহিত করেছিলেন বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যান—কোয়াণ্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স ও ফেইনম্যান-ডায়াগ্রামের জনক।

আলো দিয়ে আলোর রঙ নিয়ে এত রকম কাজ করতে করতে প্রত্যক্ষভাবে যা জেনেছি তার সঙ্গে আলোক তরঙ্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কেমন যেন আজ গরমিল দেখা যাচ্ছে। যেমন আমাদের থিয়েটারে নাটকে কোনও ভয়ানক উত্তেজক দৃশ্য, চূড়ান্ত যুদ্ধ ইত্যাদির সঙ্গে লাল রঙের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ও সার্বজনীন। জীবনে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতায় আমরা যা দেখি বা জানি তাতে কোনও কিছু গরম হলে লাল হয়। আগুনের রঙ লাল বা লালচে। তেমনি রক্তের রঙও লাল। শ্রমিক আন্দোলনে রাজনীতিতে লাল পতাকা শ্রমিক শ্রেণী ও সর্বহারার সংগ্রামবিপ্লবের প্রতীক। মানুষের স্বাভাবিক লাল রঙের রক্তের তুলনায় অভিজাত সম্প্রদায়কে বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলা হয় নীল রক্তের মানুষ। কিন্তু আমাদের যে চোখে দেখা আলো (Visible spectrum) তার মধ্যে লাল রঙের তরঙ্গের মাপ সবচেয়ে বেশী তার মানে কম্পন মাত্রা সবচেয়ে কম। কম্পনমাত্রা বেশি হতে গেলে তরঙ্গ মাপ ছোট হওয়া দরকার। ওই হিসেবে চোখে দেখা আলোর মধ্যে বেগুনি ও নীল রঙের তরঙ্গ মাপ সবচেয়ে কম তাই অন্তর্নিহিত শক্তিতে লাল রঙের তুলনায় বেগুনি ও নীল রঙ অনেক বেশী তেজী।

এইসব আলোর ও রঙের খবর যখন থেকে জানতে শুরু করেছি তখন থেকেই একটু একটু করে কেমন খটকা লাগতে শুরু করলো। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার এই রকম গরমিল দেখে মাথা চুলকাতে আরম্ভ করলাম। আমাদের আগে কত বড়ো মাপের মানুষ ভেবেছেন, বলেছেন, "আলো জিনিসটা কী—জানতেই হবে!"

দীর্ঘদিন আলোছায়ার জগতে মানুষের হাসি কান্নার পালায় নাট্য জগতে কাজ করলাম নানা ধরনের সন-এ-লুমিয়ের (ধ্বনি ও আলোর সজ্জা) সারা দেশে—প্যারিসের ইফেল টাওয়ার থেকে মস্কোর ক্রেমলিন সর্বত্র আলোক বিশেষজ্ঞ ও ডিজাইনার হয়ে কাজ করে এসেও দেখছি আলোকে জানাই হল না।

সাহিত্যে তো বটেই নাটকেও বিজ্ঞানী মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও আলোর দ্বৈত চরিত্র অনেকবারই এসেছে। ডুরেনম্যাটের 'দি ফিজিসিস্ট' মনে পড়ে। হালে বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার টম স্টপার্ড এক বিচিত্র নাটক লিখেছেন পরমাণু জগতের এই পরিপূরক হেঁয়ালী অবলম্বন করে 'Hap good'—সেই জটিল নাট্য প্রক্রিয়ার মধ্যে সি. আই. এ. ও কে. জি. বি.-র একটা মুখ্য ভূমিকা ছিল—আজ কে. জি. বি. একটা অতীত হয়ে গেল, সি. আই. এ. ও কি থাকবে? তবু—

সবশেষে মনে পড়ে সমাজ সচেতন নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখটের 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকের কথা। এই কলকাতায় ওই নাটকের সপ্তম দৃশ্যে গ্যালিলিও চরিত্রে শম্ভু মিত্র বলতেন "মাঝে মাঝে মনে হয় সাত হাত মাটির নিচে অন্ধ কূপে বসে থাকতে পারি যদি একটা জিনিস জানতে পারি, যে আলো বস্তুটা কি!"

আজও ঐ কথাগুলো আমার মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

পঞ্চাশ আলো-বছরের কিছু আভাস

প্রাক্কথন

কলকাতা এক সংস্কৃতি-নগরী, যে নগর কবি, লেখক, শিল্পীদের, যে-নগরে বাস করতেন জগদীশ চন্দ্র বসু, সি ভি রমন, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহার মতো দেশের অগ্রণী বিজ্ঞানীরা। সেই কলকাতা শহরেরই একটি শীর্ষস্থানীয় ইংরাজি দৈনিকে 'থিয়েটার' শিরোনামের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কলমে তারামণ্ডল বা প্ল্যানেটোরিয়ামের বিজ্ঞাপন যখন প্রকাশিত হয় তখন তা কিছুটা বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এমনও দিন গেছে যেদিন ওই কলমে প্ল্যানেটোরিয়ামের শুধু মাত্র ওই একটি বিজ্ঞাপনই বেরিয়েছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে থিয়েটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপীয়র, ইবসেন থেকে ব্রেখট, গোর্কী থেকে চেখভ, বিজয় তেন্ডুলকর থেকে শুরু করে গিরিশ কারনাড, বাদল সরকার, মোহন রাকেশ পর্যন্ত এক বিস্তৃত সীমানায় অসংখ্য নাট্যকারের নাটকের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি। প্রশ্নটা তাই মনের মধ্যে বারবার এসেছে, কেন প্ল্যানেটোরিয়ামের বিজ্ঞপ্তি 'থিয়েটার' শিরোনামের নীচে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কলমে দিনের পর দিন বেরোচ্ছে ?

উত্তরটা বোধহয় এই ভাবেই উঠে আসে যে, আমাদের যে থিয়েটার, ট্রাজেডি এবং কমেডির, প্রেম ও বিরহের নাটকের চরিত্রগুলির আনন্দ এবং বিষাদ, অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে গড়ে ওঠা যে থিয়েটার তার বিপরীতে সৌরজাগতিক বিশাল দৃশ্যপট আরও এবং অনেক বেশি বড় থিয়েটার।

অসংখ্য নক্ষত্র এবং অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জের এই নাটক ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের অসীম অখণ্ড প্রান্তরে, সূর্য, চন্দ্র বা দূরতম গ্রহকে ছাড়িয়ে হাজার, লক্ষ, কোটি কোটি আলোকবর্ষের সীমানায়। সেখান থেকে প্রতি রাত্রে আমাদের অনুষ্ঠিত সেই নাটকের বার্তা নিয়ে আসে আমাদের বিশ্বস্ত বার্তাবাহক দৃষ্টি গ্রাহ্য আলো। আরও তিনটি শক্তিশালী মাধ্যম (বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ) আমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয় রেডিও টেলিস্কোপির মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডি কেন্টকুলার্সের কথা এসে পড়ে। বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী টেলিস্কোপ যা দেখতে পায় না তিনি তা দেখতে পান। কুলার্স দৃষ্টিহীন প্রসবের নির্দিষ্ট সময় আগেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। দুর্বল হৃদ-প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত অক্সিজেন দেওয়ার ফলে রেটিনা নষ্ট হয়ে যায়। এই দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও ডঃ কুলার্স একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ এবং তাঁর অসাধারণ শ্রুতিশীলতা তাঁকে অন্য এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। মহাবিশ্বের দূরতম প্রান্ত, যেখান থেকে আমাদের সূর্যের তুলনায়ও লক্ষগুণ বড় নক্ষত্রের আলো আমাদের বৃহত্তম টেলিস্কোপে ধরা দেয় নি, সেই সূক্ষ্মতম রেডিও সিগন্যালকেও তিনি ধরতে পেরেছেন। কুলার্স নিজেই বলছেন, "অন্য কোনও মানুষ সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েও যা কোনও দিনই দেখতে সক্ষম হবেন না আমি তা দেখতে পাই।"

দৈহিক প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে ওঠার এই যে আশ্চর্যজনক মানবিক ক্ষমতা তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্টিফেন হকিং-এর কথাই বা উঠবে না কেন? তিনিও একজন পদার্থবিদ। জীবদ্দশাতেই তিনি হয়ে উঠেছেন জীবন্ত এক রূপকথা। বহুবছর তিনি তাঁর হুইল চেয়ার ছেড়ে নড়তে পারেন নি, এমন কি তাঁর কথা বলার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য তিনি তাঁর নিগূঢ় ভাবনাচিন্তার কথা লিখে গেছেন তাঁর 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইটিতে। কুলার্সের দৃষ্টিহীনতার মতোই হকিং-এরও বাস্তবতার বিভিন্ন দিকগুলি বোঝা এবং তা ব্যাখ্যা করার প্রয়াসের পিছনে সুদৃঢ় লক্ষ্য এবং অদম্য পরিশ্রম ছিল। আমাদের সকলের কাছে এটা একটা উৎসাহব্যাঞ্জক দৃষ্টান্ত। বিশেষত যখন আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করছি অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে আরও অনেক এবং আরও বেশি অর্থবহ আলো পাবার জন্য — বিজ্ঞানের পরিধি এবং থিয়েটার ও অন্যত্র আলোক ভাবনাকে আরও বেশি পরিস্ফুট করার জন্য।

আলোকপ্রক্ষেপণ বা দীপন-মাত্রা, আলোকমিতি সংক্রান্ত তথ্য বা শক্তির অপব্যবহার না ঘটিয়ে আলোকসজ্জার নানা কৌশল-ইত্যাদি কোনও বিষয়ই এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মানুষের নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত অভিমত, যে প্রকৃত-অর্থেই ওই প্রাচীর-বন্ধনী থেকে মঞ্চকে দেখছে। অথবা, শেক্সপীয়ারের কাছে মার্জনা চেয়েই বলা যায়, মঞ্চের ওই খোলা জায়গাটিতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক উত্থানকে, যুদ্ধ ও শান্তিতে, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবে, আপস অথবা বিশ্বাসঘাতকতায় নানা সংঘাতকে অবলোকন করেছে, এমনই এক দর্শকের মতামত।

একজন আলোকশিল্পীর অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি অনেকটা ক্ষুদ্রতম ফোটনের মতো। ফোটন হল আলোর কণিকা, ক্ষুদ্রতম হলেও যার নিজস্ব এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আছে। ১৮০৩ সালে টমাসের ইয়ং এর গবেষণায় এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। নানা পরীক্ষায় দেখা গেছে, দৃশ্যগ্রাহ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার। বহু আলোকবর্ষ দূরত্বের গ্রহ নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ যে আলো এসে আমাদের চোখে ধরা দেয় সেই আলোই জানিয়ে দেয় ওই গ্রহ বা নক্ষত্রের নানাবিধ উপাদান, যেমন হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লোহা, তামা, পারদ অথবা সোনা। আলো যে বার্তা আনছে আমাদের চোখ তাকে বিশ্লেষণ করছে, চোখের রেটিনা তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে, যাকে বলা হয় 'স্ট্রিয়েট কর্টেক্স এরিয়া ১৭ অব ব্রডমান।' যে মুহূর্ত থেকে আমরা আলো দেখছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দেখছি ততক্ষণই আমাদের স্নায়বীয় উপলব্ধি প্রত্যুত্তর দিয়ে যায়। আলো মিলিয়ে যাওয়া এবং পর্দা নেমে আসা পর্যন্ত তা চলতেই থাকে। কিন্তু অচেতন উপলব্ধি গভীর চিহ্ন রেখে যায় সমস্ত মানববোধের মানবিক সংস্কৃতির স্মৃতি-পদ্ধতিতে। হয়ত ডঃ কুলার্স এবং তাঁর সতীর্থরা ভবিষ্যতে কোনও এক দিন বর্হিবিশ্বের জ্ঞান অনুসন্ধানের (সার্চ যার এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স বা সেটি) সূত্রে বুদ্ধিমান প্রাণীর উপস্থিতি ধরতে পারবেন বা প্রত্যুত্তর জানাতে পারবেন আলোর সাহায্যে, অথবা আলোর সাহায্য ছাড়াই। অথবা হয়ত রেডিও তরঙ্গই তাঁদের বার্তা নিয়ে যাবে মহাকাশ ছাড়িয়ে দূরে, বহুদূরে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় প্ল্যানেটোরিয়ামকে থিয়েটার গোত্রভুক্ত করার পেছনে

যুক্তি আছে। এই থিয়েটারে আছে বিশাল সব চরিত্র, নাটকীয় ঘটনা, এর সূচনা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন 'সময়' নিজেও শুরু হয়েছে, সময় এবং মহাকাল। টাইম স্পেস, স্পেস-ওয়্যারপ্স, কারভেচার অব স্পেস অব টাইম ওয়্যারপ্স ইত্যাদি নতুন নতুন ভাবনা ও ধারণার সন্ধান আমাদের দিয়েছে নয়া - পদার্থবিদ্যা।

স্বপ্নে আমরা বহু ব্যাখ্যাতীত ও রহস্যজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাই। মন এবং বিষয়ের এইসব রহস্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। ইলেকট্রনিক্স, লেজার রে, হলোগ্রাফি এবং কম্পিউটার — এসবই এখন এই রহস্য উন্মোচনের হাতিয়ার।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশের নিউরন বা স্নায়ুকোষ প্রজ্জ্বলিত হয়ে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির সংজ্ঞাবহন বা অনুভব সঞ্চার করে। যেমন — খাড়া বা 'উল্লম্ব', সমান্তরাল বা আনুভূমিক এবং 'কোনাকুনি' ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণাগুলি মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা অংশ থেকে উদ্ভূত হয়। বিড়াল অথবা বাঁদরের ক্ষেত্রে ইলেকট্রডস ক্যাপচারিং ইমপালসের বা সহজকথায় তরিৎপ্রবাহ দিয়ে এব্যাপারে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা গেছে স্বপ্ন দেখাকালীন দ্রুত চক্ষু ঘূর্ণন বা রেম (র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট) এর তথ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে। তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে স্বপ্ন পদ্ধতির গ্রাফ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর থেকে স্বপ্নের ছবি এবং তৎকালীন অনুভব বা সংবেদের ধারণা মেলে। এবং এর ফলেই স্বপ্ন-মনোবিজ্ঞান অবচেতন মনের বহু রহস্যের হদিশ পাচ্ছে। আলো এবং আলোক প্রক্ষেপণ নিয়ে আমার ভাবনার ভূমিকা হিসাবে আপাততঃ এটুকুই যথেষ্ট।

উজ্জ্বল-সূচনা

আলোকসম্পাত বা আলোকসজ্জার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইমক্যানডেসেন্ট ল্যাম্পের ব্যবহার শুরু হয়। পুরনো দিনের তেলের লণ্ঠন বা মোমবাতির পালা চুকিয়ে এই শতকের সূচনায় মোটামুটি সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সেজে উঠেছিল ইনক্যানডেসেন্ট বা জোরালো সাদা আলোর জ্যোতিতে — অবশ্যই বিদ্যুতের সহায়তায়। কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের মতো মহানগরীর রাস্তায় শোভা পেত গ্যাসের আলো। এই শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকেও কলকাতা ও বোম্বাইয়ের রাস্তার লাইটপোস্টে এই ধরণের লাইটের ব্র্যাকেট দেখা যেত; বাজারে তখন এসে গেছে টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্পের যুগ।

বিশ এবং তিরিশের দশকের কিছু মানুষ হয়তো এখনও তাঁদের ফেলে আসা দিনের সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মনে করেন সেই লম্বাটে গড়নের বিচিত্র ল্যাম্পের কথা, যাতে ছিল একগুচ্ছ কার্বন ফিলামেন্ট। খুব ধীরে ধীরে বাল্বের আকার বদলেছে, বদলেছে বাল্বের ভিতর গ্যাস পুরে দেওয়ার পদ্ধতিও। ক্রমে বদলে যেতে কখন একেবারে চুপিসারেই এসে গেছে পাকানো কয়েল ফিলামেন্টের বাল্ব।

কয়েক বছরের মধ্যেই ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্পের আলো নগর জীবন তথা তার সামাজিক অবস্থানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, শহরের বুকে যখন

ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান হানা নেমে আসছে, তখনই শুরু হলো ব্ল্যাক-আউট। এই ব্ল্যাক-আউটের অভিজ্ঞতা রাতের অন্ধকারকে অন্য মাত্রা দিল—অন্ধকার তখন বড় বিষন্ন, বড় অশুভ। ঘরের বা অফিসকাছারির আলোগুলো ঢেকে দেওয়া হলো আলোর রশ্মি যেন ঠিকরে না বেরোয়। এমন কি রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টগুলির আলোতেও আবরণ বা ঠুলি পরানো হলো, সংক্ষেপে যে কর্মসূচিকে বলা হয় এ আর পি (এয়ার রেইড প্রোটেকশন)। এ হলো আলোর জন্য তৈরি বিশেষ ধরণের মুখোশ বা মাস্ক যা আলোকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাল্ব থেকে বেরোনো উজ্জ্বল আলোকরশ্মি এই আবরণে ঢাকা পড়ে এক ফালি ধোঁয়াটে, বিবর্ণ আলো বিকিরণ করবে—ঠিক লাইট পোষ্টের নীচে পড়বে সে কিরণ, একটুও ছড়াবে না। এই হলো সেই ভয়ঙ্কর সময় যখন অশুভ কালো তার শিকড় ছড়াতে শুরু করল। ব্ল্যাক আউটের পায়ে পায়ে এল কালো টাকা, কালো বাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ হিসাবে আজও এই কালো ভারতের বুকে বিরাজমান। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ থেকেই এই কালোর প্রতিপত্তি ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিল অনাহার ও দুর্ভিক্ষ। আর সেই সঙ্গে আলোর ব্যবহারে এই কড়াকড়ি হয়ে উঠল বিষন্নতার প্রতীক। আবার এরই পাশাপশি ঘটে গেল প্রযুক্তিগত উন্নতি, এল অগ্রগতির জোয়ার — এল রেডিও ব্রডকাস্টিং চ্যানেল।

চল্লিশের দশকেব মাঝামাঝি এল বিভিন্ন ধরণের গ্যাস নিঃসরনকারী ল্যাম্প, যার মধ্যে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। টিউব লাইট হিসাবেই তা বিশেষ পরিচিত। উজ্জ্বল নীলচে সাদা এই ল্যাম্পে চারিদিক ছেয়ে গেল। অফিস কলকারখানা, বাড়ি — সর্বত্রই টিউব লাইট। নতুন ধরণের এই আলো তার বহুবিধ সুবিধাজনক, ভালো দিক এবং উপযোগিতা নিয়েই গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের দেশে তথা গোটা বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ্যাস লাইট থেকে ইনক্যানডেসেন্ট বাল্বের যুগ পেরিয়ে রাস্তার লাইটপোষ্টেও এখন এই টিউব লাইটের ব্যবহার। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই আলো আমূল বদলে দেয় রাস্তার চেহারা। ঠিক একই রকমভাবে মার্কারি বা সোডিয়াম ল্যাম্প নামে পরিচিত আলো শুধু যে বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ এবং কলকাতার মেরিন ড্রাইভ, রাজপথ, জনপথ, মারিনা এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও এসপ্ল্যানেডের চেহারাই বদলে দিয়েছে তাই নয়, উজ্জ্বল নীলচে এবং সোনালী কমলা রঙের এই জ্যোতি ওই সব রাস্তার গোটা পরিবেশকে পাল্টে দিয়ে এক নতুন স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে। আজকের সাহিত্য, শিল্পকলা এবং চলচ্চিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেই স্বপ্নের সুন্দর ও সার্থক ছবি।

আলো এবং কৃত্রিম উপায়ে আলোকসম্পাত বা আলোকসজ্জার দ্বারা পশ্চিমের চিত্রশিল্পীরা ইতিমধ্যেই প্রভাবিত হতে শুরু করেছিলেন। রেমব্রাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। চিরাচরিত দ্বিমাত্রিক ছবির বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে এলেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা। রঙের ভান্ডার উজাড় করে দিয়ে তাঁরা ছবিতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন — আবিস্কৃত হলো বহুমাত্রিক ছবির জগৎ।

শিল্পে আলো

এইভাবে বাস্তবকে খুঁটিয়ে দেখা এবং তার শৈল্পিকে পুণর্নির্মাণ আলোকসম্পাতের যে ক্ষেত্রটিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটি হলো মঞ্চে নাচ, ব্যালে এবং নাট্যাভিনয়সক্রান্ত আলোকসম্পাত। সদ্যজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে- সঙ্গে চোখ মেলে চায়, দেখতে চায় চারধারের চেহারা। সচেতন মানুষ তার দৃষ্টি এবং হৃদয়ের মাধ্যমে অনুভব করে জীবনের নানা আবেগ, লাভ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মুড বা ভাব ও আবেগ অনুযায়ী আলোর মুড বা আলোক প্রয়োগের মূল নিহিত রয়েছে এরই মধ্যে।

ব্যবহারিক জীবনে সাধারণভাবে আমাদের ঘরবাড়ি বা রাস্তাঘাট, অফিসকাছারি আলোকিত করার জন্য যে সব সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় থিয়েটার শিল্পী তথা আলোক নির্মাতার হাতে সেইসব অতি তুচ্ছ জিনিসগুলিই হয়ে ওঠে শক্তিশালী হাতিয়ার। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি হাতে আসার দরুণ লেন্সসমেত একটা সম্পূর্ণ স্পট লাইট এবং বিম-লাইট নিয়ন্ত্রণের জন্য রিফ্লেকটরের ব্যবহার যখন আয়ত্ত্বাধীন হলো তখনই আলো ও রঙের যাদু পুরোপুরি উন্মোচিত করা গেল। একেবারে গোড়ায় শুধুমাত্র আলো ফেলে অন্ধকার দূর করে মঞ্চানুষ্ঠানকে দর্শকের চোখের সামনে আলোকিত করে তোলাই ছিল যথেষ্ট। পরবর্তী কালে স্পট লাইট এবং ডিমার কন্ট্রোল সিস্টেম খুলে দিয়েছে নতুন দিগন্ত। কোনও নাটক অথবা নাচে চরিত্রের বিশেষ মুড বা দৃশ্যের বিশেষ অংশ ভিন্নতর গুরুত্ব দিয়ে আলোকিত করে তোলার ব্যাপারে পরিচালক এবং আলোক নির্দেশক বিশেষ সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছেন। বিভিন্ন কম্পোজিশনের মুড বুঝে, কী ধরণের আলোক প্রক্ষেপণে তাকে আরও জীবন্ত এবং সার্থক করে তোলা যায় তা নির্ভর করে প্রযোজক এবং নির্দেশকের বিবেচনার উপর।

আলোক প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি বদলে গেছে বাল্বের চেহারা ও প্রকৃতি — অবশ্যই সিনেমা ও থিয়েটারে আলোকপ্রক্ষেপণের উপযোগী হয়ে উঠেছে এগুলি। তথাকথিত পুরনো বাল্বের প্রচুর অদলবদল ঘটেছে। সাধারণ ৬০ থেকে ১৫০ ওয়াটের বাল্বের জায়গায় এসেছে বিশাল এলাকা আলোকিত করার উপযোগী ফ্লাডলাইট। ৩০০ থেকে ১৫০০ ওয়াট বা তারও বেশি শক্তির এই বাল্বগুলি যে শুধু আকারেই বড় তাই নয় ঘরোয়া ল্যাম্পের বেয়নেট ক্যাপ এবং হোল্ডারের বদলে এগুলিতে থাকত স্ক্রু-ক্যাপ হোল্ডার বা বাইপোষ্ট। বড় বড় জায়গায় ব্যবহারের জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

মঞ্চ এবং সিনেমার স্টুডিওতে আরও উজ্জ্বল এবং ঘনীভূত আলোর চাহিদা ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং তখনই এল অন্য একধরণের বাল্ব, উপরে বর্ণিত সাধারণ ল্যাম্পের সঙ্গে যার প্রচুর পার্থক্য।

পরবর্তী এই ল্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল প্রজেক্টর, মঞ্চ ও স্টুডিও স্পট লাইটের অধিক মাত্রার আলোর প্রযোজনীয়তার কথা মাথায় রেখে। পুরনো দিনের স্লাইড বা ঘরোয়া প্রজেকশন ল্যাম্পের ব্যবহারের কথা মনে রেখে একেও প্রজেকশন ল্যাম্পই বলা হতে থাকে। বাণিজ্যিক সিনেমা হলগুলিতেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্ক ল্যাম্পের মতো না হলেও কমপ্যাক্ট মুভি প্রজেক্টরে এই বিশেষ ধরনের ল্যাম্প ব্যবহৃত হতো।

এর সঙ্গে লাগানো থাকতো একটি ফ্যান বা পাখা। এই পাখা চালানো থাকলে কাচের বাল্বটির তাপমাত্রা খুব বেড়ে যেতে পারতো না, অত্যাধিক এবং অসম তাপে ফুলে ওঠা বা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কাও দূর হতো। বিভিন্ন ধরণের প্রজেকশন ল্যাম্প আছে এবং তাদের আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড নামও রয়েছে। অতিরিক্ত আলোক উৎপাদনের ক্ষমতা ছাড়াও এই ল্যাম্পের আরও কিছু সুবিধাজনক দিক রয়েছে। যেমন আকার এবং আয়তনগত কমপ্যাক্টনেস ইত্যাদি, আবার এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

এই ধরনের বাল্বের অনেকগুলিরই প্রজ্জ্বলন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ — পঞ্চাশ থেকে দুশো ঘন্টা এর মেয়াদকাল। আবার অধিকাংশ বাল্বেই জ্বালানোর পদ্ধতি নিয়ে নানা নির্দেশিকা থাকে। যেমন 'ক্যাপটা নিচের দিকে রেখে জ্বালান', অথবা 'ক্যাপ থাকবে উপর দিকে' অথবা '৪৫° বেশি কোণে জ্বালাবেন না' ইত্যাদি।

চলতি টাংস্টেন ফিলামেন্টের বাল্বের তুলনায় অধিকতর উজ্জ্বল সাদা আলোদেয়া ল্যাম্প ইদানিং বেরিয়েছে — হ্যালোজেন ল্যাম্প। ফ্লাডলাইট, স্পট লাইট তথা স্টেজের যাবতীয় আলোকসম্পাতের জন্য এই ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়। মঞ্চে সাধারণ আলোকনিক্ষেপের জন্য ব্যাটন কমপার্টমেন্টেও এই আলো ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ড সারফেস বা নাটকের ভাষায় সাইক্লোরামা আলোকিত করার জন্য বিশেষ ধরণের ফ্লাডলাইটিং হাউসিং ইউনিট ব্যবহৃত হয়। এই সাইক্লোরামার একটি পশ্চাৎপট যা বেশিরভাগ সময়েই সাদা, ধূসর অথবা হালকা নীল রঙের হয়। অভিনয় ক্ষেত্রে বা অ্যাকটিং এরিয়ার পিছনের এই অংশে অনেক সময় দরজা, জানালা, দেওয়াল ইত্যাদি দেখানো হয়। আবার এই সাইক্লোরামা কখনও আকাশ হয়ে ওঠে; প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে গভীর রাতে সাধারণভাবে আকাশের যে পরিবর্তন ঘটে, যে ভাবে চাঁদ, তারা ঋতুক্রমিক মেঘের চেহারা বদলে যায় — সেই বহু বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে নাটক চলাকালীন এই সাইক্লোরামার বুকে। এই তথাকথিত আকাশ বা সাইক্লোরামা সমানভাবে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উপর এবং নীচ থেকে বিশেষ আলো নিক্ষেপের ব্যবস্থা করতে হয়। নিপুনভাবে পরিচালনা করে সাইক (সাইক্লোরামার ডাক নাম)-এর উপর নিক্ষিপ্ত আলোর দ্বারা অসীম প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। লাইট কনট্রোল প্যানেলের ডিমার ব্যাঙ্কের সাহায্যে আলোর তীব্রতার কমবেশি মিশ্রণ ঘটিয়ে আলোক নিক্ষেপে যুগান্তর সৃষ্টিকরা সম্ভব।

ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্পের প্রাথমিক যুগের হলদেটে আলোর তুলনায় টাংস্টেন হ্যালোজেন ল্যাম্পের তীব্রতর আলো অনেক সাদা এবং উজ্জ্বলতর। স্বাভাবিকভাবে স্পট এবং ফ্লাড লাইট হিসাবে হ্যালোজেন ল্যাম্পকেই অধিক পছন্দ করা হতে থাকে। এখন সাইক্লোরামায় আলোকসম্পাতের জন্য আলোক পরিচালকরা ক্ষুদ্রতর এবং উজ্জ্বলতর লাইট ব্যবহার করেন। এর ফলে আলোক নির্দেশকরা অভিনয় এলাকায় এবং অবশ্যই সাইক্লোরামায় আরও বেশি ছবি তৈরির সুযোগ পেলেন। যে কোন নাট্যকর্মে শিল্পী তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন।

থিয়েটার ছাড়াও খেলার স্টেডিয়াম, বিমানবন্দর এবং রেলপথেও এই হ্যালোজেন ফুটলাইট খুবই কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিরিশ বছরের মধ্যে সিনেমা, টি

ভি, থিয়েটার এবং বাণিজ্যিক দুনিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে এই হ্যালোজেন। হ্যালোজেনে আজ আর কোনও অভিনবত্ব নেই। ষাটের দশক থেকেই হ্যালোজেন তার নিজের জোরেই সর্বত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে।

আলোর সাহায্যে মঞ্চে ছবি আঁকার এই কাজটি প্রথম করেছিলেন অ্যাডলফ আপ্পিয়া। মঞ্চে আলোক নির্দেশনার জনক আপ্পিয়া। সেটা ছিল গত শতকের শেষ ভাগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক বলতে তখন প্রায় কিছুই ছিল না। ওয়াগ্‌নার্স অপেরার 'ট্রিস্টান অ্যান্ড আইসোল্ডে' সুদক্ষ আলোক পরিকল্পনার মাধ্যমে অসাধারণ চিত্রনির্মাণ করেন আপ্পিয়া। নিঁখুত আলোর স্কীমিং-এ সাফল্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যান তিনি। সেই সময়ে যখন স্পট লাইটের উৎস নিয়ন্ত্রণ বা আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ ছিল সুদূর ভবিষ্যতের কথা তখন তিনি কী ভাবে এই কাজে সাফল্য লাভ করেছিলেন সে কথা ভাবলে আজও বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তাঁর স্বপ্নকে খাতায়-কলমে বাস্তবায়িত করে তুলেছে।

রঙের ভূমিকা

সকালে সূর্যোদয় থেকে সন্ধের সূর্যাস্ত — এই প্রকৃতির বুকেই মানুষ দেখেছে লাল মেঘের বর্ণচ্ছটা। দেখেছে চাঁদের রোমান্টিক, মায়াবী, রূপোলী আলো, প্রত্যক্ষ করেছে কী অদ্ভুত মায়ায় সেই হালকা চাঁদের কিরণ চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে গাছের পাতা বেয়ে। ভাষা, সম্প্রদায়, এবং ধর্ম ভেদে সর্বকালের সর্বদেশের কবি এবং চিত্রকররা এই সব দৃশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, উৎসাহী হয়েছেন নির্মাণ কার্যে। থিয়েটারের মানুষগুলিও প্রকৃতির ইশারা পেয়েছেন, শিল্পকর্মে কাজে লাগাতে চেয়েছেন তাকে। ধরতে চেয়েছেন বর্ণময় প্রকৃতিকে। প্রাথমিক ভাবে লাল, নীল এবং সবুজ দিয়ে শুরু করে আজ বহুবিধ গবেষণার পরে সিনথেটিক জিনিস ব্যবহার করে রঙ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে — ষাট, সত্তর বা তারও বেশি রঙের ব্যবহার আজ মঞ্চে সম্ভবপর। নীল বা সবুজেরই এখন কত বিচিত্র শেড — সাত আট রকমের কম তো নয়ই। এই নতুন নতুন রঙের ফিল্টার থিয়েটারে আলোকসম্পাতকে ভিন্নতর শিল্পমাত্রা দিয়েছে। এর ফলে মঞ্চে বিভিন্ন উৎস থেকে নিরন্তর আলোর প্রবাহকে ধরে রেখে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন অংশ বা জোনকে আলোকিত করে মঞ্চে অভিনেতাদের কোরিওগ্রাফ ও অ্যাকশন বুঝে আলোকপ্রক্ষেপ সম্ভব হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন বর্ণের সিল্কের কাপড়ের টুকরো দিয়ে রঙিন আলো তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। পরে বাল্বগুলিকে রঙিন দ্রবণে ডুবিয়ে এবং তারও পরে আলোর সামনে রঙিন কাচের টুকরো ধরে রঙিন আলো তৈরি করা হতো। আউট ডোরের সন-য়েত লুমিয়ের শো-তে অবশ্য এখনও এই প্রথা চালু আছে। কাচে ফাটল ধরা রুখতে তাপ-সহনকারী বিশেষ ধরণের কাচ তৈরি করা হয় এবং চৌকো কাচের ফিল্টার কেটে সরু, লম্বা টুকরো ফালি করে কেটে প্রতিটি ফালির মাঝখানে এক চুল পরিমাণ এয়ার গ্যাপ রাখা হয়। বেশি ওয়াটের বাল্বের তাপের কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা। ফিল্টার ব্যবহারের একটা জরুরী ব্যবহারিক দিকও আছে। এছাড়া আলোর উৎসগুলো খোলা থাকলে

ফিল্টারগুলোতে ধুলো, ময়লা, বৃষ্টি এবং জলীয় বাষ্প বসে যায়। ভবিষ্যতে তা রঙিন আলোর ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়, এথেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফিল্টারগুলি তাদের স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শোয়ের সময়ে কোনও বিশেষ শব্দের সঙ্গে কোনও বস্তুতে প্রক্ষিপ্ত বিশেষ বর্ণের আলো উপযুক্ত মাত্রা লাভ করে না, বা উপযুক্ত মাত্রা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

বিশ্বের সর্বত্রই সন-য়েত-লুমিয়ের শো তে বিশেষ ধরণের আলোকসম্পাতের ব্যবহার করা হয়। ভারতের কয়েকটি শোয়ের উল্লেখ এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না — যেমন দিল্লির লাল কেল্লা, কাশ্মীরের শালিমার গার্ডেন, আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম — যেখানে তিরিশের দশক অবধি থেকেছেন গান্ধীজী এবং সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান, তৎকালীন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লবণ সত্যাগ্রহ অভিযান বলে যা পরিচিত। মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র ফোর্ট যা ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কিংবদন্তী। যেখানে রাজা মান সিংহের দরবারে ছিলেন তানসেন এবং বৈজু বাওরার মতো সঙ্গীত শিল্পী। এই মান সিংহই গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নীর সঙ্গে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন এবং মৃগনয়নীকে তাঁর মহিষী করে নেন। এছাড়া রয়েছে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেল, যেখানে ব্রিটিশ আমলে স্বদেশীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো।

ডিমারের উন্নতি

আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল সিস্টেমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শৈল্পিক আলোকসম্পাতের প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে। পুরনো দিনের আর্ক ল্যাম্পের পর লেন্সের সাহায্যে আলোক আরও সরু এবং ঘনপীনদ্ধ করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কবা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে ছড়িয়ে পড়া আলোর প্রতিসরণ ঘটানো। টাংস্টেন ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্পে লেন্স এবং রিফ্লেক্টর যুক্ত করে অনেক বেশি উন্নত করে তোলা গেছে, সেই সঙ্গে কাটার, শাটার, আইরিশ কনট্রোলার ইত্যাদির সাহায্যে তার আলোকে উজ্জ্বল এবং কেন্দ্রীভূত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। তবে আকস্মিক সুইচ অফ অনের পরিবর্তে ল্যাম্পের ভোল্টেজের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগান্ত সৃষ্টি হয়েছে। এই ডিমিং বা ধীরে ধীরে আলো কমিয়ে আনার ইতিহাসও সুবিস্তৃত। প্রথমে ছিল ওয়াটার ডিমার। একটি মাটির অথবা পোর্সিলিনের জারে স্যালাইন ওয়াটার বা নুন জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হতো একটি ধাতব পাত, যা যুক্ত থাকত ইলেকট্রিক ল্যাম্পের তারের সঙ্গে। জলের নিচে রাখা অপর একটি ধাতব পাতের সঙ্গে যুক্ত থাকত ওই পাতের অপর প্রান্ত। প্রথম ধাতব পাতটি যখন ধীরে ধীরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে জলের নিচে রাখা ধাতব পাতটির কাছে নিয়ে যাওয়া হতো ততই আলো আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং শেষ পর্যন্ত যখন প্রথম ধাতব পাতটি জলের নীচে রাখা স্থায়ী ধাতব পাতটিকে স্পর্শ করত তখনই আলো পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হতো। অমার্জিত বা খুব কাঁচা মানের হলেও ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে ওয়াটার ডিমারের ভূমিকা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী ডিমার সেট অনেক উন্নত ধরনের, বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের বহু আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত। যেমন বিভিন্ন গেজের সাইক্রোম তার একটি কুপরিবাহী ধাতব পাতের উপর স্থাপন করে অথবা রেজিসটেন্স পাথের উপর দিয়ে একটি পাত এবং চলমান কার্বন টার্মিনালকে চালনা করে।

ভ্যারিয়েবল ট্রান্সফরমার সিস্টেমের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ডিমার কন্ট্রোলের ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেল। স্বয়ংচালিত ট্রান্সফরমার বা ভ্যারিয়াক ডিমার আজ বহুল প্রচলিত, বিশেষ করে স্থায়ী থিয়েটার হলগুলিতে তো বটেই। দিল্লির এ আই এফ সি এস থিয়েটারের আগে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে এক ধরণের আলোকসম্পাতের ব্যবহার চালু হয়েছিল। ইউনাইটেড কিংডমে প্রথম এই ধরনের ডিমার কনট্রোল চালু হয়—একে বলা হতো সানসেট টাইপ সূর্যাস্ত ধরনের ডিমার ব্যবস্থা। সম্ভবত দিল্লির এই থিয়েটারটিই আধুনিক স্পট লাইট, ত্রিমার কনট্রোল এবং মেঘ, বৃষ্টি এবং অন্যান্য লাইটিং এফেক্ট সম্বলিত প্রথম থিয়েটার হল। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লাইটিং প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ঘটায় আজ এই থিয়েটারের ডিমার কনট্রোল সিস্টেম বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পুরনো বা ব্যাকডেটেড হয়ে পড়েছে।

আধুনিক ডিমার কন্ট্রোল সিস্টেম ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে আলোক নির্মাতা তাঁর সুবিধাজনক জায়গা থেকে প্রচুর সংখ্যক লাইটিং সার্কিটের দ্বারা আলোক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সাধারণত প্রেক্ষাগৃহের একেবারে পিছন দিক থেকেই এই আলোক নিয়ন্ত্রণ সুবিধাজনক হয়। এই কনসোল সিস্টেম অত্যন্ত কম্প্যাক্ট। ছোট্ট ছোট্ট বোতাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় সামান্য আঙুলের ঠেলায় এবং থিয়েটারে ছবি সৃষ্টি করা সহজতর হয়ে ওঠে। এর প্রচুর সুযোগ সুবিধে রয়েছে মেমারি সিস্টেম, ফেড করে দেওয়ার ব্যবস্থা অথবা নাট্য নির্দেশকের প্রয়োজনানুযায়ী কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে আলোর প্যাচ ওয়ার্ক ইত্যাদি তো রয়েছেই।

১৯৩৭ সালে এশিয়ান গেমসের সময়ে নির্মিত দিল্লির সিরি ফোর্ট থিয়েটারে আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিমার কনট্রোল সিস্টেমের পাশাপাশি আধুনিকতম টাংস্টেন হ্যালোজেন স্পট এবং অন্যান্য আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। দশ বছর কেটে যাওয়ার পর এব অনেক কিছুই হয়তো পুরনো বা প্রাচীন কালের বলে বিবেচিত হচ্ছে কারণ আলোক প্রযুক্তি অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

শিল্প ও প্রযুক্তি

থিয়েটারে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে ভারত শুরু করেছিল একেবারে শূন্য থেকে। একেবারে গোড়ার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, দেশের বাইরে থিয়েটারে আলো নিয়ে কী ঘটে চলেছে সে সম্বন্ধে আমাদের থিয়েটার কর্মীদের কোনও ধারণাই ছিল না। আমরা ছিলাম গহন অন্ধকারে। এবং স্বীকার করতেই হবে নিজেদের ঐকান্তিক কল্পনা এবং আবেগকে মূলধন করে প্রায় সহায়সম্বলহীন অবস্থা থেকে আমরা থিয়েটারে আলোর ব্যবহার করতে শুরু করেছি।

থিয়েটারের প্রতি লাগামছেঁড়া আবেগ এবং আলোর জন্য দুর্দম আর্তি আমাদের সাফল্যের

দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ফেলে দেওয়া জিনিস, যেমন ভাঙা বিস্কুটের ক্যানেস্তারা, স্টেনশিলে কাটা আলোর শিখার ডিজাইন দিয়ে ঘরে তৈরি করা রোলার এবং জলের তরঙ্গ কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে অঙ্গারের মতো প্রযোজনা। সেখানে ফুটে উঠেছে জলে ভেসে যাওয়া কয়লা খনির জীবন্ত প্রতিভাস। এই নাটকের রচয়িতা উৎপল দত্ত, সঙ্গীত পরিচালক রবিশংকর এবং আলোর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন কলকাতার এক প্রায়-অখ্যাত আলোক-নির্দেশক। সেটা ছিল ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস। ভারতের আধুনিক লাইটিং ব্যবস্থার একেবারে গোড়ার যুগ বলা চলে।

ওই একই সময়ে মঞ্চে আরও একটি কাজ হয়েছিল। লোক মুখে যা বিশেষ আলোচিত হয়ে উঠেছিল — সেটি হল মঞ্চে চলমান ট্রেন। শব্দ এবং আলোর যুক্ত প্রভাব ঘটিয়েই এটা সম্ভব হয়েছিল। টেপ রেকর্ডে বাজানো হতো দ্রুত ধাবমান ট্রেনের ক্রমশ এগিয়ে আসার শব্দ। ভারতীয় থিয়েটারের অনন্য অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র ছিলেন নায়িকা। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তিনি। ট্রেনটি ক্রমশ এগিয়ে আসে নায়িকার দিকে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যাঁরা কলকাতার মঞ্চে সেতু নাটকটি দেখেছেন তাঁরা চিরদিন মনে রাখবেন এক মিনিটের ওই শ্বাসরুদ্ধকারী দৃশ্যটি। অসম্ভব কল্পনা, স্বপ্ন এবং সর্বোপরি থিয়েটারের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ওই দৃশ্যটির জন্ম দিয়েছিল। সমগ্র থিয়েটারের যাবতীয় উপকরণের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল স্মরণীয় সেই দৃশ্যটি। নাটকটি চলেছিল এক টানা পাঁচ বছর, হাজার রজনী অভিনীত হয়েছিল সেতু।

পিছনে ফিরে তাকিয়ে বোধ হয় বলা যায় যে প্রতিদিনকার জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে মানবিক কৌতূহল এবং নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি আমাদের বারবার উস্কে দিয়েছে নতুন কিছু করতে, নাটকে আলো নিয়ে খেলা করতে। সে খেলায় আমরা সকলে সমবেত ভাবে অংশ নিয়েছি। বিজ্ঞানীরা আলোর অনুসন্ধান করেছেন, ইঞ্জিনিয়াররা খুঁজেছেন স্পেস বা মঞ্চের সুনিপুণ ব্যবহারের পথ এবং সেই সঙ্গে হিসাব করেছি কী ভাবে দিনের আলো এবং রাতের প্রখরতা এবং নম্রতার সঙ্গে স্পট লাইট এবং প্রজেক্টরের আলোর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায় ; কী ভাবে স্বাভাবিক আলোর প্রভাব ফুটিয়ে তোলা যায় থিয়েটারে, সৃষ্টি করা যায় আলোর যাদু।

দেশকাল নির্বিশেষে আলোর যাদুতে মুগ্ধ হয় অবালবৃদ্ধবনিতা এবং এই মুগ্ধতা থাকবে যতদিন আমাদের দৃষ্টি আছে, যতদিন আছে আমাদের হৃদয়।

বছর আটেক বাদে যখন আমরা ২০০০ সালের নববর্ষের দিনে পা রাখবো, কে জানে সে দিন হয়তো এসে যাবে আরও অনেক কিছু। মঞ্চে আলোকসম্পাতের জন্য এসে যাবে লেসার বিম এবং ফাইবার অপটিক। আগামী দিন আগামী প্রজন্মের থিয়েটার কর্মীদের জন্য আলোক পরিকল্পকদের জন্য, নিয়ে আসবে নতুনতর প্রযুক্তির ভাণ্ডার।

অনুবাদ : তন্দ্রা চক্রবর্তী

থিয়েটারে আলোর আয়োজন

রঙ্গমঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ হলো এমন একটি ক্ষেত্র যা নির্মিত হয় কলাকুশলী এবং দর্শক সাধারণের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে। আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের সময়ে মঞ্চের অবস্থান ঠিক কোথায় হবে, কী ভাবে মঞ্চ ও দর্শক-আসনের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন সহজতর হয়ে উঠবে—এগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেই কারণেই প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে কয়েকটি ব্যাপারে বিশেখ যত্নবান হতে হয়। সেই বিষয়গুলি হল:

(১) অভিনয় দেখার ক্ষেত্রে যেন কোনও রকম অসুবিধা সৃষ্টি না হয়;

(২) সংলাপ, সঙ্গীত এবং সাউন্ড-এফেক্ট যেন সহজেই শোনা যায়। এবং এই দেখা ও শোনাকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলার মধ্যেই যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিত সামগ্রীকে দর্শকসাধারণের চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলা একান্ত জরুরি। রঙ্গমঞ্চের দুধার ও পিছনের দেওয়াল, প্রসেনিয়াম আর্চ, টরমেন্টর, উইংস এবং প্রেক্ষাগৃহের সামগ্রিক সাউন্ড-সিস্টেম—এসবই গড়ে তোলা হয় ওই দেখা ও শোনাকে সহজতর করে তোলার জন্যে।

সামনের সারি থেকে পিছনের সারি পর্যন্ত প্রতিটি দর্শকের অভিনয় উপভোগের জন্যে প্রথমেই অডিটোরিয়াম বা দর্শক আসনের দিকটি অন্ধকার করে শুধুমাত্র মঞ্চ বা অভিনয় ক্ষেত্রটিকে আলোকিত করে তোলা আশু প্রয়োজন।

এবং এইভাবে আলোকসম্পাতের দ্বারা মূল স্টেজকে উজ্জ্বলতর করে তোলাই হলো থিয়েটারে পরিকল্পিত আলোকসম্পাতের প্রথম ধাপ বা প্রথম পর্যায়।

দূরত্ব, অ্যাঙ্গেল এবং দর্শক আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মঞ্চের উচ্চতাগত ব্যবধান ইত্যাদির কথা বিবেচনা করেই আলোকরশ্মি নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গড়ে উঠেছে এবং এক্ষেত্রে আলোর সূত্র বা উৎসের ছটা যেন সরাসরি দর্শকের চোখে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। বিজ্ঞান ও শিল্প এখানে অগ্রসর হয়েছে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে। এটা সম্ভব হয়েছে এই জন্যই যে বিষয়টি শুধুমাত্র লাইট-ডিজাইনারদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট এবং সাধারণ ডিজাইনাররাও। আমার মনে হয় সামগ্রিকভাবে নাটকের পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা ও আমার মতো লাইটিং ডিজাইনারের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার সঙ্গেও এঁদের যুক্ত থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।

(৩) এখন আমি আপনাদের নিয়ে যা'বো থিয়েটারে আলোকসম্পাতের বিস্ময়কর দুনিয়ায়। আধুনিক থিয়েটারে আলোকসম্পাতের সাজসরঞ্জামের বর্ণনা দিয়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা করবো আধুনিক নাট্যাভিনয়ে ঠিক কোথায় কখন কী ধরণের আলোকসম্পাতের প্রয়োজন হয় এবং কী ভাবে তা করা সম্ভব।

(৪) সাধারণ ব্রড বা ফ্ল্যাট লাইটের জন্যে মঞ্চের উপরকার ব্যাটন বা বর্ডার লাইট ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাটন লাইট থাকে সারিবদ্ধভাবে— প্রতিটি ল্যাম্প ১০০ থেকে ১৫০ ওয়াট বিশিষ্ট হয় এবং এগুলি সমান্তরাল ভাবে তিন অথবা চারটি সার্কিটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রঙ ভেদেও আলাদা-আলাদা সার্কিট থাকে। যেমন প্রথম ব্যাটন, দ্বিতীয় ব্যাটন....। একটি বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে সাধারণত চার-পাঁচটির বেশি সেট থাকে না। প্রত্যেকটি ইউনিটকে পার্শ্ববর্তী ইউনিটের থেকে পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে রাখা যায় এবং প্রত্যেকটি ভাগ বা কম্পার্টমেন্টের জন্যে একটি করে রঙিন ফিল্টার লাগানো হয়। কখনও কখনও একটি সার্কিটে রঙিন ফিল্টার না লাগিয়ে সেটি পরিচ্ছন্ন সাদা আলোর জন্যে ব্যবহার করা হয়।

সামনের কার্টেন লাইনের বাইরের ধার ঘেঁসে ঠিক এইরকমই লাইটের কম্পার্টমেন্ট থাকে। আপনারা সবাই জানেন একে বলে ফুট লাইট। এই ফুটলাইটের কানেকশন ঠিক একইরকম ভাবে রঙ ভেদে তিন-চারটি সার্কিটের সঙ্গে যুক্ত থাকে—লাল, নীল, হলুদ এবং একটি রঙ ছাড়া উজ্জ্বল সাদা। ফুটলাইট নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই লাইট আলো দেয় নিচের দিক থেকে। কার্টেন লাইন ঘেঁসে বা ঠিক তার বাইরে যে সব অভিনতা-অভিনেত্রী থাকেন তাঁদের মুখ এবং বিশেষ ভাবে চোখ উজ্জ্বল করে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় এই ফুটলাইট। মানতেই হবে অভিব্যক্তি প্রকাশে চোখের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ফুট লাইটের ব্যবহার অবশ্য ইদানীং অপ্রচলিত হয়ে আসছে। ওতে এই লাইটের একটা গুরুত্বপূর্ন কাজ কোনও দিনই অন্য কোনও লাইটের দ্বারা সম্ভব হবে না। সেটা হল অভিনয় দেখার জন্যে অপেক্ষারত দর্শকদের মধ্যে প্রত্যাশার আবেগকে ঘনীভূত করে তোলা এবং তাদের মধ্যে একটি আনন্দের ভাব জাগরূক করা। মঞ্চের পর্দাটির উপর এই ফুটলাইটের কিরণ ফেলেই দর্শকের মধ্যে এইসব মনোভাব জাগিয়ে তোলা সম্ভব। ফ্রন্ট-লাইটের অন্যান্য পদ্ধতি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে একথা ঠিক পুরনো দিনের এই ফুট-লাইট কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতুলনীয়।

মঞ্চের উপরকার ঝুলন্ত ব্যাটেন লাইটগুলি যাতে সরাসরি দর্শকের চোখে না পড়ে সেজন্য কাপড়ের বর্ডারিং-এর মাধ্যমে ওগুলি যথাযথ মাস্কিং করা বা ঢেকে দেওয়া দরকার। মঞ্চ তথা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের নকসা প্রস্তুতের প্রাথমিক পর্যায়েই এই বর্ডার লাইট এবং তার মাস্কিং-এর বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। নকসার সাইড-এলিভেশনে লাইট-লাইন, বর্ডার-মাস্কিং এবং উইংস ইত্যাদির সুপরিকল্পিত বিন্যাস অবশ্য কর্তব্য।

ফুটলাইট পরিকল্পনাও বিশেষ মনোনিবেশ দাবি করে। লক্ষ্য রাখতে হবে ফুটলাইট যেন উঁচু হয়ে থেকে দর্শকের দৃষ্টি পথ ও মঞ্চের ফ্লোরের মধ্যবর্তী স্থানে বাধার সৃষ্টি না করে। অডিটোরিয়ামের স্লোপ বা ঢাল এবং মঞ্চের উচ্চতার লেভেলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ বিবেচনা করে তবেই ফুটলাইটের পরিকল্পনা করতে হয়। ফুটলাইট ইউনিটগুলি স্থাপনের জন্যে প্রয়োজন থিয়েটার হলের ঢাল বা স্লোপ; এর অ্যাঙ্গল, দূরত্ব ইত্যাদি আবার থিয়েটার হলের আয়তনের উপর নির্ভরশীল।

স্টেজ লাইটিং বা মঞ্চে আলোকসম্পাতের জন্য বিভিন্ন আলোক ব্যবস্থার বা সূত্রের যে নাম আছে সেগুলি থেকেই তার কাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল এবং ঘন আলোর

দাবিতে সর্বত্র যেমন ব্যবহৃত হয় বেশি ওয়াটের ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প, থিয়েটারেও ঠিক তেমনই চলে আসে এই ল্যাম্পের ব্যবহার। ৩০০, ৫০০, ১০০০ ওয়াটের বড় বড় ল্যাম্প উপযুক্ত হোল্ডার, স্ক্রু-ক্যাপ এবং ব্যাক-রিফ্লেকটর দিয়ে ব্যবহার করে মঞ্চে আলোর বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়—এরই নাম ফ্লাড লাইট। এই ধরণের দৃশ্যকে আমরা বলি লাইটের দৃশ্য—সিন উইদ লাইটস। অপেক্ষাকৃত কম ওয়াটের কয়েকটি বাল্ব দিয়ে সাধারণ ব্যাটেন বা ফুটলাইট ব্যবহার করলে এই সব দৃশ্য অদ্ভুতভাবে আমূল বদলে যায়।

ছোট বাল্ব অনেক গুলো একসঙ্গে ব্যবহার করে কিন্তু ফ্লাড-লাইটের এফেক্ট কখনই আনা যাবে না। ফ্লাড-লাইট এমন ধরণের লাইট-ফিটিং যা সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এবং বিভিন্ন পয়েন্টে, বিভিন্ন কোণ এবং উচ্চতা থেকে একক সূত্র হিসাবে যা স্টেজকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। এক্ষেত্রে একটি অথবা একাধিক ফ্লাড-লাইটের রঙিন সমন্বয় ব্যবহার কবে বিভিন্ন মুড প্রকাশ কবা সম্ভব। ফ্লাড-লাইটের ফিটিং, তার রিফ্লেকটর এবং বিশাল বাল্ব ব্যবহারের ফলে যে ভয়ঙ্কর তাপ সৃষ্টি হয় তার জন্য উপযুক্ত ভেন্টিলেশন বা হাওয়া চলাচল ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প ও অন্যান্য গ্যাস তথা শক্তিশালী ল্যাম্প যতই উন্নত ও আধুনিকতর হয়ে উঠেছে রেলওয়েইয়ার্ড, বিমানবন্দর, কারখানা এবং বিভিন্ন ওয়ার্কশপের ব্যবহৃত ফ্লাডলাইটেও তাব প্রভাব পড়েছে অনিবার্যভাবে। তবে ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প আবিষ্কারেব ঠিক একশো বছর পরে মঞ্চে আলোকসম্পাতের জন্য ব্যবহৃত এই ল্যাম্প কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত অধিক ক্ষমতাশীল টাংস্টেন ল্যাম্প এসে যাওয়ার পরে তো বটেই।

মঞ্চে আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে অন্য দুটি প্রয়োজনীয় আলো হলো:

প্রথমত স্পটলাইট এবং দ্বিতীয়ত ডিমার বা ডিমার কন্ট্রোল বোর্ড। আবারও নামই কাজের ইঙ্গিত দেচ্ছে। বিশেষ ধরণে নির্মিত প্রজেকশন ল্যাম্পেব আলোকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘনপানদ্ধ করে নিক্ষেপ করা হয় এই স্পট লাইটের মাধ্যমে । ছোট আকারের বাল্বে থাকে একগুচ্ছ ফিলামেন্ট, উজ্জ্বল কিন্তু (নির্দিষ্ট [illegible] বস্তুতে) স্বল্পকালের জন্য প্রক্ষিপ্ত হয় এই আলো।

বিশেষ ধরণের ল্যাম্প ছাড়াও স্পট লাইটের অন্যান্য [illegible]গুলি হলো:

(ক) একটি লেন্স যা আলোকে ঘনপীনদ্ধ করে একটি [illegible] আলোকরশ্মির আকার দেয়,

(খ) আশে পাশে ছড়িয়ে পড়া আলোর অপচয় রোধ করে সেই আলোকে যথাযথ কাজে লাগানোর জন্যে রিফ্লেকটর,

(গ) তাপ নিঃসরণের জন্যে ভেন্টিলেশন বা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা এবং আলোর রশ্মি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী অ্যাডজাস্টেবল- ফোকাসিং ব্যবস্থা

(ঘ) স্পট লাইটের সহজ নড়াচড়ার জন্যে ক্ল্যাম্প, ব্র্যাকেট এবং অন্যান্য মাউন্টিং ব্যবস্থা

প্যানিং: ধার বরাবর।

টিল্টিং: উপর নিচে কাঙ্ক্ষিত অ্যাঙ্গেল বা কোণ ধরার জন্যে। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে যেন উচ্চতার তারতম্যের জন্য উঁচু-নীচু করা যায়।

(ঙ) রঙিন ফিল্টার অথবা বিভিন্ন আকারের মাস্ক লাগানোর জন্যে উপযুক্ত খাঁজ। এই

মাস্ক ব্যবহার করেই আলোর রশ্মিকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে এনে কোনও অভিনেতার মুখমণ্ডল বিশেষভাবে আলোকিত করে তোলা সম্ভব।

এই স্পট লাইট এতই নমনীয় এবং সহজে নাড়াচাড়া করা যায় (অ্যাডজাস্টেবল) যে নাট্যকর্মীদের কাজে অসীম দিগন্ত খুলে দিয়েছে এই লাইটিং ব্যবস্থা। এই লাইটের ফলেই মঞ্চে ছবির মতো কম্পোজিশন বা দৃশ্য তৈরি সম্ভব হয়েছে। স্টেজে বিভিন্ন কোণ বা অ্যাঙ্গেল থেকে এই স্পটলাইটের ব্যবহারের ফলেই অ্যাডলফ অ্যাপ্পিয়ার স্বপ্ন সফল হয়েছে। মঞ্চে আলোর মায়া সৃষ্টির যে কল্পনা তিনি বিস্তার করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। (১৮৯৯ সালে অ্যাডলফ অ্যাপ্পিয়াই প্রথম অত্যন্ত সুপরিকল্পিত আলোক নির্দেশনায় সাফল্য অর্জন করেন)। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ, আলোর তীব্রতার তারতম্য ঘটিয়ে মঞ্চের ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ অভিনেতাদের ফোকাস করে, আলো-আঁধারির মাধ্যমে সমগ্র নাটককে কী ভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখব, স্পটলাইটের সঠিক ও সচেতন ব্যবহার কী ভাবে নাটকের মূলভাবের অনুসারী হয়ে উঠতে পারে, নাটকে যুক্ত করতে পারে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা বা নাটকীয়তা।

মঞ্চে আলোকসম্পাতের মগজ এবং মনন হলো ডিমার কন্ট্রোল বোর্ড; একটি ব্যপার সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে থিয়েটারের যাবতীয় আলো নিয়ন্ত্রিত হয় এই ডিমারের সাহায্যে। আবারও নাম থেকে কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 'টু ডিম'-আলোর ভোল্টেজ কমায় বা বাড়ায় যে যন্ত্র।

বেশ কয়েকটি ডিমার একত্রিত করে তাকে বলা হয় ডিমার কন্ট্রোল বোর্ড বা ডিমার ব্যাঙ্ক। প্রাথমিক পর্যায়ের তরল বা ওয়াটার ডিমারের ধাপ পেরিয়ে বর্তমানের ডিমার কন্ট্রোল বোর্ড প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। ব্যবস্থাটা ছিল মোটামুটিভাবে এইরকম : একটি লবন-জল পূর্ণ পোর্সিলিনের জার অথবা ড্রেন-পাইপের একেবারে নিচের দিকে ফিক্স করা থাকে একটি ধাতব টার্মিনাল প্লেট। অন্য একটি টার্মিনাল খুব ধীরে ধীরে ওই ফিক্সড টার্মিনালটির কাছে নিয়ে যেতে হয়—ফিক্সড টার্মিনালকে স্পর্শ করলেই পুরোপুরি বৈদ্যুতিক কানেকশন হয়ে সংযুক্ত ল্যাম্পটি পুরো ভোল্টেজে জ্বলে উঠবে। ভোল্টেজ রেগুলেটরের সামান্যতম উন্নত সংস্করণকে বলা হয় স্লাইডার ডিমার এবং আরও কিঞ্চিৎ উন্নত বা আধুনিক ব্যবস্থায় এই একই জিনিসের নাম হয় মাল্টি কনট্যাক্ট ডিমার। মূল বিষয়টা হলো, একটি কার্বন-ব্রাশকে প্রয়োজন মতো উঠিয়ে নামিয়ে কোনও সার্কিটের রেজিসটেন্স খুব ধীরে ধীরে বাড়ানো কমানো।

এই কাজের জন্য সঠিক মাপ বা আকারের রেজিসট্যান্স-তার নির্বাচন করতে হয় এবং আলোর পরিবর্তনকে মসৃণ থেকে মসৃণতর করার জন্যে বিভিন্ন গেজের তার পাকিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে আলোর গতি হয় সাবলীল। আলো থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামানো বা অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের ক্ষেত্রে কোনও ঝাঁকুনি বা ধাক্কা অনুভূত হয় না। উদাহরণ হিসাবে কোনও নাটকে রাতের অন্ধকার আকাশ থেকে ভোরের আকাশ সৃষ্টি বা কোনও উজ্জ্বল দৃশ্যের পরে অপেক্ষাকৃত ম্লান বিষন্ন দৃশ্য সৃষ্টির কথা বলা যেতে পারে।

এই ডিমার কন্ট্রোল বোর্ড একদিকে যেমন সহজে বহনযোগ্য তেমনই তুলনামূলকভাবে

এর ব্যয়বাহুল্যও যথেষ্ট কম। এবং এই কারণেই ভারতীয় থিয়েটারে ডিমারের বিপুল জনপ্রিয়তা। স্থায়ী বানিজ্যিক থিয়েটার হলগুলির কাছে ডিমার যেমন জনপ্রিয় ঠিক তেমনই জনপ্রিয় ভ্রাম্যমান নাট্য দলগুলির কাছেও।

থার্ড ডিমার হলো স্বয়ংচালিত বা অটোট্রান্সফর্মার বা ভ্যারিয়াক ইউনিট। এই ব্যবস্থায় এ সি প্রাথমিক ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দ্বিতীয় উৎপাদ বা সেকেণ্ডারি আউটপুট ভোল্টেজ অত্যন্ত সাবলীল এবং মসৃণভাবে পরিবর্তিত হয়ে প্রয়োজনীয় তীব্রতাসম্পন্ন আলো সৃষ্টি করে। গোটা ব্যাপারটায় আলোয় কোনও রকম জার্ক বা আকস্মিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় না। এই ভ্যারিয়াক ইউনিটের মস্ত বড়ো সুবিধা হলো এতে একটি ল্যাম্পের ওয়াট বা শক্তি পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়। যেমন এতে ১৫ ওয়াট থেকে শুরু করে ১০০০ এমন কি ২০০০ ওয়াটের একটি বা একগুচ্ছ ল্যাম্প ক্যানেক্ট করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্লাইডার টাইপ ডিমারে এটা কখনই সম্ভব নয়। ৫০০ ওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ডিমারে ৩০০ অথবা ৭৫০ ওয়াট ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার অসম্ভব। তাছাড়া রেজিস্টেন্স ডিমারের মধ্যবর্তী জায়গায় বা মিডল পজিশনে আলো জ্বালানো যায় না দীর্ঘ সময়। এই ডিমারে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় সেই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বা তিন চতুর্থাংশ তীব্রতায় লাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশ বড় কোনও দৃশ্য বা সিকোয়েন্সের জন্য অনেক সময়েই বিভিন্ন তীব্রতা ও রঙের অজস্র মিশ্রণ সমৃদ্ধ আলোক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় — নাটকই এই ধরণের আলোকসম্পাত দাবি করে। ভ্যারিয়াকে ডিমার চালনার জন্য গোলাকার ডায়াল মোশন দরকার হয় বলেই এর চেহারাটা বেশ বড়সড় আকার নেয় ঠিকই তবে ডিমার কন্ট্রোল র‍্যাকের উপর স্থাপন করে গিয়ার হুইল, ট্র্যাকার-ওয়্যার বা লিভার হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে একে রৈখিকভাবে চালনা করা সম্ভবপর। তখন কন্ট্রোল ডেস্কের মতোই এক সারিতে একে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির কথা আজ কারোরই অজানা নয়। বিভিন্ন কনট্রোলিং মেশিন আজ আশ্চর্যজনক ছোট চেহারা নিয়েছে। লাইট কনট্রোল করার মেশিন তার আকৃতি, আয়তন এবং কমপ্যাকট্‌নেস —সবদিক থেকেই যেন চূড়ান্ত বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ডিমার কনট্রোল সেটের দ্বারাই এখন শুধুমাত্র আঙুলের হালকা ছোঁওয়ায় মঞ্চে জটিল আলোকসম্পাত সম্ভব। আধুনিক প্রেক্ষাগৃহের অন্যান্য সুবন্দোবস্তের পাশাপাশি এই ডিমার কনট্রোল বোর্ডও তাই বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। তবে এই বিষয়টির আগে আমরা আরও দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের বিবরণ এবং সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা সেরে নেব।

আশৈশব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি আলো-ছায়ার বোধ এবং অনুভব অনিবার্যভাবেই আলোর চরিত্রের উপর নির্ভরশীল — যেমন আলোটি কেমন, উজ্জ্বল না ম্লান, স্থির না কি কম্পমান। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা — সমস্ত অবস্থাকেই আরও বেশি বাঙ্ময় করে তোলে বর্ণ বা রঙের প্রয়োগ। বস্তুত আমাদের ভাবনা আমাদের অনুভূতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, আকর্ষনীয় এবং রঙিন হয়ে ওঠে রঙ বা বর্ণের জন্যেই! রঙ আছে বলেই না অনুভব এত বর্ণময়!

মূল সূত্র থেকে উৎসারিত আলো ঝকঝকে উজ্জ্বল। কিন্তু এই উজ্জ্বল আলোয় বর্ণের ছটা আনতে হলে লাইটিং ইউনিটের সামনে যে জিনিসটি লাগাতে হয় তাকে বলে ফিল্টার। আগেকার দিনে অবশ্য বাল্বগুলো রঙিন তরল ল্যাকারে ডুবিয়ে নেওয়া হতো। পরে রঙিন কাঁচের খণ্ড ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এগুলি ভঙ্গুর এবং তাপ সহ্য করতে পারত না। যখন উচ্চ-ক্ষমতা বিশিষ্ট বা হাই-ওয়াটের ল্যান্টার্নের ব্যবহার চালু হলো, তখন তার সামনে জেলেটিন এবং সেলোফেন লাগিয়ে রঙের এফেক্ট আনা শুরু হলো।

এখন অবশ্য উন্নত ধরণের নানা জিনিস বেরিয়ে গেছে। নানা রকম নামে তারা গোটা বিশ্বে পরিচিত যেমন, সিনেমরড, সিলেময়েড, ক্রোময়েড, জেলেটিন, রসকোলেক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরণের পঞ্চাশটি আলাদা আলাদা রঙ পাওয়া যায়।

ভারতে আমরা অবশ্য যে সাধারণ র‍্যাপিং সেলোফেন পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভরশীল। এখানে লাল, নীল, সবুজ এবং হলুদ সেলোফেন খুব সহজেই পাওয়া যায়। খুব অনিয়মিত বা কখনও সখনও গোলাপী, অ্যাম্বার এবং বেগুণী সেলোফেনও পাওয়া যায়। কালার ফিল্টারগুলি সাধারণ লাইট-ফিটিং-এ ইন্টারচেঞ্জ করা যায়। সাধারণত কার্ডবোর্ড বা খুব হালকা ধাতুর ফ্রেমে এগুলি বসানো হয়।

ভারতের বাজারে তার, প্লাগ, সকেট ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামগুলির মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বৈদ্যুতিক কাজ হেলাফেলা করে বা যেমন তেমন জোড়াতালি দিয়ে মারার অভ্যাসটাও নিন্দাযোগ্য। যেমন, যেমন-তেমন মাপের তার ব্যবহার, উপযুক্ত কনেকটর ছাড়া কানেকশন নেওয়া, ইনস্যুলেশন এবং আর্থিং ছাড়া উন্মুক্ত কানেকশন (নেকেড কানেকশন), স্টেজে সঠিক প্লাগ এবং সকেট ব্যবহার না করা - এসব অভ্যাসই আমাদের মধ্যে রয়েছে। অস্থায়ী প্যান্ডেলগুলোতে যেখানে ত্রিপল এবং বহুবিধ সহজদাহ্য সামগ্রী রয়েছে সেখানে লুজ তারের সঙ্গে দেশলাই কাঠি জুড়ে ১৫ এ.এমপি সকেট থেকে কানেকশন নেওয়া হয়।

থিয়েটারের আলোকসজ্জা শুরু হয় সাধারণভাবে প্রেক্ষাগৃহের লাউঞ্জ থেকে — এখানে দরকার পরিপূর্ণ উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা। প্রেক্ষাগৃহের কার-পার্কিং-এর জায়গায় এবং লাউঞ্জে ঢোকার পথের দু-ধারে লাইট পোস্ট দিয়ে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে ইনক্যানডেসেন্ট বা গ্যাস-নিঃসরণকারী লাইটের দ্বারা ফ্লাড লাইটের আয়োজন করাই ভালো। লাউঞ্জের ভিতরে একটু নরম অথচ পরিচ্ছন্ন আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। এখানে সুদৃশ্য ব্রাকেট এবং দীপাধার (ফ্লুরোসেন্ট টিউব বা ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প সহ) লাগানো যেতে পারে। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে সাধারণত এত হালকা নরম অপ্রত্যক্ষ আলো লাগানো হয় যে কখনও সখনও একটা বিষণ্ন ম্লান পরিবেশ সৃষ্টি হয়, এমন কি সেই ম্লান আলোয় অনুষ্ঠানসূচিটি পড়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ফলস সিলিং সারফেসে ফ্লুরোসেন্ট লাইট এবং সাধারণ সিলিং থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ওয়াটের, যেমন ১৫০ বা ২০০ ওয়াটের, ডাউন লাইটের মিশ্রিত ব্যবহার ভালো ফল দেয়। হল অন্ধকার করার পদ্ধতিও এখানে পর্যায়ক্রমে হতে পারে — প্রথমে ফ্লুরোসেন্ট বাতিগুলি নিবিয়ে তারপর আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা যেতে পারে ইনক্যানডেসেন্ট লাইটগুলিকে। পর্দা ওঠার আগে হল অন্ধকার করার কাজটি করতে হবে খুব ধীরে এবং মসৃণগতিতে।

শুধুমাত্র টিউবলাইটের ব্যবহার খুব কাজের হয় না, স্টেজের ইনক্যানডেসেন্ট লাইটের সঙ্গে এটা ধাক্কা খায়, আলোর মসৃণতা বাধা পায়। এমারজেন্সি ইনডিকেটর এবং কম-পাওয়ারের সিট-লাইটগুলো এমনভাবে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তা দর্শকদের চোখের পীড়া হয়ে না দাঁড়ায়।

অডিটোরিয়ামের একদম পিছনদিকটা হলো আদর্শ কনট্রোলিং পজিশন — অর্থাৎ ওখান থেকেই আলো নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। লাইটিং-ডিজাইনার এবং অপারেটর ওখানে একত্রে বসে লাইট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। দর্শকদের সঙ্গে একই অবস্থানে বসে থাকার ফলে দর্শকদের ভিউ-পয়েন্ট থেকেই তাঁরা মঞ্চ দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন আলোকে কী ভাবে ব্যালেন্স করতে হবে। একেবারে পিছনের সারির দর্শকের কাছেও মঞ্চকে কী ভাবে তুলে ধরা সম্ভব এটা তাঁরা নিজেরাই অনুভব এবং উপলব্ধি করতে পারেন। অভিনেতা, পরিচালক এবং স্টেজ-কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত সিগনালিং ব্যবস্থা এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (ইন্টার-কমিউনিকেশন সিস্টেম) প্রেক্ষাগৃহের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম।

অনুবাদ : তন্দ্রা চক্রবর্তী

রঙ: আমাদের চোখে মনে শিল্পে

সেই চেতনা-প্রত্যুষের কালে আদি-মানব অপার বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখেছিল তার চারপাশে সর্বত্র শুধু রঙ আর রঙ। প্রকৃতি সেদিন রঙ দিয়ে তার মন রাঙিয়েছিল। স্পেনের আলতামিরা কিম্বা মধ্যপ্রদেশের ভিমভেটকা বা অন্যত্র গুহার দেয়ালে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী রেখায়-রঙে ধরতে চেয়েছিল তার মনের সেই অধরা মাধুরীকে। প্রাকৃতিক রঙের সাহায্যে ছবি আঁকার এই চল অব্যাহত ছিল ক্রোম্যাগনন আর নিয়ানডারথাল আদিমানব থেকে মধ্যযুগ পেরিয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রায় রেনেসাঁ যুগের শিল্পচর্চা পর্যন্ত। সেবাসতিয়ান সার্লিও (১৪৭৫-১৫৫৪) আর নিকোলা সাবাতিনি (১৬৩৬) প্রথম ব্যবহার করেন মনুষ্য-সৃষ্ট আলো ও রঙ, অন্তত তাঁদের নাট্যকর্মে দৃশ্যরচনার বর্ণনা পড়ে সেকথাই মনে হয়।

নাট্যে রঙের ব্যবহারের আদিপর্ব

এ হলো বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের অনেক আগেকার কথা। সার্লিও তাঁর 'অন আর্টিফিসিয়াল লাইটস অব দ্য সীনস' লেখায় নির্দেশ রেখেছেন কীভাবে একখন্ড এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে গুঁড়ো করে জলে গুলে 'করুণ রঙ' এবং পাতলা কাপড় দিয়ে তা ছেঁকে নিয়ে 'আকাশী নীল' রঙ পাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন হলে ওতেই খানিক জাফরান মেশালে পান্নার মতো হালকা সবুজ বঙ তৈরী হয়। যদি চুনীর মতো রঙ প্রয়োজন হয় তবে লালসুরা ফিটকিরি-জলে মিশিয়ে কিছুটা হালকা করে নিলেই চলে। কীভাবে এই সব উজ্জ্বল রঙ তৈরি করতে হবে, কেমন করে বড়ো বড়ো বাতিদানের সাহায্যে নিথর নিষ্কম্প আলো পাওয়া যেতে পারে, কী করেই বা কৃত্রিম আলো দিয়ে রচনা করা যেতে পারে সূর্যরশ্মির মায়া - যাতে দর্শকদের দৃষ্টিতে মনোরম হয়ে উঠতে পারে দৃশ্য সেই সম্বন্ধে সার্লিও পদ্ধতির পর পদ্ধতি লিখে রেখে গেছেন।

রঙের নান্দনিকতা: ক) অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ষড়ঙ্গ'-তে 'বর্নিক ভঙ্গ' শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে মহাদেব কেমন করে পার্বতীকে রঙের গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন সেকথা উল্লেখ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে (২১শ অধ্যায়, শ্লোক ৬০-৬৫) নির্দেশিত সাদা লাল নীল ও হলুদ এই চাররকম প্রাকৃতিক রঙের কথা উল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। তারপর সংক্ষেপে এই চারটি মৌলিক রঙের গুণ ও শক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করে তিনি জোর দিয়েছেন তুলি ও কাগজের সযত্ন ও দক্ষ ব্যবহারের ওপর। আর শেষে তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন কেমন করে মনের রঙে আঁকতে হয় ছবি - মনের অন্ধকার দিয়ে ঘন করে তুলতে হয় ছবির অন্ধকার, মনের

আলোয় ফুটিয়ে তুলতে হয় ষড়ঋতুর সৌন্দর্যের রকমভেদ। এই হল 'বর্ণিক ভঙ্গ'-এর কলা ও দর্শন। অবনীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শুধুমাত্র বস্তুর বহিরাবয়বের আকৃতি ও রঙ দেখালেই চলবে না, মানস-দৃষ্টিতে কল্পনায় শিল্পী তা হৃদয়ঙ্গম করবেন ধরতে চাইবেন কাজের মধ্যে। তাঁর মতে চোখকে বিশ্বাস নেই, কেননা কারো-কারোর চোখে নীলের মধ্যে সবুজ বা লালের মধ্যে হলুদ ধরা দেয়। তাছাড়া, ছোট্ট একটি পাতা যেমন ঋতু থেকে ঋতুতে ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে তেমনি সুখ বা দুঃখের অবস্থাভেদে চেতনাতেও ঘটে চলে নানা সূক্ষ্ম পরিবর্তন। অবনীন্দ্রনাথের মতে রঙ শুধু ছবিকে রাঙায় না, চিত্রিত ফুলকে বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে সৌরভেও ভরে তোলে। শুধুমাত্র সকালের রৌদ্রোজ্জ্বলতাই নয়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারা দিনমান রোদ্দুরের অনুভব যেমন করে কেবলই বদলে যেতে থাকে রঙে তার সমস্তখানি ধরা পড়া চাই।

খ) নন্দলাল বসু

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলাল বসু নবরসের প্রত্যেকটির আশ্রিত ভাব ও বর্ণ এবং প্রতিটি রঙ ও রসের আশ্রয়-দেবতা নির্দেশ করেছেন এই ভাবে :

শৃঙ্গার	রতি	শ্যাম	বিষ্ণু
হাস্য	হাস্য	সিত	প্রমথ
করুণ	শোক	কপট	যম
রৌদ্র	ক্রোধ	রক্ত	রুদ্র
বীর	উৎসাহ	গৌর	মহেন্দ্র
ভয়ানক	ভয়	কৃষ্ণ	কাল
বীভৎস	ঘৃণা	নীল	মহাকাল
অদ্ভুত	বিস্ময়	পীত	ব্রহ্মা
শান্ত	শান্তি	কুন্দেন্দুভাতি	নারায়ণ বা ভগবান বুদ্ধ

তাঁর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থটিতে নন্দলাল কীকরে তুলি বানাতে ও ব্যবহার করতে হয়, দিশী উপাদান থেকে তৈরি করা যেতে পারে নানা মাত্রার গাঢ় ও হালকা রঙ — ইত্যাদি থেকে শুরু করে ছবি আঁকার প্রকরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন 'শিল্পরত্ন' 'অভিলাষিতার্থ' 'চিন্তামনি' 'জৈন-কল্পদ্রুম' প্রভৃতি প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলির, যেখানে বারবার জোর দেয়া হয়েছে আমাদের চারপাশে নানা বর্ণসম্ভার ও তাদের সূক্ষাতিসূক্ষ তারতম্য থেকে শৈল্পিক-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবার ওপর। সহজলভ্য ঘরোয়া উপাদান বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা বা শেকড় সাদা খড়িমাটি উজ্জ্বল বা ফ্যাকাশে হলুদ কিম্বা লাল বা হালকা সোনালী কিম্বা কালচে বাদামী গেরিমাটি দিয়ে কীকরে নানা রকম রঙ তৈরি করা যায় নন্দলাল তা সবিস্তারে জানিয়েছেন আমাদের। জয়পুর অঞ্চলের সবুজ পাথর কিম্বা নীলা থেকে যে যথাক্রমে সবুজ ও নীল রঙ পাওয়া যেতে পারে একথাও তিনি বলেছেন। তাঁর তালিকায় বহুমূল্য উপাদানের উল্লেখ এই একবারই। আবার,

নেপালে সংরক্ষিত প্রাচীন জৈন পুঁথি থেকে তিনি আহরণ করেছেন হিঙ্গুল রঙ তৈরির পদ্ধতি। চৈনিক শিল্পীরা যে সোনালী রঙকে পাকা করবার জন্য পশুর হাড় শিঙ বা খুর থেকে তৈরি আঠা ব্যবহার করেন তিনি তা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে রাজপুত ও কাংড়া মিনিয়েচার বা জগন্নাথের পট ইত্যাদি কিন্তু জৈবউদ্ভিদজ রঙের সঙ্গে সাদা রঙ মিশিয়েই আঁকা। তারপর সেই রঙকে স্থায়ী করার জন্য ছবিগুলির ওপর বার্নিশ বা ল্যাকারের প্রলেপ দেয়া হতো। আজও তাই করা হয়। শ্রীলঙ্কায় কল্যাণী বৌদ্ধ মঠে আলতা ও নীল রঙে আঁকা ছবিগুলিতেও এই রকম বার্নিশের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে।

শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র করা ফ্রেসকোগুলি নন্দলালের অন্যতম উজ্জ্বল কীর্তি। ফ্রেসকো আঁকার জন্য দেয়ালকে তিনি কীভাবে তৈরি করে নিতেন যাতে ছবির রঙ শীতগ্রীষ্মবর্ষার ধকল সইতে পারে — কিভাবে রঙ শুকিয়ে যাবার পর ফ্রেসকোর ওপর দিয়ে কাঁচের খালি বোতল গড়িয়ে গড়িয়ে রঙের প্রলেপের উচ্চবচতায় আনতেন সমতা এসব কথাও তিনি জানিয়েছেন আমাদের। ফ্রেসকোর ফিনিশিংকে সুষম করার জন্য ডিমের কুসুম ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অন্তিম পর্বে পৌঁছে শিল্পকৃতির জন্য মাটির দেয়ালকে কীভাবে তৈরি করে নিতে হয় সেই আলোচনায় তিনি উল্লেখ কবেছেন বিশ্বভারতী প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের বসবাসের জন্য বানানো মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'র কথা।

নন্দলাল তাঁর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'ওয়াশ' পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন কীভাবে অবনীন্দ্রনাথ কাগজ কিম্বা সুতি বা রেশমী কাপড়ের ওপর প্রথমে পেন্সিল বা চারকোল দিয়ে এঁকে নিয়ে সেটাকে জলে ভিজিয়ে নিতেন। তারপর সেই ভেজা কাগজ বা কাপড়ের ওপরেই জলরঙ চাপাতেন। শুকিয়ে গেলে সেই প্রথম প্রলেপের ওপর চলতো রঙের পরবর্তী সব অবলেপন — একের পর এক, ফুটিয়ে তুলতেন একটা হালকা নরম পশ্চাৎপট। শূন্যতা বা আকাশকে ধরবার জন্য চলতো বারবার 'ওয়াশ' — ছবির কাগজ বা কাপড়ের টুকরোটিকে জলে ভিজিয়ে নেয়া। আর, এইভাবে তৈরি হয়ে যেতো একটির সঙ্গে অন্যটির মিলেমিশে থাকা নানা রঙের ক্ষেত্রগুলি। স্বচ্ছ রঙ যেন রঙীন কাঁচের মতন। একটার ওপর অন্য রঙ চাপালে দ্বিতীয়টির তলায় চাপা পড়ে যায় না প্রথমটি। বরং, দ্বিতীয় রঙটি প্রথমটির ওপর মেলে দেয় একটা হালকা আভা। অবনীন্দ্রনাথ সাধারণত স্বচ্ছ জলরঙের ব্যবহারই পছন্দ করতেন। বেছে নিতেন প্রাশিয়ান নীল নিকেলের মতো রূপোলী হালকা নীল, ক্রোমিয়াম হলুদ হালকা বেগুনি গাঢ় লাল গাঢ় গেরুয়া ইত্যাদি রঙ। অস্বচ্ছ রঙ — যেমন, ভারতীয় লাল হালকা লাল গেরিমাটি-গেরুয়া গাঢ় সবুজ-তাঁর তেমন পছন্দসই ছিল না। যদিও, সম্মুখপটে কোনো বস্তু বা আসবাব কিম্বা ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে এসব রঙ কখনো-সখনো ব্যবহার করেছেন তিনি। ওস্তাদ পিয়ানোবাদকের মতো দক্ষ আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন তিনি কখনো এই-কখনো ওই রীড আর বুনেছেন ঘন-গম্ভীর ও তরল নানামাত্রার সুরেলা ধ্বনির পারম্পর্য। নন্দলাল মুগ্ধশ্রদ্ধায় বুঝিয়েছেন আমাদের তাঁর গুরুর অঙ্কনশৈলী।

গ) রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন তাঁর বয়স যখন সত্তর। গোড়ায় নিজের লেখা কাটাকুটি কবতে করতেই অদ্ভুত রহস্যময় আকার-আকৃতির মাধ্যমে যেন এক স্বপ্নের

জগৎ ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেছিলেন তিনি। তারপর এলো তাঁর চিত্রকলা — বিন্যাসে গড়নে রঙের নির্বাচন ও ব্যবহারে আলো-ছায়া অন্ধকারের নাটকীয়তায় সেসব ছবি বাস্তব থেকে প্রতিরূপময়তা থেকে দূরবর্তী। তাঁর বেশির ভাগ ছবিই জার্মান পেলিকান কালির উজ্জ্বল রঙে আঁকা। তিরিশের দশকের গোড়ায় পশ্চিমে যখন প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর ছবি তখন সকলেই রঙের উজ্জ্বল সম্ভার দেখে চমৎকৃত ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বর্ণবোধ আশ্চর্যরকম সেনসিটিভ। দুটি আলাদা আলাদা ঘন রঙ—যেমন নীল ও কালো—তিনি এমন অনায়াসে পারস্পরিক সংলগ্নতায় রেখেছেন যা প্রায় অভাবনীয়। অথচ, তাঁর সৌন্দর্যচেতনা কখনোই কোনো ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে ভারাক্রান্ত হতে দেয় না তাঁর ছবির দর্শককে।

সৃষ্টির তাগিদে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই তাঁর চিত্রকলায় এমন সব উপাদান ব্যবহার করেছেন সচরাচর যা করা হয় না। রঙীন ফুলের পাপড়ি পাতার রস ছুরি কিম্বা কাঠি বা আঙুলের সাহায্যে গড়েছেন ছবির এক আশ্চর্য অজানা জগৎ। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, 'মেলডি আর হারমনি হলো ছবির রেখা ও রঙের মতন। শুধুমাত্র রেখা দিয়েই আঁকা কোনো একটি ছবিও সুন্দর হতে পারে, রঙের ব্যবহার সেই ছবিকেই আবার করে তুলতে পারে অনির্দিষ্ট ও তাৎপর্যহীন; তবু রেখার সৌষ্ঠবকে আচ্ছন্ন বা নষ্ট করে না-দিলে রঙ আর রেখা দুয়ে মিলে গড়ে উঠতে পারে মহৎ চিত্র।' আইনস্টাইনের মনে হয়েছিল তুলনাটি সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক ছবিতেই নানা উজ্জ্বল রঙের পারস্পরিক সংলগ্নতার সঙ্গে খানিকটা অংশ ফাঁকা রেখে কাগজেব শুভ্রতাকেই কখনো ঘন কালো মেঘের প্রান্তে এক চিলতে রূপোলী রেখা কখনো বা আড়াল থেকে ফুটে ওঠা পশ্চাৎ আলোর মতো নাটকীয়তায় ব্যবহার করেছেন। কাগজের শুভ্রতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন নানাভাবে। রঙ দিয়ে ছবি এঁকে পশ্চাৎ-পটকে সাদা রেখে দিয়েছেন কোথাও। আবার কোথাও প্রায় সমস্ত পরিসরখানিই রঙে আকৃতিতে ভরিয়ে তুলে তার প্রান্তে জিইয়ে রেখেছেন কাগজের সরু একফালি সাদা রঙ। আসলে, রঙের আশ্চর্য স্বপ্নিল প্রয়োগের সঙ্গে অন্বিত হয়ে থেকেও তাঁর ছবিতে মূল ভূমিকা যেন - বুননে দীপ্তিময়তায় আদিম এই আলোরই। রঙ বা আলো দিয়ে তিনি কখনোই পাশ্চাত্য স্বভাববাদী রীতি অনুযায়ী কোনো ত্রিমাত্রিকতা আনতে চেষ্টা করেন নি তাঁর চিত্রকলায়। কিন্তু, পাদপ্রদীপের সাহায্যে যেমন নিচ থেকে উৎসারিত আলোর আভা ছড়িয়ে দেয়া যায় নাট্যমঞ্চে কোনো কোনো ছবিতে আলোকে তিনি প্রায় তেমনই নাটকীয় ভাবে ব্যবহার করেছেন।

ঘ) গগণেন্দ্রনাথ

প্রতিসরিত আলোর মনোমুগ্ধকর খেয়ালিপনা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গগণেন্দ্রনাথ। তাঁর ছবির মূল বিষয়ই হলো আলোর ঝরণাধারায় সিঞ্চিত প্রকৃতি। তাঁর রঙের ব্যবহার প্রায় সদাসার্থক। য়ুরোপীয় জলরঙ বা প্যাস্টেলের পেলবতার সঙ্গে ভারতীয় মিনিয়েচার-চিত্রকলার বর্ণবৈচিত্রময়তাকে মিশিয়েছেন তিনি আশ্চর্য সুষমায়। চিত্রকলার এই দুই জগৎ থেকে বর্ণব্যবহারের রীতি তিনি ধার নিয়েছেন নির্দ্বিধায় আর দুইকে মিলিয়েছেন

অপূর্ব এক দক্ষতায়। পরবর্তী পর্যায়ে গগণেন্দ্রনাথের কাজ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে প্রায়-বিমূর্ত এক ধরণ অবলম্বন করে। তখন তাঁর ছবির বিষয় প্রায়শই স্থাপত্য নির্ভর — রূপকথার প্রাসাদের নীরব-অনধ্যুষিত অভ্যন্তরের রহস্যময়তা কখনো বিভিন্ন বর্ণে কখনো বা শুধুই ধূসর ও কালো রঙের নানা মাত্রায় ফুটিয়ে তোলা। পল-কাটা সমতল ও বক্রতলের সন্নিবেশে গড়ে তোলা ত্রিমাত্রিক কারুকার্য। আর, রহস্যময়তা সঞ্চারিত তাঁর আলোর ব্যবহারে—এক অন্তর্গত আলোর বিভায় এই পরিত্যক্ত প্রাসাদগুলির কোনো কোনো অংশ দীপিত আবার অন্য অংশগুলি লীয়মান। আলোর এই ব্যবহার বাস্তবসম্মত নয়, পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মাত্র। এই স্থাপত্যের ধারণাও বড়ো রহস্যময় — সিঁড়িগুলি যেন কোথাও পৌঁছোয় না কখনো, প্যাঁচালো মোচাকৃতি চূড়া, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে প্রদীপ — প্রেক্ষাপটে কোথাও স্থল কোথাও বা জলাভূমি। স্টেলা ক্রামরিশ গগণেন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের ছবিগুলি প্রসঙ্গে বলেন যে: চতুষ্কোণ ও শঙ্কুর মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আছে একইসঙ্গে প্রাণহীনতা ও গতিময়তা। এখানে চতুষ্কোণগুলি কোনো নির্দিষ্ট আকার গড়ে তোলে না, বরং অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতার বিক্ষোভ ও প্রশান্তি উভয়কেই উদ্ভাসিত করে। য়ুরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করে তিনি পার্থক্য স্পষ্ট করে দেন যে পারসিক স্কুলের ক্ষেত্রে চারিত্রগতভাবে কারুকার্য যখন অনুলম্ব কিম্বা অনুভূমিক, গগণেন্দ্রনাথের কাজে কিন্তু তা প্রধানত তির্যক।

মঞ্চে রঙ

মঞ্চদৃশ্যে রঙের আভাস গড়া হয় আলোর সামনে রঙীন স্বচ্ছ কোনো উপাদান রেখে। গোড়ায় তাপ সইতে পারে এমন কাঁচের টুকরো টুকরো ফালি আলোক-উৎসের সামনে বসিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু, প্রয়োজনমাফিক নানান রঙের কাঁচ তেমন সহজলভ্য নয়। ইদানীং, কিছু আন্তর্জাতিক উৎপানকারী সংস্থা নানারকম ও বিভিন্ন রঙের ফিলটার তৈরি করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হলো 'সিনেমযেড'—সেলুলোজ এ্যাসিটেট দিয়ে তৈবি এই ফিলটার আদ্রতা-নিরোধক ও টেঁকসই। 'রসকোলিন' ও একই গুণসম্পন্ন। কিন্তু, এই দুয়ের কোনোটিই আধুনিক হাই-ওয়াট টাংসটেন হ্যালোজেন ল্যাম্পের পক্ষে তেমন উপযোগী নয়। এই ফিলটারগুলি ব্যবহারের সময় সূক্ষ্ম ছিদ্র করে নিলে আলোর তাপ কিছুটা বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আলোর রঙের কোনো হেরফের ঘটে না। তদুপরি, এদের কার্যকারিতার আয়ু খানিকটা বাড়ে। অতিতীব্র আলোর জন্য 'রসকো' কোম্পানী পলিয়েস্টারে বা পলিকার্বনেট ভিত্তিক একধরণের ফিলটার তৈরি করেছেন — ইংলন্ড ও আমেরিকায় যথাক্রমে 'রসকোলাক্স সুপারজেল' ও 'রসকোলাক্স' বলে যেগুলো পরিচিত। র‍্যাঙ্ক স্ট্র্যান্ড কোম্পনী— যারা 'সিনেময়েড' তৈরি করেন—এখন 'ক্রোময়ড' বানাচ্ছেন এবং বার্কি কোম্পানী মাইলার ভিত্তিক ফিলটার করছেন যার নাম 'জেলাট্রান'। আমেরিকাতে 'ট্রানসোলিন' বলে আরেক ধরনের ফিলটার পাওয়া যায়, এগুলি তাপ ও আর্দ্রতা সইতে পারে বেশি কিন্তু জিলেটিনের তুলনায় এদের বর্ণবৈচিত্র সীমিত। লী ফিলটার্স্ কোম্পানী বিশেষ করে ফিল্ম ও টেলিভিশন স্টুডিওর জন্য বহুরকমের রঙীন ও বর্ণ সংশোধক ফিলটার তৈরি করে। যদিও কালক্রমে কাঁচের বদলে জিলেটিন ফিলটারের ব্যবহারেরই

চল হয়েছে এখন, কিন্তু জিলেটিনের মুশকিল হলো যে কিছুদিন ব্যবহারের পরেই এগুলি বিবর্ণ হয়ে যায়। ফলে, ঘন ঘন ফিলটার বদল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রঙ-শিল্পের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দরুন রঙের গুণগত তারতম্য ঘটছে এখন বড্ডো দ্রুততালে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান ও য়ুরোপীয় ফিলটার-উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি সেই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আমাদের দেশে জিনিসপত্রের মোড়ক হিসেবে 'সেলোফেন' ব্যবহাবের চল আছে। এই সেলোফেন এদেশে যেমন অন্যান্য দেশেও তেমনি রঙীন ফিলটার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত সস্তা এই উপাদানটি সাধারণ লাল নীল সবুজ ও হলুদ রঙে পাওয়া যায়। বম্বের মতো বড় শহরে অবশ্য কখনো-সখনো কমলা, এ্যাম্বার, গোলাপী বা বেগুনি রঙেরও সেলোফেন কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এদের রঙের আয়ু নিতান্তই সীমিত।

আগেকার দিনে বালবের গায়ে রঙীন ল্যাকার লাগানোর একটা প্রচলন ছিল, কিন্তু এই পদ্ধতি শুধুমাত্র খুবই লো-ওয়াটের আলোর ক্ষেত্রেই কার্যকরী এবং তা দিয়ে অতি সামান্য পরিসরকেই আলোকিত করা সম্ভব। দীর্ঘ ব্যবহারে এই রঙ ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে, আবার নতুন করে ল্যাকার লাগানো বালবের আলোই ক্ষীয়মান হয়ে পড়ে। ফলে, থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির অকার্যকারিতা বহুদিনই হলো সর্বজনস্বীকৃত।

রঙ আদতে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এল. ই. ট্রল্যান্ড 'সাইকোফিজিওলজি' বইটিতে একে ব্যাখ্যা করেছেন রেটিনার সক্রিয়তাজনিত এক অনুভূতি বলে। সাদা থেকে কালো পর্যন্ত বর্ণপর্যায়ের বিস্তৃতি (ক্যুয়েল্প ও ক্যোনিগের মতে শুধুমাত্র ধূসর রঙই নাকি ছশো থেকে আটশো রকমের)। বর্ণালীতে যেসব আলো আছে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩৮০ থেকে ৭৬০ ন্যানোমিটার। আমাদের চোখ এই বিশাল বর্ণবৈচিত্র্যের অনেকখানি আলাদা করে চিনে নিতে পারে। থিয়েটার কিম্বা ব্যালে বা নৃত্যানুষ্ঠানের আলোক-পরিকল্পনা যিনি করেন রঙীন আলো বেশভূষা ও মেক-আপের রঙের দৃষ্টিগ্রাহ্য তারতম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সময় এই কথা তাঁকে মাথায় রাখতে হয়। বেশভূষার পরিকল্পনার সময়েও আলোর রঙের কথা খেয়াল রাখা দরকার। সাধারণত, নানা রঙের কস্টিউমের যখন কোনো এক বিশেষ কালকে ধরা হয় তখন হালকা ও স্বচ্ছ রঙের আলো ব্যবহার করাই নিরাপদ। দিনের আলো বোঝাতে যে নীল রঙ বা এ্যাম্বার রঙের আলো ব্যবহার করা হয় রঙীন কস্টিউমের ওপর তার ফলাফলটা খুব বাঞ্ছনীয় হয় না। নীল আলোয় হলুদ পোশাককে ধূসর কিম্বা প্রায় কালো দেখায়। অথচ, পরিকল্পিত রঙের আলো ব্যবহার করলে পোশাকের রঙটি ভালো খোলে। পরিচ্ছদ-পরিকল্পনাকারীকে তাই রঙীন আলো সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নিতে হয়। মেক-আপ নিয়ে মাথাব্যথা মূলত অভিনেতারই। তবু তাকেও বুঝতে হয় যে মঞ্চের ওপর আলো বিশেষ করে রঙীন আলো তার চেহারাকে কীভাবে প্রভাবিত করে। অভিনেতার গায়ের রঙের চাইতে একটু বেশি লালিমা মেক-আপের ফাউন্ডেশনে আনতেই হয়। তাই বলে খুব চড়া ফাউন্ডেশনের কোনো দরকার পড়ে না, হালকা প্যাস্টেল রঙই মঞ্চের পক্ষে শ্রেয়। মঞ্চের ওপর অভিনেতার চেহারা যে কখন কেমন বদলে যায় — বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের আলো ভিন্ন ভিন্ন কোন থেকে ফেলে সামান্য আয়াসেই তার একটা ধারণা করে নেয়া যায়।

আলোর পরিকল্পনা যিনি করেন দৃশ্যপট হলো তার বিবেচনায় এমনই এক তল যা আলোকে প্রতিফলিত করে। মঞ্চ-পরিকল্পনাকারীর সঙ্গে তার মতপার্থক্য এখানেই। কারণ, শেষোক্ত জন মনে করেন আলোর কাজ হলো দৃশ্যপটকেও আলোকিত করা। কিন্তু, আর্দশত — অভিনয়ের ক্ষেত্রটিকে আলোকিত করার সময় সীনারিকে (পশ্চাৎপট, সাইক্লোরামা ইত্যাদি, ত্রিমাত্রিক সেটস নয়) আলোর পরিধির বাইরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, প্রতিফলিত এবং উপচানো আলোয় নাট্যপরিবেশ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই কস্টিউম এবং মেক আপের ক্ষেত্রে যেমন সেটস বা সীনারির ক্ষেত্রেও তেমনি আলোর রঙের বিভিন্নতার প্রশ্নটি খেয়াল রাখা উচিত। পর্দা বা ঝালর ইত্যাদির বেলায় একটু ভেবেচিন্তে সিলক সাটিন ও রেয়ন বা ভেলভেট ব্যবহার করে বিভিন্ন তল ও কোন থেকে রঙীন আলো ফেলে দৃশ্যসজ্জায় নতুন মাত্রা সংযোজন করা যায়। মঞ্চ-পরিকল্পনাকারীকে পিগমেন্ট এবং আলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতেই হবে। নাট্যে আলোর রঙের পরিবর্তনে একেকটি দৃশ্যের বিশিষ্টতা ও পরিবেশের বদলকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সম্পন্ন বা আবেগ সমৃদ্ধ নাট্যপরিস্থিতিকে মর্মভেদী ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে রঙীন আলো আধুনিক আলোক উৎস ও ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্ভাবনা অসীম।

রঙ : দৃষ্টির-অতীত অনুভব

রঙ-সরাসরি এবং আলোরূপেও সদাসর্বদা আমাদের চেতনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এমনকি জন্মান্ধ যে তারও, নিতান্ত আবছা ? হলেও, রঙ সম্বন্ধে একরকম একটা ধাবণা নাকি থাকে। জর্মানীর এ্যাকাডেমি অব কালার সায়েন্সের সভাপতি ফটো-বাওলজিস্ট অধ্যাপক এইচ. ওহ্ল্‌ফারথ মনে করেন যে আমাদের শরীরের ওপরেও রঙের প্রভাব কার্যকর। সাতটি চক্ষুষ্মান ও দু'টি দৃষ্টিহীন শিশুকে নিয়ে নিরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছেন যে রক্তচাপ ও নাড়ীর স্পন্দনের ওপর আলোর প্রভাব উভয় ক্ষেত্রেই হুবহু এক। তাঁর মতে, আলো এবং রঙ আমাদের মস্তিষ্কের এক বা একাধিক নিওরোট্রানসমিটারকে প্রতিক্রিয়ান্বিত করে। রাশিয়া ও চীনদেশের সাম্প্রতিক গবেষণায় দাবি উঠেছে যে আলো আমাদের শরীরের অপরাপর অংশেও প্রতিক্রিয়াশীল। এমনও বলা হচ্ছে যে, চোখ ছাড়াও শরীরেব অন্য কোনো কোনো অংশের সাহায্যে নাকি আলো 'দেখা' যায়। আমেরিকার ইনস্টিটিউট অব বাওসোশ্যাল রিসার্চের অধিকর্তা আলেক্সান্দার স্কাউস-এর মতে রঙের তড়িৎচৌম্বকতেজ পিটুইটারি ও পিনীয়ল গ্ল্যান্ড এবং হাইপথালমাস প্রভৃতিকে—মানুষের শারীর-ব্যবস্থায় যাদের গুরুত্ব অসীম— প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী-যা আমরা চোখে দেখতে পাই না, যার মধ্যে রয়েছে এক্স্‌-রে, আলট্রা-ভাওলেট-রে ও বিভিন্ন অনুতরঙ্গাবলী—অতিনিশ্চিতভাবেই আমাদের শরীরে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে। তাহলে, চোখে দেখতে পাই যে-রঙগুলি তারাও যে নানাভাবে মানবশরীরের ক্ষেত্রে প্রভাব সঞ্চার করে চলেছে - একথাটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে কী করে। ফেবার বারেন তাঁর নানা লেখায় রঙ ও মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া, বিশেষত ম্যানিক ডিপ্রেশন বা স্কিৎসোফ্রেনিয়া ও অন্যান্য মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে রঙের ভূমিকা, ইত্যাদি প্রসঙ্গে

বিশদ আলোচনা করেছেন। কলকারখানার ভিতরে বা বাইরে রঙের ব্যবহার সম্বন্ধেও তিনি যা বলেছিলেন আজ তো তা সর্বজনমান্য চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি উদ্ভাবিত হবার পর থেকে 'অরা' বা দেহজ্যোতি সম্বন্ধীয় চর্চার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটতে শুরু করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে.কে. চৌধুরী রঙীন ফটোগ্রাফ এবং হাই-ভোলটেজ হাইফ্রিকোয়েন্সী কিরলিয়ান নিরীক্ষা বা 'ফ্যানটম লীফ' একসপেরিমেন্ট' বা ভৌতিক-পর্ণ নিরীক্ষার মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন। লন্ডনের সেন্ট থমাস হসপিটালের মেডিক্যাল ইলেকট্রিসিয়ান ডঃ জে. কিলনার তাঁর 'দ্য হিউমান অরা' শীর্ষক বইটিতে এই 'অরা' বা দেহজ্যোতিকে আলট্রাভায়োলেট প্রতিক্রিয়া-জনিত বলে নির্দেশ করেছেন।

রঙ কোথায়

এই ভৌত জগৎ কিন্তু আদতে বর্ণহীন। পদার্থ ও তেজ — ম্যাটার ও এনার্জি দুয়েরই কোনো রঙ নেই। দর্শনেন্দ্রিয় সম্পন্ন প্রাণী কোনো না কোনো তেজোময় রশ্মির সাহায্যে পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করে, নিজের অবস্থান ও পরিবেশ বুঝে নেয, চলাফেরা করে। দৃষ্টিশক্তির সাহায্যেই আমবা বস্তুর আকার-আকৃতি ও এক থেকে অপরের দূরত্ব ইত্যাদি দেখতে পাই। উনুনের কয়লাকে আগুনের তাপে লাল হয়ে উঠতে দেখি, দেখি পাকা ফল গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। এখানে রঙ কিন্তু ওজনের মতোই বস্তুর একটি গঠন-বৈশিষ্ট্য নয়- দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি বার্তা মাত্র। মস্তিষ্কের বর্ণানুভূতির সাড়া-জাগানো ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন রঙ দেখতে পাই আমরা। কোনো বস্তুকে দেখা ও তার রঙের বোধটি মস্তিষ্কের মধ্যে গড়ে তোলা— দুটি প্রক্রিয়াই একসঙ্গে ঘটতে থাকে। কোন বস্তুকে কোন রঙ বলে মনে হবে তা নির্ভর করে বস্তুটির মলিকিউলার বিন্যাসেব ওপর। এই বিন্যাসের ভিন্নতা অনুযায়ী আপতিত আলোর খানিকটা বস্তুর মধ্যে নিঃশেষিত হয় ও পুনঃপ্রেরিত বাকিটুকু এসে পৌঁছায় আমাদের চোখে। আলোর এই অশোষিত ও পুনঃপ্রেরিত অবশিষ্টাংশই আমাদের মস্তিষ্কে বর্ণানুভূতির সাড়া জাগায়। এই অন্তর্সম্পর্কগুলিব অর্থ হলো বস্তুর রঙ কখনোই সদা-নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় নয়, কাবণ মস্তিষ্কেব বর্ণবোধের বর্ণবিন্যাস সবসময়ই ওই পুনঃপ্রেরিত আলোর বর্ণালী গড়ন বা স্পেকট্রামের ওপর নির্ভরশীল। আলোক-রশ্মি বার্তা-প্রেরক মাত্র। কম্পিউটারের পান্‌চ-করা টেপটাই যেমন আসল বার্তা নয়, আলো বা বর্ন-উদ্দীপকও তেমনই আদতে সংকেতকে বার্তায় রূপ দেবার একটি উপায় মাত্র। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় যখন মস্তিষ্কের দৃষ্টিক্ষেত্রে রঙের অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে তখনই আমাদেব চোখে রঙ লাগে — আমরা রঙ দেখতে পাই।

অনুবাদ : সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোর তাপস

১৯৫৪। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বহুরূপীর 'রক্তকরবী'। খুব যে একটা প্রত্যাশা নিয়ে দেখতে গেছি তা হয়ত নয়। বহুরূপীর নাম তখন কিছু ছড়িয়েছে। একটু অন্য ধরনের নাটক করেন শম্ভু মিত্র তা শুনেছি। কলেজে পড়ি। পুববাংলার ছেলে, কলকাতায় এসে থই পাই না। আমাদের সিলেবাসে ছিল 'মুক্তধারা'। অধ্যাপক পড়াতে গিয়ে মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের নাটকগুলি বৈঠকি নাটক, ক্লোসেট ড্রামা। এগুলো নাকি শুধু পাঠের উপযোগী, অভিনয়যোগ্যতা এদের মধ্যে নেই। মন সংশয়ে ভোগে। বিস্ময়ে ভাবি, 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' পড়তে এত ভাল লাগে, আপ্লুত করে তোলে সত্তাকে অথচ মঞ্চে উপস্থাপিত করা অসম্ভব! নিরন্তর জিজ্ঞাসা মনকে তাড়িত করে কিসের উপর নির্ভর করে কোন নাটকের অভিনয়যোগ্যতা? একটি নাট্যপ্রযোজনা সফল হয়ে ওঠে কিসের ভিত্তিতে?

ছেলেবেলা থেকেই নাট্যপ্রীতি পোষণ করে আসছি। ঢাকা শহরে দেখেছি পাড়ার বা অফিসক্লাবের প্রযোজনা—'পোষ্যপুত্র', 'কর্ণার্জুন', 'জোর বরাত', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটক বা প্রহসন। তখন বুঝতাম না, এখন জানি কালকাতা মঞ্চে হইচই ফেলে দেওয়া নাটকের আলোড়ন খানিক চুঁইয়ে গিয়ে পড়ত মফস্বলে। তারই প্রভাবে পালাপরবে ঢাকার কিছু উৎসাহী যুবক অবরেসবরে অভিনয় করেতন এসব নাটক। দেখে মুগ্ধ হতাম। অক্ষম অনুকরণে সংলাপ আউড়ে কাটত হয়তো কয়েকটা দিন। বিশেষ করে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'টিপু সুলতান' প্রচণ্ড প্রিয় ছিল রেকর্ডের কল্যাণে। এ দুটো নাটকের বহু সংলাপ মুখস্থ আছে এখনো। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কণ্ঠস্বর। বাণীবিনোদ। তাই কলকাতায় এসে প্রথম সুযোগেই রঙমহলে দেখলাম 'সিরাজদ্দৌলা'। নির্মলেন্দু সিরাজের ভূমিকায়। ঢাকার নাট্যস্মৃতি ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেল এ অভিজ্ঞতায়। ভাবলাম নাট্যপ্রযোজনা এর চাইতে বেশি আর কীই বা হতে পারে! মন ভরে গেল প্রাপ্তির সফলতায়।

তাই যখন নিউ এম্পায়ারে দেখতে গেলাম 'রক্তকরবী' ১৯৫৪-র কোনো এক সকালে প্রত্যাশা তেমন বেশি ছিল না কিছু। কেননা অধ্যাপকের কল্যাণে তখন ত ভেবে বসে আছি এধরনের নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত হওয়া অসম্ভব। তখনো জানতাম না 'ডাকঘর' রবীন্দ্র-প্রযোজনায় কলকাতার রসিক দর্শকদের অভিভূত করেছিল তারও প্রায় চার দশক আগে।

শুরু হল 'রক্তকরবী'। ভোরের ভরন্ত আলোয় মালা গাঁথছে নন্দিনী। বিস্মিত হতেও ভুলে গেলাম। মঞ্চের উপর বয়ে যেতে লাগল কালপ্রবাহ। অভাবনীয় মঞ্চসজ্জা, সঞ্চরমান আবহ, গতিময় গান, একক ও সমবেত অভিনয়ের অনবদ্য অর্কেস্ট্রা। আর আলো। 'কোন আলো লাগল চোখে!' প্রথম পরিচয় ঘটল তাপস সেনের নাম ও কাজের সঙ্গে। সৌভাগ্য আমার, বাংলার নতুন নাট্যধারার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল 'রক্তকরবী' দিয়ে।

'রক্তকরবী' নিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দরকার এখানে নেই। আমার আলোচনা আলো নিয়ে। প্রথম দেখায় আলোর অভিভব বিমূঢ় করেছিল সেই দৃশ্যটিতে যেখানে নন্দিনী মঞ্চে আসে 'সিঁদুর মেঘে রাঙা হয়ে' সংলাপটির উচ্চারণ নিয়ে। সাইক্লোরামায় গভীর রাঙা মেঘে কালোর ছোপ, বিষণ্ন অপরাহ্ন, ডাউন স্টেজ প্রায় অন্ধকার, নন্দিনীর উৎকণ্ঠ সঞ্চরণে বিহ্বল আমরাও। তার উদ্বেগ প্রলয়ের সম্ভাবনায় সঞ্চালিত আমাদের মধ্যেও। মনে হয়েছিল নন্দিনীর আবেগতাড়িত সংলাপ আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে আছড়ে পড়ছে আমাদের সমগ্র চেতনায়। কিংবা সেই দৃশ্য যেখানে বেরিয়ে আসছে 'রাজার এঁটো'রা। আলোয় লালচে ছোপ, সঙ্গে উদ্বিগ্ন আবহ, নন্দিনীর আর্ত হাহাকার—সব মিলিয়ে যেন মূর্ত হয়েছিল অপ্রত্যাশিত অথচ কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ। তখনো বুঝি নি প্রযোজনায় আলোর কাজ চেতনাকে শুধু বিহ্বল করাই নয়, তাকে জাগিয়ে তোলাও।

এ বোধ এসেছিল পরের বার 'রক্তক.বী' দেখতে গিয়ে। প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা তখন খানিক থিতিয়ে এসেছে। তবুও বিস্ময় এবার অন্য। নন্দিনী চাইছে যক্ষপুরীর অন্ধকার ডালা খুলে আলো টেনে দিতে, তৃপ্তি মিত্রের আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে ফুটে উঠল অন্তরঙ্গ আলো। অথবা সেই দৃশ্য যেখানে বিশু-নন্দিনীর প্রায় স্বগত সংলাপ, 'দুখ জাগানিয়া' গানের নিভৃত পরিবেশ, শোভেন মজুমদারের সামান্য ভাঙা স্বরে 'অল্প কিছু দেয়ার দানে আমার গান বিক্রি করতে পারব না পাগলী', সেই সর্বব্যাপী নির্জনতায় দুজনের অবয়বে এসে পড়ত তারের জালের ভেতর থেকে পিছলে পড়া চৌকো আলো, নাটকটি যেন সেই মুহূর্তে পেয়ে যেত নিগূঢ় অর্থময়তা। প্রযোজনাটি সমগ্রতার মধ্যেও আলাদা করে ভাবাতে বাধ্য করেছে কোন কৌশলে তাপস সেন রচনা করছেন আলোর শিল্প অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য কবিতা! বহুরূপী না জানি কত খরচ করেছে আলোকসম্পাতের জন্য।

২

এখন আর ও তথ্য অজানা নয় তাপস সেন এসব শিল্পনির্মাণে হাতে পেয়েছিলেন সামান্যতম উপকরণ এবং সে উপকরণগুলোও বেশির ভাগ সময়ে নিজেদের মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি একবার বলেছিলেন তাঁর কাছে রঙতুলি থাকবে না তিনি হাত দিয়ে আঁকবেন, হাত না থাকলে অন্য যে কোনো উপায়ে প্রবহমান থাকবে তাঁর শিল্পসাধনা। একথার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন শিল্পীর কাছে উপকরণই প্রধান নয়, প্রকাশের সর্বব্যাপী আগ্রহ তাঁর শিল্পীসত্তাকে জাগিয়ে রাখে। তাপস সেনও তাই আলোর শিল্পী।

তাপস সেনের প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে আগে একটু আলোচনা সেরে নেওয়া যাক বাংলা মঞ্চে আলো প্রয়োগের বিবর্তন ধারাটি নিয়ে। আমরা জানি কলকাতায় যখন সাহেবরা থিয়েটার খোলেন আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তখন গোড়ায় ব্যবহৃত হত মোমের আলো। গ্যাসের বাতি এল আরো পরে। গ্যাসের আলো বাড়িয়ে-কমিয়ে মেটানো হত মঞ্চে আলোকসম্পাতের অভীপ্সা। বাঙালিদের থিয়েটারেও দীর্ঘকাল প্রযুক্ত হত এ কৌশল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাললাল শীল ডায়নামো বসিয়ে নাট্যশালাকে প্রথম বিদ্যুতে আলোকিত করে তোলেন। সম্ভবত জ্বালানো ও নেভানো ছাড়া প্রযোজনায়

আলোর বিশেষ ভূমিকা ছিল না। অবশ্য নাটকও তখন 'মঞ্চস্থ' হত, 'প্রযোজিত' হত না।

অনুমান করা হয় বিশ শতকের গোড়ার দশকের শেষ দিকে কোনো সময়ে কলকাতার মঞ্চে ব্যবহৃত হতে থাকে পুরোপুরি বৈদ্যুতিক আলো। তবে তা ফুটলাইট, স্পটলাইট ও ফ্লাড লাইটের সীমা বোধ হয় ছাড়াতে পারে নি। তার শিল্পসম্মত প্রয়োগ যে খুব একটা হত তা হয়ত নয়। শিশিরকুমাব বিশের দশকে এসে ফুটলাইটের ব্যবহার তুলে দিলে তাকেই প্রচণ্ড আধুনিক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন সেকালের নাট্যরসিকরা। অভিনেতার বিহ্বলতা ও সচেতনতার প্রশ্নে শিশিরকুমারের সেই ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি 'রাম' হিশেবে পিতৃহৃদয়ের প্রবল আলোড়নের মধ্যেও তিনি লবকুশকে এক পাশে রেখে কী ভাবে নিজের মুখকে এগিয়ে দেন স্পটলাইটটিকে ধরার জন্য। অহীন্দ্র চৌধুরীর 'ফোকাস' ত থিয়েটারমহলে মধুর পরিহাস বলেই পাবচিত। ১৯৫০-এ যখন 'সিরাজদ্দৌলা' দেখেছিলাম এখনো মনে আছে মূলত ফ্লাড ও স্পটলাইটের ব্যবহারকে। মৃত্যু দৃশ্যে সংলাপ 'সুখে থাক ভাইসব, বাংলার এ হতভাগ্য নবাবের বক্ষরক্তে তোমাদের সব অশান্তি ধুয়ে মুছে যাক' —নির্মলেন্দু লাহিড়ী বুকে হাত চেপে কাল্পনিক ক্ষতস্থান ঢেকে হাঁটু গেড়ে থেমে থেমে কথাগুলো বলছেন, মুখ উইংসেব দিকে সামান্য ঘোরানো, স্পটলাইট এসে পড়েছে তার উপর, আপ্লুত আমরা সে দৃশ' দেখছি, অভিনয় আলো মঞ্চ ও রূপসজ্জা মিলে মনে হচ্ছে থিয়েটার আর এর চাইতে বেশি কী দিতে পারে! শিশিরকুমারের যেসব প্রযোজনা দেখেছি পঞ্চাশের দশকে তাদের আলোব কাজ তেমন অর্থবহ বলে অন্তত তখন ভাবি নি। ডিমারের ব্যবহার সাধাবণ নাট্যশালায় তখন কতটা ছিল এবং তার এফেক্ট কেমন হত জানা নেই। তবে এসব আলোকসম্পাতে পবিচালকদের যে, কোনো ভূমিকা থাকতো না সেকথা জানতে পারি দেবনাবাযণ গুপ্তের জবানী থেকে। তাঁব পরিচালনায় কিছু নাটকে আলোর কাজ কবে দিয়েছিলেন মণীন্দ্র দাস ওরফে নানুবাবু। নানুবাবু নাকি কাজ শিখেছিলেন কলকাতার পার্শি থিযেটাবে দীন শা ইবানির নাছে। দেবনারাযণ গুপ্তের বিবরণ থেকে জানতে পারি এসব আলোর কাজ তেমন বিজ্ঞানসম্মত হত না। শিল্পসম্মতও হত কি? ত্রিশ-চল্লিশের দশকে এসেও প্রযোজনায় আলোর কাজটি নিষ্পন্ন করা হত নাট্য পরিচালকের অজ্ঞাতসারে· আলোর ভার থাকত যাঁর উপর তিনি নাকি মহলা চলার সময় খানিক জেনারেল লাইটিং করে দিতেন। তারপর নাটক মঞ্চস্থ হবার দিন-দুয়েক আগে অতি সংগোপনে কিছু ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে আলো প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা করে রাখতেন। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাকি বহুবার নানুবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন পরিচালক হিশেবে সেখানে হাজির থাকার বাসনা এবং পেয়েছিলেন প্রত্যাখ্যান। অর্থাৎ পরিচালক জানতে পারছেন না তাঁর পরিকল্পনা মঞ্চে অনূদিত হতে চলেছে কীভাবে! পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ এ ব্যাপারে থাকছেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

১৯৭১-এ সতু সেন আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন কলকাতায় নাট্য প্রযোজনার নানা কলাকৌশল শিখে। এ শহরে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁরই। নাট্য পরিচালনা শিল্পনির্দেশনা আলোকসম্পাতের দায়িত্বে তিনি জড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘকাল। শিশিরকুমারের নির্দেশনায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' মঞ্চস্থ হয় সে বছরের আগস্ট মাসে। এ প্রযোজনার

শিল্পনির্দেশক ছিলেন সতু সেন। তারপর বেশ কিছু নাটকের সঙ্গে পরিচালক শিল্পনির্দেশক অথবা/এবং আলোক শিল্পী হিশেবে তাঁর সংলগ্নতা কলকাতার দর্শকদের প্লুত করেছে প্রায় তিন দশক ধরে। কিন্তু তিনিও, দেবদারায়ণ গুপ্তের ভাষ্য অনুযায়ী, 'পূর্বসূরীদের মত আলোর কাজটি সম্পন্ন করতেন।' সতু সেনই নাকি প্রথম সঠিকভাবে স্পটলাইটের ব্যবহার করেছিলেন। মঞ্চের দুধারে দুটি আর্কল্যাম্প রাখতেন তিনি, তাতে থাকত নানা রঙের জিলেটিন কাগজ সাঁটা একটি চক্র এবং সেটি ঘুরিয়ে বিভিন্ন রঙের আলো প্রক্ষেপণ করা হত মঞ্চে। সখীদের নাচের সময় এ ধরনের আলো খুব তারিফ পেত দর্শকের কাছে। ডিমারের প্রচলন হয় নি তখনো। দুটি পোর্সিলেনের নলের মধ্যে সাজিমাটি, সোডা ও সাবান পোরা হত। নলটিতে পজিটিভ ও নেগেটিভ তার ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলে মঞ্চ ক্রমে অন্ধকার হয়ে যেত। আবার তার দুটো তুলে নিলেই আলোকিত হত মঞ্চ। আলো আঁধারির দরকার হলে নলের মাঝামাঝি জায়গায় সাবধানে ধরে রাখা হত তার দুটো।

এ বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তত এ তথ্যটি পেয়ে যাই যে, সতু সেন বিদেশ থেকে থিয়েটারের নানান বিষয় শিখে এলেও এখানে তার প্রয়োগে তেমন সফল হন নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে 'কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা' দেখেছিলাম মিনার্ভা থিয়েটারে, খুব আকর্ষক মনে হয় নি প্রযোজনাটিকে। তবে একটি মাত্র প্রযোজনা তাও জীবনে প্রায় সায়াহ্নবেলায় দেখা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। এটুকু শুধু বলা যায়, বিদেশের মঞ্চবিজ্ঞান দিয়ে পাবলিক থিয়েটারের অচলায়তনে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেন নি সতু সেন। তবু একথাও ঠিক যে বাংলা মঞ্চে সতু সেনের আবির্ভাব নাট্যপ্রযোজনায় আলোকশিল্পীকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করেছিল। তাই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকে 'আলোকশিল্পী' বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল চারজনের নাম। তাঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষকুমার গাঙ্গুলি, শঙ্করকুমার ভট্টাচার্য ও দুলালচন্দ্র দাশ। ১৯৩৯-এ নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকেরও 'আলোকশিল্পী' ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও কালি মিস্ত্রী। ১৯৪০-এ নাট্যনিকেতনের 'পরিণীতা' প্রযোজনার 'আলোকসম্পাত' করেছিলেন উপেন দত্ত, গণেশচন্দ্র বসু ও যোগেশচন্দ্র দত্ত। এ ধরণের উদাহরণ হয়ত দেওয়া যায় আরো, তবে তার আর দরকার নেই।

৩

সতু সেন যখন বাংলা মঞ্চের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছেন ত্রিশের দশকে এবং 'আলোকবিজ্ঞানকে' কাজে লাগাতে চেষ্টা করছেন নিজের মত করে, প্রফুল্ল ঘোষ, শঙ্কর ভট্টাচার্য বা উপেন দত্ত প্রভৃতির পরিচিতি ঘটছে 'আলোকশিল্পী' হিশেবে, তাপস সেন দিল্লিতে তখন প্রায় একক ভাবনায় বুঝে নিতে চাইছেন আলোর রহস্য, মঞ্চে তার প্রয়োগের বিবিধ কৌশল। তাপস সেন তখন কিশোর এবং একথা সকলেরই জানা দিল্লিতে নাট্য প্রযোজনা বিষয়টি, তাও আবার বাংলা, ছিল দুষ্প্রাপ্য। তবু জিজ্ঞাসু কিশোরটি তাঁর শিক্ষক প্রতাপ সেনের সমর্থনে এগোলেন আলোর পথে। অবশ্য নিজের ভেতরকার তাগিদেই তাপস বেছে নিয়েছিলেন এ পথ। তাই কিছুদিন পর নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বড়ছেলে তরুণ তাপস

নিশ্চিন্ত চাকরির নিশ্চয়তা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন বোম্বাই, থিয়েটার বা সিনেমায় আলোর কাজ শিখবেন বলে। পৃথ্বি থিয়েটারে তিনি সুযোগ পেলেন না, সিনেমাতেও সুবিধে হল না। তাই স্বাধীনাতর পর ১৯৪৮ নাগাদ তিনি পৌঁছালেন কলকাতায়।

এবং কলকাতায় তাঁর আগমন ঘটেছিল সঠিক সময়ে। কেননা কলকাতায় তখন বাংলা থিয়েটারে নতুন জোয়ার। মাত্র বছর চারেক আগে ঘটে গেছে 'নাবান্ন'-র মত ব্যাপার। গণনাট্য সংঘ তারপর খানিক ঝিমিয়ে পড়লেও প্রবলভাবে আবির্ভূত হয়েছে 'বহুরূপী', 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' প্রভৃতি সংস্থা। তাপস সেন জড়িয়ে পড়লেন বিবিধ নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে। অর্থাৎ পরিবেশটি তৈরি ছিল, শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা। উত্তরকালের সৌভাগ্য তাপস সেন কলিকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন যোগ্যতম সময়ে। কলকাতায় তাঁর প্রথম কাজ ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় 'জ্বালা' নাটকে। শুনেছি এ নাটকে নাকি আলোর কাজ দিয়েছিল কিছু 'অপার্থিব' মুহূর্ত। তারপর 'নীলদর্পণ', 'সাংবাদিক' এবং বিভিন্ন দলের আরো কয়েকটি প্রযোজনা। তারপর 'রক্তকরবী'। এ নাটক দিয়েই তাপস সেনের কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু।

'রক্তরকবী'-তে নন্দিনী বিশুর অবয়বে যে আলোছায়ার খেলা তাপস সেন তার নাম দিয়েছিলেন 'ইকড়ি বিকড়ি'। যাঁরা যুক্ত থাকতেন সেকালে সাক্ষী ছিলেন তাপস সেনের উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার, তাঁদের কেউ কেউ এ বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন অনবদ্য। যেমন খালেদ চৌধুরী লিখছেন ডালডার টিনের সাহায্যেও তাপস সেন তৈরি করতেন অপরূপ মঞ্চমায়া। খালেদ চৌধুরীর ভাষায়, "ঘরোয়াভাবে তিনি তাকে বলতেন, 'দুধের বালতি'। তিনি যখন স্টেজে রিহার্সালে গিয়ে আলোর নির্দেশ দিতেন তখন কয়েকটি শব্দ শোনা যেত। 'ইকড়ি বিকড়ি' সরাও, 'দুধের বালতি' ওলটাও, 'বেবী' কাটো ইত্যাদি।" তারপর কৌতুক মন্তব্য করেছেন খালেদ চৌধুরী, "আচমকা যদি কোন বাইরের ব্যক্তি গিয়ে উপস্থিত হতেন তাহলে 'দুধের বালতি' ওলটানোর সঙ্গে 'বেবী কাটা'র সম্পর্কে শুনে চমকে উঠতেন।'

তাপস সেন এইরকমই। অতি সামান্য উপকরণ দিয়ে তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন মহাকাব্য। আলোকবিজ্ঞানকে তাই তিনি নিয়ে এসেছেন শিল্পের স্তরে। বাংলা থিয়েটারে প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী তাপস সেনই।

'অঙ্গার' যখন মঞ্চস্থ হয় উৎপল দত্তের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৫৯-এ, তার শেষ দৃশ্যে খনিগর্ভে জলের ক্রমসঞ্চার দর্শকদের স্তম্ভিত করেছিল। ভূগর্ভে খাদের মধ্যে আটকে পড়ে আছে কিছু কয়লা কাটার শ্রমিক, বিস্ফোরণ ঘটে গেছে খানিক আগে, তারা জানে না আদৌ বাইরের আলো আবার দেখতে পাবে কিনা, প্রাণ বাঁচানোর প্রাণান্তিক প্রয়াস, ঠিক তখনই সেই শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতিতে এক ফোঁটা জলের শব্দ দর্শকদের চেতনায় প্রবলভাবে আছড়ে পড়ত। তারপর সেই টান টান উত্তেজনায় খাদ ভরে উঠেছে জলে, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ যেন সেই খাদটি, তখন আলোর প্রক্ষেপ বাস্তবের চরম বিভ্রমকেও হার মানিয়েছিল। যাঁরা সেই বিরল আভিজ্ঞতার সাক্ষী তাঁদের মনে হয়েছিল এ ধরনের আলোকসম্পাতের জন্য দরকার প্রচুর টাকা। কেননা বিশাল যান্ত্রিক পরিকাঠামো না থাকলে এ ধরনের পরিকল্পনা সার্থক ও নান্দনিক করে তোলা অসম্ভব। অথচ এ অসম্ভবকেও সম্ভব করেছিল তাপস সেনের সৃষ্টিশীলতা। উত্তরকালে আমরা জেনেছি যখন এ জলের

দৃশ্য দেখানোর সিদ্ধান্ত হল, পরিচালক স্বয়ং সন্দেহসম্পন্ন, দলে অর্থের দারুণ অভাব, তাপস সেন হাল ছাড়েন নি। চিন্তিত উদভ্রান্ত চিত্তে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মিনার্ভা থিয়েটারের ভেতরে ইতস্তত। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছিল, 'এক্জিট' লেখা ভাঙা টিনের বাক্স ও অনুরূপ কিছু উপকরণ যেগুলো চলে গিয়েছিল বাতিলের ভাঁড়ারে। সেগুলি সংগ্রহ করে তাদের সাহায্যে তিনি নির্মাণ করে নিয়েছিলেন নিজস্ব অস্ত্র এবং তার সুনিপুণ প্রয়োগে প্রযোজনাকে তুলেছিলেন সক্ষম। বিদেশীরাও অনেকে তাঁর উপরকরণের 'সামান্যতা' দেখে বাক্হীন হয়ে পড়তেন। এ বিষয়ে 'অঙ্গার' নাটকের পরিচালনায় উৎপল দত্তের দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃতি করছি, '.....জলের উপর যে আলোটা ফেলত সেটা ছিল সচল। এক কথায় বলতে পারি—"সচল কাট আউট"-এর অন্য কোন পরিভাষা আমার জানা নেই। কেন না এটা এখানে ত নয়ই, বিশ্বনাট্যশালায় কখনো হয়নি। এভাবে একটা লাইটিং করা যায় এটা তাপস ছাড়া বিশ্বে কেউ ভাবে নি।' বিশ্বরঙ্গালয়ের অনুপুঙ্খ যাঁর নখদর্পণে সেই উৎপল দত্ত যখন এমন মন্তব্য করেন তার সারবত্তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাছাড়া 'তাপস ফুট লাইট ব্যবহার করত না। কিন্তু ঐ দৃশ্যের জন্য ফুট লাইটের জায়গায় একটা লাইট বসাল যার আলোটা খুব কড়া এবং তার সামনে একটা ঘূর্ণায়মান চাকা লাগাল। এবার এটা ঘোরাবে কে? বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করার সঙ্গতি আমাদের তখন নেই, তাই ঐ আলোর নিচে মঞ্চের কিছুটা অংশ ফুটো করে দেওয়া হল। তাপসের একজন সহকারী মঞ্চের নীচে গিয়ে হাত দিয়ে চাকাটা ঘোরাত। এরকম অজস্র পরীক্ষা তাপস করেছে যা বিশ্ব ইতিহাসে কোথাও নেই, তাপসের নিজস্ব সৃষ্টি।' শুধু তাই নয় এ দৃশ্য আলোর বিশেষ এফেক্ট আনার জন্য প্যান্ট গুটিয়ে একটি ম্লান আলো নিয়ে তাপস সেন কখনো কখনো নিজেই ঢুকে পড়তেন প্রায় অন্ধকার মঞ্চের মধ্যে। একথা জেনেছি তাপস সেনের কাছ থেকেই। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'মহাকালীর বাচ্চা'-তেও অনুরূপ দরকারে 'নেপথ্য শিল্পী' তাপস সেন এসেছিলেন মঞ্চের উপরে।

'সেতু' নাটকে মঞ্চের উপর রেল ইঞ্জিনের হেড লাইট বাংলা থিয়েটারে কিংবদন্তী হয়ে আছে। 'সেতু' আমি দেখি নি। তবে শুনেছি ইঞ্জিনের হেড লাইট, সিগনালের লালনীল আলো, রেলগাড়ির আওয়াজ মিলে তাপস সেন এমন বিভ্রমের সৃষ্টি করতেন যা নাকি বাস্তবকেও ছাড়িয়ে যেত। বহু দর্শক নাকি শুধু এ দৃশ্যটির জন্যই বারবার 'সেতু' দেখতেন এবং এ দৃশ্যের পর চলে যেতেন হল ছেড়ে। আমাদের ক্ষোভ এ সকল নির্মাণ-প্রক্রিয়া, সামান্য উপকরণ দিয়ে আসামন্য সৃষ্টি তারই বর্ণনাই শুধু পাই। কিন্তু কোন প্রযুক্তি বিদ্যা কাজ করেছিল এসব ক্ষেত্রে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনো পাই নি তাপস সেনের কাছ থেকে।

৪

'অঙ্গার' নাটকে অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে খাদের দৃশ্যের থেকে বেশি ভাল লেগেছিল রেসক্যু অপরারেশনের দৃশ্যটি। বিপুল কর্মব্যবস্ততা, প্রচুর যন্ত্রপাতির দ্রুত সঞ্চারণকে ব্যক্ত করছিল আলোর চঞ্চলতা। এ চাঞ্চল্য যেন দৃষ্টির বাইরের চেহারা ছাপিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল অপেক্ষায় ব্যাকুল খাদে আটকে পড়া শ্রমিকদের আত্মীয়স্বজনের উদ্বেগের গভীরতার মধ্যে।

তাদের মানসিক বিপর্যয়কে আলো যেন নিক্ষেপ করছিল দর্শকদের চেতনায়, তাদের করে তুলেছিল সমমনস্ক। অথবা সেই দৃশ্যটি যেখানে মায়ের উপর অভিমান করে বিনু না খেয়ে চলে গেল খাদে নামতে, ত্রাসিত রূপা ছুটে এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল। রূপার বাবা বিনুর প্রতি বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও জানালেন কাজটা ভাল হল না, তখন আশ্চর্য এক বিষণ্ণ আলো আমাদের জড়িয়ে ধরত।

'কল্লোল' নাটকের ঐশ্বর্যময় প্রযোজনায় শেষ দৃশ্যটি সব মিলিয়ে সকলকে প্রভাবিত করেছিল। খাইবারে নাবিকদের 'নো সারেন্ডার' জাহাজের উপর এরোপ্লেনের সচল ছায়া ও তার আওয়াজ এক আশ্চর্য অভিঘাতের সৃষ্টি করত। এ দৃশ্যের আলোচনা সমাপ্তির পর আমরা করতাম অবশ্যই। কিন্তু বোধহয় বেশি নাড়া দিত সেই দৃশ্যটি যখন ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি থেকে মিলিটারিদের উপর নিক্ষেপিত হচ্ছে বোমা, আপস্টেজে আগুনের প্রতিভাস, সারা প্রেক্ষাগৃহে বিস্ফোবিত হচ্ছে 'জাগা হায় ইনসান জমানা বদল রহা' এবং কৃষ্ণাবাঈ, সংগ্রামী শার্দুলের সিংহিনী মা, একটি শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে সেই দৃশ্য দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'কি রে, বড় হয়ে পাববি না তুই ওরকম লড়তে,' তখন অভিনয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত করত আলো। অথবা খাইবার জাহাজে ডেকের দৃশ্যটি। সুভাষ এক হাতে সাঁতার কেটে উঠে এসেছে জাহাজে নাবিকদের জন্য খাবার নিয়ে, লক্ষ্মীবাঈকে কেন্দ্র করে সুভাষ শার্দুলের টেনশান, কিছু উত্তেজিত সংলাপ, তারপর যখন শীতার্ত অতিথি সুভাষকে ওভারকোট দিয়ে ঢেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হত শার্দুল, আবছা আলোছায়ার দৃশ্যটি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত, মানুষের মনে মানুষের প্রতি আশ্চর্য এক আস্থা এনে দিত।

উৎপল প্রযোজিত 'ফেরারী ফৌজ' অন্য কিছু প্রযোজনার জাঁকজমকের মাঝে পড়ে যেন একটু ম্লান হয়ে আছে। অথচ নানাদিক থেকে এ প্রযোজনাটিকে ব্যতিক্রম মনে হয়। শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায় বা নীলিমা দাস ও অন্যান্যদের অভিনয়ের জন্যই শুধু নয়, একটিমাত্র সেট বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত হয়ে প্রযোজনায় একটি বহুতলতা বহন করে আনত। অশোকদেব বাড়ি, রাধার ঘর, জাহাজঘাটা, চন্ডিমন্ডপ নিজস্ব চারিত্র্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। যতদূর মনে পড়ছে, একবার একই সঙ্গে সম্ভবত পাঁচটি জোন (zone) দেখানো হচ্ছে এবং প্রতিটি স্বভাবত স্বতন্ত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অসাধারণ ঐক্য মঞ্চে বোধহয় বেশি দেখা যায় না। কাল ও স্থানের যে তারতম্য এ প্রযোজনা দাবী করে তা মিটিয়েছিল উৎপল দত্তের নিপুণ পরিকল্পনা, উপযোগী মঞ্চ নির্মাণ এবং অবশ্যই তাপস সেনের আলো। বিভিন্ন 'মুড' ও 'টেনশন' মূর্ত হয়ে উঠছিল আলোর ঐশ্বর্যে। অশোকের উপর অত্যাচারের দৃশ্যটি আলো আঁধারিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠত। শেষ দৃশ্যে শান্তি রায় চরিত্রে উৎপল যখন বলতেন, 'আমাকে মারবি কেন রে কুমুদ?' —আলো যেন অধিকার করে নিত সমগ্র মঞ্চটিকে। খুব বেশি করে মনে পড়ে ফাদার ফ্লানাগানের মৃত্যুদৃশ্যটি। ভুল করে ছোঁড়া হয়ে গেছে বোমা, বিস্ফোরণের প্রবল আওয়াজ, সেতুর উপর আহত আর্ত ফ্ল্যানাগানের প্রবেশ এবং তার সকলের জন্য মঙ্গলকামনার উচ্চারণ, পেছন থেকে আলো আসছে, ডাউন স্টেজে অসহায় বিপ্লবীর দল—সব মিলিয়ে যেন মহাকাব্যিক মুহূর্ত।

'চার অধ্যায়' নাটকে আবার অন্য ধরণের আলো করেছিলেন তাপস সেন। বিকেল। মঞ্চের প্রায় মাঝখানে একটি চেয়ার, এলা অতীন আত্মমগ্ন কথোপকথনে ক্রমে উপনীত হয় অতীতে, 'প্রহর শেষে রাঙা আলোয় সেদিন চৈত্র মাস', শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্রের অনবদ্য হার্দ্য স্বর, অকস্মাৎ অতীন সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিত আলো, সঙ্গে সঙ্গে সারা পরিবেশটি যেন পেয়ে যেত একটি সমগ্রতা। অথবা এ নাটকেই শেষ দৃশ্যে ছাতের উপর অতীন ও এলা, দূরে বাড়িতে বাড়িতে জানালার আলো, দুজনের মুখে দুটি স্পট। তারপর একে একে নিবতে থাকত বাড়িগুলোর আলো। দর্শকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বোধ জন্মায় দুজনের মধ্যে 'এবারের পালা হল শেষ'। আলো দিয়ে তাহলে কবিতা লেখাও যায় ?

যায় যে তার প্রমাণ 'রাজা'। অন্ধকার ঘরে সুদর্শনার অন্তহীন প্রতীক্ষা, তৃপ্তি মিত্রের স্বরে উৎকণ্ঠ ব্যাকুলতা, অদৃশ্য রাজা শম্ভু মিত্রের গলায় গভীর হয়ে উঠত। তারপর রাজা সম্পর্কে সুদর্শনার সেই আশ্চর্য উপলব্ধির বর্ণনা, সে কতরূপে দেখে থাকে রাজাকে। রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনাময় সংলাপ অল্প আলো আঁধারে যেন কাঁপিয়ে দিত আমাদের একাগ্র চেতনাকে। এখনো সেই ছবিটি দেখি সুদর্শনাবেশী তৃপ্তি মিত্র মালাসহ বাড়িয়ে আছেন হাত, মাথায় ঘোমটা, গ্রীবায় নমনীয়তা ও দৃঢ়তা মেশামেশি আলো যেন তাঁর কিনারা ছুঁয়ে সংহৃত আভাসে চিরন্তনতায় পৌঁছেছে।

'রাজা অয়েদিপাউস' নাটকে নিজের পরিচয় জানার পরে বেরিয়ে আসত রাজা, শম্ভু মিত্রের স্বরে সমুদ্র এবং তাপস সেনের আলো। কোনো স্পটলাইট দিয়ে নয়, ফুটলাইটের আলো সারা মঞ্চে, সব মিলিয়ে যেন ধ্বস্ততার প্রতিরূপ। বিশাল ব্যক্তিত্বের এমন সমারোহপূর্ণ পতন যেন পূর্ণতা পেত না শম্ভু মিত্রের অভিনয় ও তাপস সেনের আলো ছাড়া। অথচ তাপস সেন ফুটলাইটের ব্যবহার তেমন পছন্দ করেন না।

৫

এমনি হয়ত করা যায় একটির পর একটি প্রযোজনা নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা যাদের সঙ্গে সমশ্বাসে উচ্চারিত হতে পারেন তাপস সেন। অনুভূতি ও মননের প্রায় প্রতি পরতে তিনি তুলতে পারেন তরঙ্গ। 'পুতুল খেলা'য় দম দেওয়া পুতুলটির উপর আলো ফেলে তিনি যেমন সৃষ্টি করতে পারেন উত্তুঙ্গ নাটকীয়তা আবার একই সঙ্গে লেটার বক্সটিও আলো প্রক্ষেপণের নানা কৌশলে হয়ে উঠতে পারে মৃদু কণ্ঠ এক চরিত্র। ড. রায় (কুমার রায় অভিনীত) যখন বিদায় নিতে আসতেন বুলুবেশী তৃপ্তি মিত্রের কাছে একটি নরম আলোর আস্তরণ ক্রমে যেন নেমে আসত দর্শকদের চেতনার উপর। থিয়েটার ওয়র্কশপের 'অশ্বত্থামা'য় দেখা যেত কুরুক্ষেত্র। মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ, সাইক্লোরামায় ভাঙা রথ ও রথের চাকার প্রতিভাস, আবছা অন্ধকারে মঞ্চের পর তিনটি চরিত্র সহজেই বিশাল ট্র্যাজেডির প্রতিরূপ গড়ে দিত।

অথবা থিয়েটার ওয়ার্কশপেরই 'মহাকালীর বাচ্চা'। দেবাশিস দাশগুপ্তের সুরে 'চলো সোনামুখী গ্রামে চলো' গানটি গেয়ে যখন মঞ্চের উপর দিয়ে এগিয়ে চলত একটি একটি করে চরিত্র, সরু পেন্সিলের মত টর্চের আলো পরিবেশটিকে অন্তরঙ্গ করে তুলত। 'বেলা

অবেলাব গল্পে' হাবাধনেব যখন স্ট্রোক হয, বাল্বেব ফিলামেন্ট দিয়ে এক অদ্ভুত আলোব জাল তৈবি কবে সিচুযেশনটিব আর্তি বুঝিযেছিলেন তাপস সেন। বাল্বেব ফিলামেন্ট দিয়ে আলোপ্রক্ষেপণ এমন অথচ অনিবার্য আলোব ভাবনা শুধু শিল্পময নয, মৌলিকও। অথবা সেই দৃশ্যেই সুমতিব মুখেব উপব এসে পড়ত নীল সবুজে মেশানো আলো, চবিত্রটিব আর্তি ও ভীতি যেন মূর্ত হযে উঠত।

কিংবা ধবা যাক 'গ্যালিলিওব জীবন' প্রযোজনাটিব কথা। গ্যালিলিওব ভূমিকায শম্ভু মিত্র। শেষ দৃশ্যে তিনি খেতে শুক কবেছেন। পবিস্থিতিকে নতুনতব মাত্রায নিযে যাবাব জন্য তাপস সেন আলো ফেললেন শুধু খাবাব প্লেটটিব পব। প্রতিফলিত আলো এসে পড়ল গ্যালিলিওব মুখে। মুখে নয, শুধু বুঝি চোখ দুটিব উপব। এক লহমায পৌঁছে গেলেন ইতিহাসে' একই সঙ্গে দুটি নাট্যদলে একই নাটক প্রযোজনায আলো তাঁব হাতে হযে উঠতে পাবে পৃথক পৃথক ভাবে দ্যুতিময। গান্ধাব ও থিযেট্রন সম্প্রতি একই সঙ্গে মঞ্চস্থ কবেছে 'বিসর্জন'। দুটি প্রযোজনাতে আলোব পবিকল্পনা পুবোপুবি আলাদা। থিযেট্রনেব 'বিসর্জন'-এ যেন অন্ধকাবেব ব্যবহাব একটু বেশি, তাব সঙ্গে খানিক লাল ও সবুজ। তুলনায গান্ধাবেব 'বিসর্জন' সামান্য দৃপ্ত।

সম্প্রতি দুটি প্রযোজনায তাপস সেন অন্তত বর্তমান লেখককে বেশ আলোড়িত কবেছেন। নাটক দুটি হল নান্দীকাব প্রযোজিত 'শঙ্খপুবেব সুকন্যা' এবং সংস্কৃতি সাগবেব 'দ্য বযাল হান্ট অব দ্য সান'। প্রথম দলটি, সকলেবই জানা, কলকাতাব, পবিচালক কদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অপব দলটি বোম্বেব, পবিচালক ফিবোজ খান। দুটি প্রযোজনাতেই দেখা গেল তাপস সেন নির্ভব কবছেন না মঞ্চেব উপব ব্যবহাবযোগ্য পবিচিত আলোব যন্ত্রসমূহ। তাঁব প্রয়োগেব আওতায় চলে আসছে প্রেক্ষাগৃহেব আলোগুলোও। 'শঙ্খপুবে' দীর্ঘ সময ধবে জ্বলতে থাকে দর্শকদেব মাথাব উপবকাব আলো, তা প্রতিফলিত হযে প্রযোজনাটিকে কবে তুলছে একটু আলাদা। তাব ফলে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহেব মধ্যে তৈবি হযে চলেছে ঘনিষ্ঠ বন্ধন। যতদূব মনে পড়ছে 'তিতাস একটি নদীব নামে'ও তাপস সেন ব্যবহাব কবেছিলেন প্রেক্ষাঘবেব আলো, কিন্তু তা তখন তেমন গভীবতব অর্থ নিযে আসে নি। 'দ্য বয়াল হান্ট অব দ্য সান' প্রযোজনাতেও দেখা গেল হলঘবেব প্রায আধাআধি পর্যন্ত সিলিংয়েব আলোগুলোকে তাপস সেন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রযোগ কবছেন মঞ্চে। ফলে পুবো প্রযোজনায় এসে যাচ্ছে একটি স্বতন্ত্র এফেক্ট।

এ নাটকেই আপ স্টেজে প্রতিষ্ঠিত একটি গোলকেব উপব নানা ধবনেব ও বঙেব আলো ফেলে তাকে বিবিধ দ্যোতনাময কবে তুলছেন। এ গোলক যেন কখনো চন্দ্র সূর্যেব প্রতিরূপ, কখনো বা কালচক্রেব প্রতীক। তাব ফলে যে অভিঘাত সৃজিত হচ্ছিল তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রথিত কবে দিচ্ছিল একই ধাবাবাহিকতাব সূত্রে। নাট্যক্রিয়া তখন আব সীমিত থাকছিল না শুধু মাত্র মধ্যযুগেব ইনকা সভ্যতাব, তাব মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছিল আধুনিকতাবও প্রতিভাস। নাট্যকাব ও পবিচালকেব অভীপ্সা অবশ্যই পূর্ণতা পেত না আলোব এ স্পর্শ ব্যতিবেকে।

থিয়েটাব ওযর্কশপেব সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'বেড়া'। ট্রয় মকসন নামে একজন আমেবিকান নিগ্রোব ব্যক্তি জীবনেব যন্ত্রনাব কাহিনী। পুবো নাটকেব আলোক পবিকল্পনা ও তাব রূপায়ণ নিয়ে আলোচনাব সুযোগ এখানে নেই। সবাসবি চলে আসছি শেষ দৃশ্যেব আলোয়। ট্রয় মকসন প্রয়াত, তাব মৃতদেহ যাবে মাটিব নিচে, স্ত্রী বোজ মকসন এখনো তাব

প্রতি বহন করে চলেছে তির্যক আবেগ, দীর্ঘকাল পরে ছোটছেলে কোরি ফিরে এসেছে বাড়িতে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল যে, ট্রয়ের অবৈধ সন্তান মেয়ে রেইনেল একটু বড় হয়েছে। ভাইবোন এই প্রথম দেখছে দুজন দুজনকে। তারপর কোরি ও রেইনেল মিলে ট্রয়ের প্রিয় গানটি তুলে নেয় গলায়, 'আমার একটি কুকুর ছিল নামটি যে তার ব্লু'। অদ্ভুত বিষণ্ণতা ক্রমে গ্রাস করতে থাকে সকলকে। তারপর রোজ ঘরের বাইরে আসে। সবাই চলে যায় ট্রয়ের শেষকৃত্যে যোগ দেবার জন্য, এমনকী রোজও। রোজ শুধু মঞ্চে একা দাঁড়িয়ে সামান্য সময়ের জন্য দেখে নেয় তারই মত নিঃসঙ্গ বাড়িটিকে। একটা নরম হলুদ আলোর মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয় রোজ। তারপরই মঞ্চে ঘটে যায় প্রায় এক অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ আলো তার আভা পালটে ফেলে, মঞ্চের পর দেখা দেয় সবুজ নীল ম্লান আলো। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা মঞ্চটি যেন ভরে যায় অব্যক্ত গানে, 'আমার একটি কুকুর ছিল নামটি যে তার ব্লু'। ট্রয় মকসন ও তার কুকুর মুহূর্তে যেন একাত্ম হয়ে পড়ে।

পরিচালক অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছে জেনেছি তিনি নাকি গোড়ায় শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন অন্যভাবে। সে অনুযায়ী আলোর ছকও করে ফেলেছিলেন তাপস সেন। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ হবার মাত্র কিছুদিন আগে পরিচালক শেষ দৃশ্যটিকে বিন্যস্ত করেন নতুনভাবে। তাঁর শঙ্কা ছিল তাপস সেন এ পরিবর্তন মেনে নেবেন কিনা। তাপস সেন বিরোধিতা করেন নি নতুনতর পরিকল্পনার, বরং সহজেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিলেন, আলো, ব্যঞ্জনা ও দ্যুতিময় হয়ে উঠল আরো।

এমনিই তাপস সেন। তিনি কল্পনাকে প্রসারিত করতে পারেন, তাই মঞ্চে তিনি অমোঘ। তাই তিনি 'বারে বারেই নূতন, ফিরে ফিরেই নূতন'।

৬

কিন্তু তাপস সেনের অন্য এক পরিচয় আছে। সেটিও কম দ্যুতিময় নয়। এবার আসা যাক সে প্রসঙ্গে। ষাটের দশকের মধ্যভাগে উৎপল দত্তের এ নাটকটি কলকাতাকে কতটা কল্লোলিত করে তুলেছিল তা আজ ইতিহাস। বাষট্টিতে ভারত চীন সংঘর্ষের সুযোগে সারা দেশে তখন কমিউনিস্ট বিরোধিতার ঝড়। 'দেশ' পত্রিকায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক ফিচারে পশ্চিমবঙ্গের তাবড় তাবড় লেখক নিজেদের স্বাধীনতা দেখাতে গিয়ে কমিউনিস্টদের কুৎসিৎ গালাগাল দিচ্ছেন। সাম্যবাদী শিবিরে বহু নেতাই তখন জেলের ভেতর, বিনা বিচারে বন্দী থেকে 'নাগরিকতার স্বাধীনতা' উপভোগ করছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিংশতি কংগ্রেসে স্তালিনবিরোধিতা নামে সংশোধনবাদ যখন প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃত পেয়ে গেল, তার পর থেকে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে এল বিভেদের পালা। ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষ এ বিভেদকে বিচ্ছেদের পর্যায়ে পৌঁছে দিল। দেশভক্তির পরাকাষ্ঠার এক গোষ্ঠী পেল কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের প্রশ্রয়, অন্য গোষ্ঠী বুঝে নিতে চাইল আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের সঠিক স্বরূপটিকে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর উপর তখন নেমে এল বহুবিধ নিপীড়ন, দেশের শত্রু বলেও চিহ্নিত হলেন সমর্থকরা। প্রতিবাদের কোন পথও খোলা রইল না। জরুরি অবস্থা ও ভারত রক্ষা আইন টুঁটি টিপে ধরল যাবতীয় বিরোধিতাকে, এমনকী সত্যকে চিনে নেবার চেষ্টার উপরও পড়ল আঘাত। সারা দেশে শ্বাসরোধী হাওয়া, সরকারের কঠোর দন্ডনীতি এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথাকথিত জাতীয়বাদী পত্রিকাগুলোর উন্মত্ত

উল্লাস। যে কোন ধরণের সত্যই তখন তাদের কাছে প্রতিবাদ ওরফে দেশদ্রোহিতা। আইনি সন্ত্রাসের শেকলে আবদ্ধ তখন পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র'।

প্রতিবাদ নেই, আন্দোলন নেই, শুধু আছে চাপা ক্রোধ আর ধিক্কার। এবং 'বাতাসে বারুদের গন্ধ'। রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা, রাজনৈতিক গুমোট। উত্তেজনা সংহত বাঙলার মানুষ তখন আবেগমুগ্ধ প্রত্যাশায় কাঁপছে—ঝড় আসছে।

ঝড় এল। ১৯৩৭-তে মিনার্ভায়, 'কল্লোল' নিয়ে। সারা দেশের যাবতীয় প্রতিবাদ এসে জড়ো হল খাইবার জাহাজে, ওয়াটব ফ্রন্ট বস্তিতে। খাইবার জাহাজে যখন নাটকীয় অনিবার্যতা নিয়ে বৃটিশ ও কংগ্রেসী পতাকাকে ক্রমে সরিয়ে উড়ত লাল পতাকা, সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত, প্রতিটি দর্শকের চেতনায় যেন সংহত হত সমগ্রতার বিপ্লবী বোধ। মনে পড়ে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি থেকে যখন মিলিটারিদের উপর নিক্ষেপিত হচ্ছে 'জাগা হায় ইনসান জমানা বদল রহা' এবং কৃষ্ণাবাঈ, সংগ্রামী শার্দূলের সিংহিনী মা, একটি শিশুকে কোলে নিয়ে সেই দৃশ্য দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'বড় হয়ে তুই পারবি না ও রকম লড়তে?' শোভা সেনের সেই তীক্ষ্ণ উচ্চারণে সারা দেশের প্রতিবাদী মানুষের ভীত শৈশব যেন এক লহমায় কেটে যেত, সংক্ষোভের তীব্র আবেগ চার দেয়াল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ত প্রত্যয়ী দায়িত্বের সমগ্রতায়। এখনও মনে পড়ে, 'কল্লোল' দেখার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে নাটক শেষ হতে বেবিয়ে এসেছিলেন বলরাজ সাহনী, তাঁর আপ্লুত অভিব্যক্তিতে ছিল প্রত্যাশা পূরণের সানুরাগ বিহ্বলতা। পৃথিবীতে প্রতিবাদের স্বর তাহলে বন্ধ করা যায় না, প্রতিরোধের শক্তি তাহলে শেষ হয় না।

স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস ক্রুদ্ধ হল। তারা তারস্বরে চেঁচাল 'কল্লোল' নাটকে উৎপল ঘটিয়েছেন ইতিহাসের বিকৃতি, নৌ-বিদ্রোহের সময় কংগ্রেস ছিল নাকি ধোয়া তুলসীপাতা, কমিউনিস্টদেব তেমন ভূমিকা নাকি ছিল না নাবিকদের সেই অসম সংগ্রামে, এমনকি 'খাইবার' নামে কোন জাহাজেরই অস্তিত্ব ছিল না। বড় মালিকানার পত্রিকাগুলো শুধু বিরূপ সমালোচনা করল না, তারা একযোগে সিদ্ধান্ত নিল 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপান হবে না তাদের কাগজে। 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' চ্যালেঞ্জ নিয়ে জানাল সব পত্রিকা যেমন কোন কোন নাটকেয় বিজ্ঞাপন ছাপে না, তেমনি কোন কোন নাট্যদলও সব কাগজে তাঁদের বিজ্ঞাপন ছাপান না। আর সারা কলকাতা ভরে গেল একটি অসাধারণ পোস্টারে, 'কল্লোল চলছে চলবে'। পোস্টারে ঘোষিত প্রত্যয় সত্য বলে প্রমাণিত হল। 'কল্লোল' থেমে থাকল না। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভরে তুলল মিনার্ভা। 'চলছে চলবে' ধ্বনিত হল হাজারো কণ্ঠে। ৬৬-র গোড়ায় খাদ্য আন্দোলনে এ 'চলছে চলবে' অবদান কম ছিল না। যে শ্লোগানটি নিয়ে তখন মেতে উঠেছিল সারা কলকাতা সেই 'কল্লোল চলছে চলবে' যাঁর বোধিপ্রসূত তিনি হলেন তাপস সেন। তিনি তখন লিটল থিয়েটার গ্রুপের সভাপতি। সংস্থার বহু ঝক্কি তাঁকে সামলাতে হত তখন। 'কল্লোল' নিয়ে শাসক সরকার ও তার দলের কাছ থেকে যেসব আক্রমণ আসত এবং যারা প্রশ্রয় পেত বুর্জোয়া পত্রিকাগুলোর কাছে সে সকল যৌথ নোংরামিকে প্রতিরোধ করেছে গোটা দল। উৎপলকে গ্রেপ্তার করা হল, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে রাজরোষে প্রথম বন্দী হলেন একজন অগ্রগণ্য নাট্যকর্মী, অহিংস সরকারের গণতন্ত্রী মুখোশ অপাবৃত হল

নির্লজ্জতা নিয়ে। 'কল্লোল' কিন্তু বন্ধ হল না। এ প্রযোজনার নাট্যকার নির্দেশক অন্যতম অভিনেতা চলে গেলেন জেলের মধ্যে। তাতে অবশ্য দলের সদস্যরা দমে গেলন না। নিয়মিত মঞ্চস্থ হতে লাগল 'কল্লোল', পাশে এসে দাঁড়ালেন এখনকার সচেতন নাগরিক। এ সংকটের সময় এল. টি. জি-কে সমর্থভাবে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন সকল নাট্যকর্মী, এবং অবশ্যই তাপস সেন।

অথচ তাপস সেনের পরিচিতি নেপথ্য শিল্পী হিসেবে। তিনি থাকেন মঞ্চের বাইরে। পাদপ্রদীপের আলোয় আসার দরকার হয় না তার। যদিও শুধু পাদপ্রদীপ কেন পুরো মঞ্চের অলো নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে তাঁরই উপর। মঞ্চে নিছক আলোক প্রক্ষেপণকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন সতু সেন। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী তাপস সেন তাকে নিয়ে চলে এলেন শিল্পের স্তরে। বিজ্ঞান ও শিল্পকে সমন্বিত করলেন আলোর তাপস। তাই তিনি আলোর শিল্পী। এবং শিল্পী বলেই তাঁর সৃজনশীলতায় সচেতনভাবে মিশে থাকে সমাজমনস্কতা। যে কোন সার্থক শিল্পীকে সমাজ সচেতন হতেই হয়। তাই শিল্পী তাপস সেনকেও বার বার সমাজ রাজনীতির নানা আহ্বানে নেপথ্য থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছে 'ধূসর প্রসর রাজপথে, জনতার মাঝখানে'। গড়ে উঠেছেন অনুরাগে বিরাগে এক প্রতিবাদী তাপস। 'চলছে চলবে' ঘটেছিল তারই সামান্য প্রতিফলন।

৭

আসলে তাপস সেন এই রকম। 'কল্লোল' ত অনেক পরের ঘটনা। জীবনের গোড়া থেকেই হাটতে চান নি বাঁধাপথে। তাই নিতান্ত তরুণ বয়সেই পারিবারিক বাধা জীবিকার নিশ্চিয়তা ছেড়ে নিঃসম্বল ভাবে চলে গিয়েছিলেন বোম্বেতে কাজ শেখবার আগ্রহে। আলোর প্রতি তাঁর মানসিক সংলগ্নতা প্রায় কৈশোর থেকেই। তারপর নানা উচ্চাবচতার মধ্য দিয়ে পৌঁছেছিলেন কলকাতায় ভরা যৌবনে। সিনেমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটলেও প্রণয় ঘটল থিয়েটারের সঙ্গে। তখন ভারত স্বাধীন ও বঙ্গবিভাগ হতে চলেছে। মাত্র দুতিন বছর আগে গণনাট্য আন্দোলনে যে জোয়ার এসেছিল তার স্রোত তখন খানিক থিতিয়ে এসেছে। গোড়ায় অবশ্য তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক সংসর্গ ঘটেছিল এস. ইউ. সি. পার্টির সঙ্গে। অচিরেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে, যদিও কখনও আনুষ্ঠানিক সভ্য হন নি সম্ভবত। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বামপন্থীদের নিবিড় সহমর্মিতা গঠন করেছে তাঁর মানসিকতাকে। কিন্তু ক্রমে তাঁর শিল্পীসত্তা অর্জন করেছে কর্মক্ষেত্রের অনন্য স্বাতন্ত্র্য। ১৯৫৪-থেকে তাঁর কাছ থেকে দর্শক ক্রমে পেয়ে এসেছে 'রক্তকরবী' 'চার অধ্যায়' 'পুতুল খেলা' অথবা 'অঙ্গার' 'ফেরারী ফৌজ' 'কল্লোল' প্রভৃতি প্রযোজনার কাব্য, 'মিশ্রিত যার প্রকৃতি পুরুষে ললিতে'। অনুভূতির সূক্ষ্মতম ও বোধির প্রচণ্ডতম প্রতিসরণে নাট্য দর্শকদের হ'ল আলো অন্ধকারের নান্দনিক অভিজ্ঞতা। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই তাঁর ব্যপক পরিচিতি ও স্বীকৃতি ঘটল অন্যতম প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব হিশেবে। এবং এ স্বীকৃতিই তাঁর কাছে দাবী করল অভ্যর্থক প্রতিবাদ ও দৃঢ় দায়বদ্ধতা। তারপর বিগত চার দশক ধরে চলেছে তাঁর সৃজনে ও মননে এ দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

একজন প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচনাকে ভয় পান না, এমনকী আত্মসমালোচনাকেও।

তবে সে সামলোচনাকে অবশ্যাই হতে হবে গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সংলগ্ন। শুধুমাত্র প্রতিবাদের জন্যাই প্রতিবাদ নিতান্তই অর্থহীন। একথা বলা হল এজন্য যে তাপস সেন দীর্ঘকাল ধরে নিজের দায়বদ্ধতার তাগিদে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিবাদ করেছেন যা কখনও বামপন্থীদের কাছ থেকে পেয়েছে সোৎসাহ সমর্থন এ আবার কখনও বা বিতর্ক এমনকী বিতৃষ্ণাও। তাপস সেন বামপন্থী, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন তিনি। তার দরকারও নেই, কেননা কোন দল সক্রিয় সদস্যের কাছে আশা করে শর্তহীন আনুগত্য, এমনকী মার্কসবাদী হলেও। মার্কস থেকে মাও সকলেই তাঁদের রচনায় চিরকাল আক্রমণ করে গেছেন একধরনের অন্ধতাকে। তাপস সেনের প্রতিবাদ এ অন্ধতার বিরুদ্ধে, কর্মে ও মননে যাবতীয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে। অবশ্য তাঁর যাবতীয় প্রতিবাদের প্রতিটি বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে স্থানাভাবের জন্য করা যাবে না। তবে অবশ্যাই প্রয়াস থাকবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার সমগ্রতাকে ধববার।